কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ২৬

রকিব হাসান

ANIK

সেবা প্রকাশনী

NAEEM

ভলিউম-২৬

তিন গোয়েন্দা

৮১, ১০৬, ১১১

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1358-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা.
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-26
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী

চৌষট্টি টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, টাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাটি+তুষার মানব)
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)
তি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২ (বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩ (খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪ (মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+শুঁটকি রাজকুমার) ৪১/-

ঝামেলা

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৪

আওয়াজটা কিছুক্ষণ থেকেই কানে আসছে রবিনের। চিনে ফেলল হঠাৎ। প্লেনের শব্দ। এগিয়ে আসছে। কিন্তু এত জোরে কেন?

জানালার কাছে বসে বই পড়ছে সে, একটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। বইটা খুলে রেখেই জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ও, এই জন্যেই এত শব্দ। সাতটা নতুন ধরনের জেট প্লেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে। এই প্লেন আর দেখেনি সে কখনও, নিশ্চয় নতুন মডেলের জিনিস, মহড়া দিচ্ছে; কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল ওগুলোর দিকে।

কানফাটা গর্জন। বাপরে বাপ, কি শব্দ! ঝনঝন করতে লাগল জানালার কাঁচ। কেঁপে উঠল বাড়িঘর। তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিল রবিন।

প্লেনগুলো চলে যাওয়ার পর আবার বইতে মন দিল সে। সন্ধ্যা হচ্ছে। বাবা-মা বাড়ি নেই, কি একটা জরুরী কাজে শহরে গেছেন। কখন আসবেন তারও ঠিক নেই।

বইয়ে ডুবে থাকায় কোনদিক দিয়ে যে সময় পার হয়ে গেল টেরও পেল না সে। বাইরে আলো নিভে এল। রাত নামল। উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিল। ঠাণ্ডা আসছে জানালা দিয়ে।

সেটা বন্ধ করার জন্যে আবার জানালার কাছে আসতেই আগুন চোখে পড়ল তার। গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে জ্বলছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। কারও বাড়িতে লেগেছে আগুন।

ওয়ারড্রোবের কাছে ছুটে গেল সে। দ্রুতহাতে বাইরে বেরোনোর উপযোগী কাপড় বের করে পরে নিতে লাগল। বাবা-মা এখনও ফেরেননি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল রবিন। কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে আসতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল। ঝট করে সেদিকে টর্চের আলো ফেলল সে। 'ও, মুসা, তুমিও দেখেছ?'

মুসার সঙ্গে একটা ছোট্ট মেয়ে, তার খালাত বোন, ফারিহা। মেয়েটার মা-বাবা বিশেষ কাজে ইউরোপে চলে গেছেন, ঘুরে বেড়াতে হবে অনেক জায়গায়, কবে ফিরবেন ঠিক নেই, সে জন্যে মেয়েকে রেখে গেছেন মুসাদের বাড়িতে। এখানেই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে ফারিহাকে।

'হ্যাঁ, শুতে যাচ্ছিলাম,' মুসা বলল। 'কার বাড়িতে লাগল? বুঝতে পারছ কিছু? দমকলকে খবর দিয়েছে?'

'কি করে বলব? আমিও তোমার মতই আগুন দেখে বেরোলাম। তবে যে

ভাবে লেগেছে দমকল এসে কিছু করতে পারবে না। তার আগেই ছাই হয়ে যাবে। চলো, দেখি।'

দৌড় দিল তিনজনে। পথে আরও লোককে ছুটতে দেখল সেদিকে। একজন বলল, 'মিস্টার আরগফের বাড়িতে লেগেছে!'

একটা গলির মাথায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ক্রমেই বাড়ছে আগুন।

রবিন বলল, 'বাড়িতে নয়, তাঁর কাজের ঘরে···হায় হায়, কিছুই তো আর নেই!'

আসলেও নেই। ঘরটা অনেক পুরানো, একটা কটেজ, কাঠ দিয়ে তৈরি, খড়ের চালা। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

গাঁয়ের পুলিশম্যান কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকটও রয়েছে ওখানে। টকটকে লাল ফুটবলের মত গোল চেহারা, মোটা নাকের ডগাটা সুপুরির মত ফোলা, নীল চোখ, কোমরে প্রচুর চর্বি জমেছে, আঁটো করে আঁটা বেল্টের ওপরে-নিচে ঠেলে বেরিয়ে থাকে পেট। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে আগুনে পানি ঢালার জন্যে। ছেলেমেয়েদের দেখেই খেঁকিয়ে উঠল, 'আহ্, ঝামেলা! এই, সরো, ভাগো!'

'সব কিছুতেই তো খালি ঝামেলা ঝামেলা করে,' মুখ বাঁকিয়ে বলল ফারিহা। 'আচ্ছা. এই শব্দটা এতবার বলে কেন বলো তো?'

'মুদ্রাদোষ হলে আর কি করবে,' মুসা বলল।

কয়েকজন লোক বালতি দিয়ে পানি ঢালছে আগুনে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না।

'রোজার কোথায়? রোজার···রোজার!' গলা চড়িয়ে মিস্টার আরগফের শোফারকে ডাকল কনস্টেবল ফগ। 'গেল কোথায়? একটু যদি আক্কেল থাকে! বাগানের হোসপাইপটা দিয়ে পানি দিলেও তো হয়···'

'রোজার গেছে মিস্টার আরগফকে আনতে,' ককাতে ককাতে জবাব দিল এক মহিলা, 'স্টেশনে। হলিউডে গেছেন মিস্টার আরগফ। ট্রেনে করে আসবেন।'

মোটাসোটা, মাঝবয়েসী এই মহিলার নাম মিসেস ডারবি, মিস্টার আরগফের রাঁধুনি। তার ছোট ছোট কুতকুতে চোখে ভয়।

'নাহ্, কোন লাভ নেই,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল লোকটা। 'ঘরটা শেষ না করে এই আগুন নিভবে না।'

'দমকলকে খবর দেয়া হলো না কেন?' প্রশ্ন করল একজন।

'হয়েছে,' আরেকজন জবাব দিল। 'রওনা হয়ে গেছে ওরা। এসে আর কি করবে, কিছুই পাবে না।'

'অল্পের ওপর দিয়ে গেল,' ফগ বলল। 'ভাগ্যিস বাতাস নেই, তাহলে বাড়িটাতেও ধরে যেতে পারত,' ভঙ্গিটা এমন, যেন লাগলে খুশিই হত সে। 'কিন্তু যেটা গেছে সেটাই বা কম কি? মিস্টার আরগফ এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন।'

নীরবে সব শুনছে ছেলেমেয়েরা। রবিন বলল, 'এত সুন্দর কটেজটা জ্বলে

যাচ্ছে। মুসা, আমাদের কিছু করা উচিত।'

ওদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে ওদের বয়েসী আরেক কিশোর। দৌড়ে গিয়ে একটা বালতিতে করে পানি এনে ছুঁড়ে দিল আগুনে।

পানির ছিটে এসে লাগল মুসার গায়ে। চিৎকার করে ছেলেটাকে বলল সে, 'এই, দেখে ফেলতে পারো না!'

'সরি,' ছেলেটা বলল। বেশ মোটা, একেবারে গোলগাল নাদুস-নুদুস, কোঁকড়া চুল, দামী পোশাক পরা। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার চোখদুটো। আগুনের আলোতে দেখতে পেল রবিন, কুচকুচে কালো, ছুরির মত ধারাল দৃষ্টি। ওই চোখে চোখ রেখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

আবার বালতি নিয়ে পানি আনতে ছুটে গেল ছেলেটা।

'এই রবিন, সেই বিদেশী ছেলেটা না?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'চাচা-চাচীর সঙ্গে বেড়াতে এসে যে সরাইখানায় উঠেছে?...আহা, কি ভঙ্গি! নিজেকে একেবারে বাহাদুর মনে করে! টাকার গরমে আর বাঁচে না। পকেট টাকায় ভর্তি থাকে ওর। খরচ করে কিভাবে দেখেছ? এত টাকা দিয়ে কি করে বলো তো?'

রবিন জবাব দেয়ার আগেই মোটা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ফগ, 'এই, ভাগো, যাও এখান থেকে! বাচ্চাকাচ্চার যন্ত্রণা চাই না এখানে। ঝামেলা!'

মাথা উঁচু করে টানটান হয়ে দাঁড়াল ছেলেটা, 'আমি বাচ্চাকাচ্চা নই। দেখছেন না, আগুন নেভানোর চেষ্টা করছি?'

'আবার কথা বলে! যাও, ভাগো! ঝামেলা!'

আলোর সীমানার বাইরে অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল একটা কুকুর। খেঁক খেঁক করতে করতে ছুটে এসে কামড়ে দিতে গেল ফগের পায়ে। ঝটকা দিয়ে পা সরিয়ে নিল সে। লাথি মারল কুকুরটাকে, কিন্তু লাগাতে পারল না। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভীষণ রাগে ধমকে উঠল, 'এই, এটা তোমার কুকুর? জলদি সরাও! ঝামেলা!'

পাত্তাই দিল না ছেলেটা। বালতির পানি আগুনে ঢেলে আবার পানি আনতে দৌড় দিল। এই সুযোগে কুকুরটা এসে ফগের প্যান্টের এক পা কামড়ে ধরল।

'ঝামেলাা! আহ্, ঝামেলা!' পা ঝাড়া দিয়ে কুকুরটাকে খসানোর চেষ্টা করতে লাগল ফগ।

কাণ্ড দেখে হাসতে শুরু করল মুসা। কুকুরটা ভারি সুন্দর। ছোট কালো রঙের স্কটি, খাটো খাটো পা।

'কুত্তাটা ওই ছেলেটার,' ঈর্ষায় কাতর হয়ে হাত তুলে মোটা ছেলেটাকে দেখাল সে। 'দারুণ কুত্তা, বুঝলে। একটা ভাঁড়। ইস্, আমার যদি এমন একটা থাকত!'

ধসে পড়ল কটেজের খড়ের চালা। আগুনের ফুলকি ছিটাল। আগুনের আঁচ এসে গায়ে লাগছে। ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ। কয়েক পা পিছিয়ে গেল

মুসারা তিনজন।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ঘ্যাচ করে এসে ব্রেক করল একটা গাড়ি। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক।

গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মধ্যে, 'মিস্টার আরগফ এসে গেছেন।'

আগুনের আঁচের তোয়াক্কা না করে বাগানের দিকে দৌড় দিতে গেলেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি তাঁকে আটকাল ফগ, 'যাবেন না, মিস্টার আরগফ, কোন লাভ নেই। পুড়ে গেছে। বাঁচাতে পারলাম না। কি করে লাগল বলুন তো?'

'আমি কি করে জানব? আমি তো এলাম হলিউড থেকে। দমকল আসেনি কেন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তিনি।

'শহর থেকে আসতে তো সময় লাগে, জানেনই তো কতদূর। আমরা আসতে আসতেই চালায় ধরে গেল, নেভানোর একটু সুযোগও দেয়নি। ফায়ারপ্লেসের আগুন জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন নাকি?'

'কি জানি, মনে নেই। তবে সকালে জ্বেলেছিলাম। হয়তো নেভাতে আর মনে ছিল না। কিন্তু বাড়িতে তো লোকের অভাব নেই, তারা কোথায়? মিসেস ডারবি? সে কি করছিল?'

'এই যে আমি,' সামনে এসে দাঁড়াল মোটা মহিলা। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি কি করব, স্যার, আমাকে তো ওই ঘরের দিকেই যেতে দেন না। না ঢুকলে কি করে জানব আগুন লাগছে?'

'ঠিকই বলেছে,' মহিলার পক্ষ নিয়ে বলল ফগ। 'আমিও ঢোকার চেষ্টা করেছি, দরজায় তালা।...ওই যে, গেল আপনার কটেজ...'

হুড়মুড় করে ধসে পড়ল পোড়া বেড়াগুলো, লাফিয়ে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল আগুন, পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সবাই। ভয়াবহ তাপ।

মাথা খারাপ হয়ে গেল যেন মিস্টার আরগফের। ফগের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আমার কাগজ...অনেক দামী...বের করে আনুন জলদি, প্লীজ...'

সামনের অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ফগ, 'কি করে, স্যার, বলুন? কাগজগুলো তো আগে পুড়েছে। ওর মধ্যে কি ঢোকার সাধ্য আছে নাকি?'

কপালে চাপড় দিয়ে ককিয়ে উঠলেন আরগফ, 'আমার কাগজ!' বলে আবার দৌড় দিতে গেলেন পোড়া কটেজের দিকে। তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলল দু-তিনজন লোক। টেনে সরিয়ে আনল।

ফগ জিজ্ঞেস করল, 'খুব কি দামী কাগজ, স্যার?'

'দামী মানে! অমূল্য!' গুঙিয়ে উঠলেন আরগফ।

'কোন ধরনের ডকুমেন্ট?'

মাথা দোলালেন আরগফ।

'বীমা করানো ছিল?'

'থাকলেই কি? টাকা দিয়ে কি আর ওই জিনিস পাওয়া যাবে! আমি

আমার কাগজ ফেরত চাই…' আবার কপালে চাপড় মারলেন আরগফ। 'টাকা দিয়ে কি করব!'

'বেচারা!' আফসোস করল ফারিহা। মানুষটার জন্যে আন্তরিক দুঃখ হচ্ছে তার। আরগফকে সে চেনে। চেনে গাঁয়ের সব লোকেই। যতবারই তাঁকে দেখে, কেমন যেন অবাক লাগে ফারিহার। অনেক লম্বা, এত লম্বা হওয়াতেই যেন সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে পিঠের কাছটা। লম্বা, বাঁকানো নাক, চোখদুটো সব সময় ঢাকা থাকে ভারী কাঁচের আড়ালে। জাদুকর জাদুকর মনে হয় ফারিহার, ভয় লাগে।

হঠাৎ করেই যেন এত লোকজন আর ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ পড়ল আরগফের। ফগকে বললেন, 'এদেরকে যেতে বলুন! কটেজটা তো গেছেই, বাগানটাও মাড়িয়ে শেষ করল!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।' এগিয়ে গেল ফগ। বাগানের কাছে গিয়ে ভিড় করে থাকা দর্শকদের বললেন, 'এই, আপনারা বাড়ি যান। এখানে আর কিছু নেই। ঝামেলা করবেন না। যান যান, সবাই যান।'

আগুন কমে আসছে। নিভে যাবে আস্তে আস্তে।

উত্তেজনা শেষ। রবিন বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করব? চলো, বাড়ি যাই। বাবা আর মা ফিরল কিনা কে জানে। ঘরে না দেখলে বকা দেবে।'

ফিরে চলল তিনজনে—মুসা, রবিন ও ফারিহা। পেছনে শিস দিতে দিতে আসছে মোটা ছেলেটা। সঙ্গে তার কুকুর।

তাড়াতাড়ি হেঁটে ধরে ফেলল তিনজনকে। আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে বলল, 'দারুণ একটা উত্তেজনা গেল, তাই না? ভাগ্যিস, কেউ পোড়েনি। এই শোনো, কাল চলো না কোথাও বেড়াতে যাই। সারাদিন একা একা থাকি, ভাল লাগে না।'

'কেন, তোমার চাচা-চাচীর সঙ্গে বেড়াতে পারো না?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'ওরা বড় মানুষ, ওদের সঙ্গে কি আর বেড়াতে ভাল্লাগে? তাছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে ওরাও ফ্রী ফিল করে না বোধহয়।'

কেন যেন ছেলেটাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছে না মুসা। বোধহয় ওর ভারিক্কি চালচলন আর বড়দের মত ভাবভঙ্গির জন্যেই। বলল, 'যাব কিনা কথা দিতে পারছি না। যদি যাই, সরাই থেকে তোমাকে ডেকে নেব।'

'খুব ভাল হয় তাহলে, অনেক ধন্যবাদ। এই টিটু,' কুকুরটাকে ডাকল ছেলেটা, 'আয়, যাই।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল দু-জনে।

'এত মোটা কেন ছেলেটা?' ফারিহার প্রশ্ন।

'বেশি খায় হয়তো,' জবাব দিল রবিন।

'বেশি তো মুসাও খায়। তার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু মোটা তো নয়।'

'একেকজনের শরীরের গড়ন একেক রকম।'

'তবে ছেলেটা কিন্তু খারাপ না। বেশ ভাল ব্যবহার। [illegible] [illegible] না

কাল কোথাও বেড়াতে যাই।'

'সে দেখা যাবে।'

বাড়ির কাছে এসে রবিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকে গেল মুসা ও ফারিহা।

আপনমনে ভাবতে ভাবতে নিজ বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল রবিন। মিস্টার আরগফ আর তাঁর পুড়ে যাওয়া 'দামী' কাগজগুলোর কথা ভাবছে। কি লেখা ছিল কাগজগুলোতে? কিসের ডকুমেন্ট?

দুই

পরদিন সকালে মুসাদের বাড়িতে এসে দেখল রবিন বাগানে খেলছে মুসা ও ফারিহা, তাকে দেখে এগিয়ে এল। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'খবর শুনেছ?'

'কিসের খবর?'

'পোড়া বাড়ির?'

'না, আমি এইমাত্র বেরোলাম। জানি না। কী?'

'সকালে উঠেই গিয়েছিলাম ওদিকে। লোকে বলাবলি করছে শুনলাম, বাড়িটাতে নাকি আপনাআপনি আগুন লাগেনি। লাগানো হয়েছে।'

'বলো কি!'

'হ্যাঁ। ইন্সুরেন্সের লোক এসেছিল, দমকলও এসেছিল। তাদের এক্সপার্টরা তদন্ত করে বের করে ফেলেছে, ইচ্ছে করে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগানো হয়েছিল।'

'সর্বনাশ! কে করল এ কাজ? কেন করল? নিশ্চয় এমন কেউ লাগিয়েছে যে আরগফকে দেখতে পারে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'আমারও তাই মনে হয়। আমাদের ঝামেলা র‍্যাম্পারকট একখান কাজ পেয়ে গেল।'

'ও আর কি কাজ করবে, মাথায় তো গোবর ছাড়া কিছু নেই…'

'আরি, দেখো দেখো, ওই কুত্তাটা!' বলে উঠল ফারিহা।

মুসা আর রবিনও দেখল, বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কালো স্কটিটা। কান খাড়া। জিভ বের করে এমন একটা ভঙ্গি করে আছে, যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছে, 'আমি যদি খেলতে আসি কিছু মনে করবে?'

'যা-ই বলো, কুত্তাটা কিন্তু সুন্দর,' হাত নেড়ে ওটাকে ডাকল রবিন। 'ইস্, এমন একটা কুত্তা পেলে ভাল হত।'

'আমারও কুত্তা পালতে বড্ড ইচ্ছে করে।' আফসোস করে বলল মুসা, 'কিন্তু আম্মার জ্বালায় পারি না। জন্তু-জানোয়ার দেখতেই পারে না।'

লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে দাঁড়াল কুকুরটা। ওটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে দিতে মুসা বলল, 'এই টিটু, হাড় খাবি? বিস্কুট?'

'খোক্' করে উঠল টিটু। ছোট্ট শরীরটার তুলনায় আশ্চর্য ভারী গলা।

'খাবে বলছে,' হেসে বলল রবিন। 'মুসা, যাও না, থাকলে কিছু এনে দাও না।'

'দাঁড়াও, আমিই আনছি,' ছুটে চলে গেল ফারিহা। ফিরে এল একটা হাড় আর একটা বড় বিস্কুট নিয়ে। খেতে দিল কুকুরটাকে।

ওগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই আবার সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল টিটু।

'খা না, তোর জন্যেই,' মুসা বলল।

এইবার মুখ নামাল কুকুরটা। কামড় বসাল বিস্কুটে।

'দেখলে, ভারি ভদ্র কুকুর। না বললে খায় না। ভাল ট্রেনিং দিয়েছে।'

দুই কামড়ে বিস্কুটটা শেষ করে হাড় চাটতে শুরু করল টিটু।

'এ রকম একটা কুকুরের মালিক হওয়ার কথা ছিল আমাদের,' মুসা বলল। 'অথচ হয়েছে কিনা কুমড়োটা...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রায় কাঁধের কাছ থেকে বলে উঠল ভারী একটা কণ্ঠ, 'টিটু, তুই এখানে, আর আমি ওদিকে খুঁজে মরছি।'

চমকে গেল মুসা। ছেলেটাকে যে কুমড়ো বলেছে শুনে ফেলেনি তো?

কিন্তু শুনলেও সে রকম কোন লক্ষণ দেখাল না ছেলেটা। জিজ্ঞেস করল, 'খবর শুনেছ? ঘরটাতে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

'শুনেছি,' জবাব দিল রবিন। 'মুসা শুনে এসেছে। আমার কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। তোমার হয়?'

'হয়। কাল রাতেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। ছেলেটার ভাবভঙ্গি যেন কেমন। বড়দের মত করে কথা বলে, ভারিক্কি ভাব, এ সব বেশি চালবাজি না তো? জিজ্ঞেস করল, 'সন্দেহটা কেন হলো?'

'কাল বিকেলে একজন ভবঘুরেকে মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। সরাইখানার জানালা থেকেই দেখা যায় বাড়ির সামনের রাস্তাটা। আমার ধারণা, সে-ই লাগিয়েছে।'

হাঁ করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'সে কেন লাগাতে যাবে? কি লাভ? শুধু মজা দেখার জন্যে পেট্রল ঢেলে কারও বাড়িতে আগুন লাগাতে যাবে না কোন ভবঘুরে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার ছেলেটা। 'হয়তো এই লোকটার রাগ আছে আরগফের ওপর। বদমেজাজী লোক মিস্টার আরগফ, দেখেই বুঝেছি। হয়তো বাড়িতে ঢুকেছিল ভবঘুরেটা, খাবার-টাবার চেয়েছিল, গালাগাল করে বের করে দিয়েছেন আরগফ। যা মেজাজ, লাথি মেরে বসলেও অবাক হব না।'

'একবার দেখেই এত কিছু বুঝে গেলে তুমি!' অবাক লাগছে রবিনের।

'দেখার চোখ থাকলে একবারেই বোঝা যায়, বার বার দেখা লাগে না...'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা। হাত নেড়ে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা না

বলে চলো আমাদের সামার-হাউসটাতে চলে যাই।' বাগানের কোণের একটা ছাউনি দেখাল সে। 'ওখানে বসে আলাপ করি। দেখি, রহস্যটার সমাধান করা যায় কিনা।'

আগে আগে চলল মুসা। তার পেছনে রবিন ও ফারিহা। সবশেষে মোটা ছেলেটা। তার প্রায় পা ঘেঁষে হাস্যকর ভঙ্গিতে নেচে নেচে এগোল টিটু।

ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নেই। কয়েকটা কাঠের বাক্স পড়ে আছে মাঝখানে। ওগুলোকেই বসার আসন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ছেলেটাকে বসতে বলল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কাল ঠিক কোন সময় ভবঘুরেটাকে দেখেছিলে?'

'ছয়টায়। মাঝবয়েসী লোক। সাংঘাতিক নোংরা। গায়ে পুরানো ম্যাকিনটশ, হ্যাটটার যা দুরবস্থা···আরগফের বাড়ির বেড়ার কাছে উঁকিঝুঁকি মারছিল···'

'হাতে পেট্রলের টিন দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন।

'না। লাঠির মত কিছু একটা ছিল।'

'এই, একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।

'তোমার মাথায় তো বুদ্ধি সব সময়ই গজগজ করে,' মুসা বলল। 'তা বলে ফেলো না বুদ্ধিটা, শুনি।'

'আমরা খোঁজ নিতে পারি, জানার চেষ্টা করতে পারি কে লাগিয়েছে আগুন!'

'ঠিক বলেছ!' তুড়ি বাজাল মোটা ছেলেটা। 'গোয়েন্দাগিরি! ডিটেকটিভ! আমিও এ কথাই ভাবছিলাম। গোয়েন্দা-গল্প পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। সব সময় খালি মনে হয়, ইস্‌, এরকুল পোয়ারো কিংবা শারলক হোমসের মত গোয়েন্দা যদি হতে পারতাম!'

'ওরা আবার কারা?' জানতে চাইল ফারিহা। তার বয়েস কম, ওসব বই পড়ে বোঝার বুদ্ধি হয়নি।

বুঝিয়ে দিল বই পড়ুয়া রবিন, 'ওরা দু'জন বিখ্যাত গোয়েন্দা। তবে বাস্তবে নেই, বইয়ের গল্পে আছে। আরেকটু বড় হলে তুমিও পড়তে পারবে। সাংঘাতিক মজা লাগে পড়তে।'

'তাহলে আর কি, গোয়েন্দাই হব আমরা। যেটা পড়তে মজা লাগে, করতেও মজা লাগবে।'

'মন্দ বলোনি,' বলল মোটা ছেলেটা। 'ভাল কথা, পরিচয়ই তো দেয়া হয়নি এখনও। আমি কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'বাংলাদেশী। রকি বীচে আমার চাচার একটা ব্যবসা আছে। তার সঙ্গেই থাকি।'

হাতটা ধরল মুসা। কথায় কিশোরের মত ভারিক্কি ভাবটা আনার চেষ্টা করল, 'আমি মুসা আমান। ও আমার খালাত বোন, ফারিহা হোসেইন। আমার আব্বা সিনেমায় কাজ করে। ফারিহার আব্বা-আম্মা দু'জনেই ডাক্তার। একটা মিশন নিয়ে ইউরোপে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।'

'আমি রবিন মিলফোর্ড,' কিশোরের হাত ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'আমার

আব্বা সাংবাদিক।'

'ভাল,' বড়দের মত করেই মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'পরিচিত হয়ে গেলাম আমরা। কাজ করতে এখন সুবিধে হবে।'

'কি সুবিধে?'

'প্রথমেই ধরো, নাম ধরে ডাকার ব্যাপারটা। নাম না জানা থাকলে *এই এই* করে আর কত চালানো যায়? তোমাদের ক্লাবের সদস্য করে নিতে পারো আমাকে। নেয়া উচিত, কারণ ভবঘুরেটার খবর আমিই তোমাদের দিয়েছি।'

'ক্লাব তো নেই আমাদের,' রবিন বলল। 'দল গঠন করার কথাই উঠল এই প্রথম।'

'ও। তাহলে তো আরও ভাল। পাঁচজনেই একসঙ্গে শুরুটা করতে পারব আমরা।'

'পাঁচজন কোথায় দেখলে? চারজন তো...'

'কেন, টিটুকে বাদ দেবে নাকি? গোয়েন্দাগিরিতে ও অনেক কাজে লাগবে। অনেক বুদ্ধি ওর। ছোট হতে পারে, কিন্তু ওর নাক বড় সাংঘাতিক। গন্ধ শুঁকেই লুকানো জিনিস বের করে ফেলতে পারে।'

'লুকানো কি জিনিস?'

'তা এখন কি করে বলব? রহস্যের তদন্ত করতে গেলে কখন যে কি বেরিয়ে পড়বে, আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।'

'বেশ, নিয়ে নিলাম,' কুকুরটার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল মুসা। 'পাঁচজনই সই।'

'পোড়া বাড়ির রহস্য দিয়েই তাহলে শুরু হোক আমাদের গোয়েন্দাগিরি,' হাত তুলল রবিন।

'হোক,' মুসাও হাত তুলল।

'হোক,' হাত তুলল কিশোর।

ফারিহা বলল, 'আমাদের দলের নাম কি দেয়া যায়? চার গোয়েন্দা এবং একটি কুকুর?'

হেসে ফেলল মুসা, 'দূর, এটা একটা নাম হলো নাকি? ওসব নামফাম বাদ দাও, আমরা গোয়েন্দা, ব্যস।' গাল চুলকাল সে, 'তবে, দলের একজন প্রধান থাকা দরকার। নেতা। সব দলেরই নেতা থাকে, নাহলে গোলমাল হয়। সেই নেতাটা কে হবে?'

'আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'কারণ আমার মাথায় বুদ্ধি বেশি।'

প্রতিবাদ করল মুসা, 'কি করে জানলে বুদ্ধি বেশি? আমারও তো বেশি হতে পারে। কিংবা রবিনের, কারণ সে অনেক বেশি পড়াশোনা করে।'

'পড়াশোনা আমিও করি। ইস্কুলে ফার্স্ট হই। ছবি আঁকায় হাত ভাল...'

সমাধান করে দিল ফারিহা, 'তর্কাতর্কির দরকার নেই। কাজে নামলেই বোঝা যাবে কার বুদ্ধি বেশি। আপনাআপনিই নেতা হয়ে যাবে তখন সে।

কিশোর, তোমাকে আমরা চিনি না। কিন্তু মুসা আর রবিনকে চিনি। আমি ভোট দিচ্ছি মুসাকে। কারণ তার গায়ে জোর বেশি। লেগে দেখো, পারবে না। গোয়েন্দাদের নেতার নিশ্চয় জোর থাকা লাগে?'

'না, বুদ্ধিটা বেশি দরকার,' রবিন বলল। 'তবে মুসা নেতা হলে আমার আপত্তি নেই।'

কিশোর বলল, 'বেশ, হও এখন। পরে দেখা যাবে।'

নেতা নির্বাচিত হয়ে হোমড়া-চোমড়া একটা ভঙ্গি করল মুসা। মাথা সোজা করল। গলা খাঁকারি দিল। বাক্সের ওপর নড়েচড়ে বসে বলল, 'তাহলে আজ থেকেই কাজে নামব আমরা। এখন কটা বাজে?'

হাতঘড়ি দেখে বলল কিশোর, 'সাড়ে বারো।'

'দুপুর দুটোয় আবার এখানে দেখা করব আমরা। আলোচনা করে ঠিক করব, কি ভাবে কাজ শুরু করা যায়। খাওয়ার পর সবাই চলে আসবে এখানে। আপাতত এই ঘরটাই আমাদের হেডকোয়ার্টার। কাঁটায় কাঁটায় দুটো, মনে থাকে যেন।'

তিন

দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে হাজির হলো রবিন। ছাউনিতে ঢুকে দেখল ওর অপেক্ষাতেই বসে আছে মুসা ও ফারিহা। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর আসেনি?'

'এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে,' মুসা বলল।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। গাঁয়ের গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। ঠিক এই সময় ছাউনির দরজার কাছ থেকে খোক করে উঠল টিটু। লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল সে। তার পেছনে হেলেদুলে ঢুকল কিশোর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'টাইম ঠিক আছে তো?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। ডাকল, 'এসো, বসো।'

কিশোর বসল একটা বাক্সে।

ভূমিকা করল না মুসা, সোজা কাজের কথায় চলে এল, 'আমরা সবাই দেখেছি, কাল রাতে মিস্টার আরগফের কটেজটা পুড়ে গেছে। আগুন লাগার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না, হলিউডে গিয়েছিলেন। তাঁর শোফার তাঁকে আনার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিল। ইন্সুরেন্স আর দমকল বাহিনীর এক্সপার্টদের ধারণা, আপনাআপনি আগুন লাগেনি ঘরটাতে, পেট্রল ঢেলে ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছে। এখন আমাদের কাজ, শয়তানীটা কে করল তদন্ত করে বের করা। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' মাথা কাত করে জবাব দিল রবিন।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফারিহা।

কিছু না বুঝেই লেজ নাড়তে লাগল টিটু।

কিশোর বলল, 'প্রথম কাজটা হবে আমাদের...'
কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মুসা। 'কিশোর, কথা আমি বলছি, তুমি নও।'
নেতাকে প্রাধান্য দিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর। তবে চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ পেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা নাড়াচাড়া করতে লাগল।
'তাহলে,' আগের কথার খেই ধরল মুসা, 'শয়তানীটা কে করল বের করব আমরা। সে জন্যে প্রথমেই জানতে হবে, কাল বিকেলে ওর ঘরের কাছাকাছি কে কে গিয়েছিল। কিশোর বলেছে, একজন ভবঘুরেকে দেখেছে ওখানে। আমাদের জানতে হবে, আগুন লাগানোয় ওই লোকটার হাত আছে কিনা। মিসেস ডারবিকেও সন্দেহ করা যেতে পারে, কারণ ঘরের কাছাকাছি যাওয়াটা তার জন্যে কিছুই না। তার ব্যাপারেও খোঁজ নেব আমরা।'
'আরগফের ওপর কার কার রাগ আছে এটা জানলে ভাল হয় না?' ফারিহা বলল, 'অহেতুক কেউ কারও ঘরে আগুন দিয়েছে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে হয় কেউ প্রতিশোধ নিয়েছে।'
'হতে পারে,' রবিন বলল।
'তাহলে গাঁয়ের অন্তত একশোজন লোককে সন্দেহ করতে হবে আমাদের,' মুসা বলল। 'আরগফকে কেউ দেখতে পারে না, বদমেজাজের জন্যে। মালী বলছিল, কাল ঘরে দিয়েছে, এরপর ওর গায়ে আগুন লাগাবে লোকে।'
'আসলে এ ভাবে হবে না,' মুসার ওপর ভরসা করে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না কিশোর। 'সূত্র খুঁজতে হবে আমাদের।'
'কি সূত্র?' জানতে চাইল ফারিহা।
'তা বলতে পারব না। আগে থেকে কিছু বলা যায় না। খুঁজতে গেলেই হয়তো দেখা যাবে মূল্যবান কোন সূত্র বেরিয়ে পড়েছে, রহস্যের সমাধান করতে কাজে লাগবে যেটা।'
'বেশ, তাহলে সূত্রই খুঁজব আমরা,' মেনে নিয়ে বলল মুসা। 'চোখ-কান খোলা রাখব। আপাতত একটা সূত্রের কথা বলতে পারি আমি। পায়ের ছাপ। আগুন লাগানোর জন্যে কটেজের কাছে যেতে হয়েছে লোকটাকে। তার পায়ের ছাপ পাওয়া গেলে সেটা দেখেই বুঝব...'
হেসে উঠল কিশোর।
সবাই তাকাল তার দিকে। ভুরু নাচিয়ে শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'হাসছ কেন?'
'না, কিছু না। আরগফের বাগানে পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে তোমার চেহারাটা কেমন হবে কল্পনায় দেখতে পেলাম তো, তাই হাসলাম। কম করে হলেও কয়েকশো ছাপ পাওয়া যাবে ওখানে। কাল রাতে বাগানে মাড়িয়ে মাড়িয়ে কি কিছু রেখেছে নাকি লোকে। তার মধ্যে থেকে অপরাধীর ছাপটা চিনবে কি করে?'
জবাব দিতে পারল না মুসা। গম্ভীর হয়ে গেল। কড়া চোখে তাকাল

কিশোরের দিকে। 'তাহলে তুমিই বলো কি করব?'

আবার হাসল কিশোর। 'বলব? বেশ, শোনো। পায়ের ছাপই খুঁজব আমরা, তবে বাড়ির কাছ থেকে কিছুটা দূরে, যেখানে লোকে মাড়ায়নি। এই যেমন ধরো, পাতাবাহারের বেড়ার কাছে...খানাখন্দ আছে, ঝোপঝাড় আছে দেখেছি। ওখানে লুকানো সহজ। আগুন লাগাতে এসে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে থেকে বাড়ির ওপর চোখ রেখেছে লোকটা। যখন দেখেছে কেউ নেই, বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি পেট্রল ছিটিয়ে, একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিয়েই পালিয়েছে। হয়তো আবার গিয়ে লুকিয়েছে গর্তের মধ্যে। হতে পারে না এ রকম?'

'পারে,' মাথা দোলাল রবিন।

কিশোরের যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে মুসাকেও মেনে নিতে হলো তার কথা।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' ফারিহা বলল।

'দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর, 'কথা শেষ হয়নি এখনও। একটা ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের। ঝামেলা র‍্যাম্পারকট। গাঁয়ের একমাত্র পুলিশ, অপরাধীকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেবে সে।'

'তা তো নেবেই,' রবিন বলল। 'তাকে ঠেকাব কি করে আমরা? দায়িত্বটা তো আসলেই তার।'

'ঠেকাতে যাচ্ছে কে? আমরা তাকে এড়িয়ে চলব, ব্যস। কাল রাতেই বুঝেছি, ভীষণ অহঙ্কারী লোক, ছোটদের একদম দেখতে পারে না। তার কাছ থেকে সাবধান থাকতেই হবে আমাদের।'

'তারমানে তাকে বুঝতেও দেয়া চলবে না যে তদন্তে নেমেছি আমরা,' টিটুকে আদর করতে করতে বলল মুসা।

'না, চলবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'তাহলে এখন প্রথম কাজটা কি আমাদের? পায়ের ছাপ খুঁজতে বেরোনো?'

'হ্যাঁ। তারপর খুঁজতে বেরোব সেই ভবঘুরেকে। কারণ তাকে কটেজের কাছে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। জানার চেষ্টা করব আরগফের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ আছে কিনা। তারপর জানব, কাল বিকেলে কার কার যাওয়ার সুযোগ ছিল কটেজটার কাছে। কে কে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে মিসেস ডারবিকেও প্রশ্ন করব আমরা। শোফারের সঙ্গেও কথা বলতে পারি। মুসা, আর কেউ আছে মিস্টার আরগফের বাড়িতে?'

কিশোরের ওপর রাগবে কিনা বুঝতে পারছে না মুসা। তবে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে তার কাছে, ছেলেটা মোটা হলে কি হবে, মাথাটা খুব চিকন, বুদ্ধি খুবই পরিষ্কার। জবাব দিল, 'আছে, একজন খানসামা। তবে তার নাম জানি না।'

'কথা তো অনেক হলো,' বসে বসে শুধু আলোচনা ভাল লাগছে না ফারিহার। কিছু একটা করতে চায়। 'চলো, বেরোই।'

'হ্যাঁ, যাব,' মুসা বলল, 'আগে আলোচনাটা সেরে নিই। গোয়েন্দাগিরিতে আলোচনার প্রয়োজন আছে। রবিন, তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'

'আছে। আরগফের বাড়ির কাছে আমাদের ঘুরঘুর করতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে। মাটির দিকে তাকিয়ে পায়ের ছাপ খুঁজব আমরা, এটাও অস্বাভাবিক লাগবে। যাতে না লাগে তার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

'সেটা তেমন কঠিন হবে না। পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে মাটিতে ফেলে দেব আমরা। তারপর সেটা খোঁজার ছুতোয় ছাপ খোঁজার কাজটা সেরে ফেলব।'

এটা কোন বুদ্ধিই হলো না, ইচ্ছে করলে ফ্যাকড়া বাধাতে পারত কিশোর। কিন্তু বার বার এ রকম করে মুসাকে চটাতে চাইল না সে। গ্রীনহিলস তার এলাকা নয়, ওরা সাহায্য না করলে সে কিছুই করতে পারবে না এখানে। তাই মুচকি হাসতে গিয়েও হাসল না।

চার

তদন্তে বেরোল কিশোর গোয়েন্দারা। আরগফের মূল বাড়িটার পাশ কাটিয়ে সরু পথ ধরে এসে দাঁড়াল খুদে একটা কাঠের গেটের সামনে। সরু রাস্তা চলে গেছে কটেজটা পর্যন্ত। বড় হয়ে ঘাস জন্মে আছে রাস্তায়, পরিষ্কার করা হয়নি। সবখানেই অযত্ন অবহেলার ছাপ। গেট খুলে ঢোকার আগে চট করে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কিশোর কেউ তাদের দেখছে কিনা।

কেউ নেই। বাতাসে এখনও পোড়া গন্ধ তীব্র হয়ে আছে। চমৎকার দিন, উজ্জ্বল রোদ। প্রচুর ফুল ফুটে আছে।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। এসে দাঁড়াল পোড়া ধ্বংসস্তূপের সামনে। এখানে ওখানে ছাইয়ের স্তূপ। দুটো ছোট ছোট ঘর ছিল কটেজটায়, এখনও বোঝা যায়। মাঝের বেড়াটা খুলে দুটো ঘর এক করে নিয়েছিলেন আরগফ, বোধহয় কাজের সুবিধের জন্যে।

কণ্ঠস্বর নামিয়ে মুসা বলল, 'এসো, এখান থেকেই খোঁজা শুরু করি।'

আগের রাতে দর্শকরা যেখানে ছিল সেখানে খোঁজার কোন মানে হয় না, কিশোর ঠিকই বলেছে। মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাগানের ঘাসও ভর্তা করে দেয়া হয়েছে। সবখানেই কেবল ছাপ আর ছাপ। ওগুলোর মধ্যে থেকে আলাদা করে কোনটাকে চেনা অসম্ভব।

আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। কটেজটার কাছ থেকে কিছু দূরে লম্বা পাতাবাহারের বেড়া। অনেক দিন সাফ না করায় নিচেটা জংলা হয়ে আছে। তার এ পাশে বেশ খানিকটা ঢালু জায়গা, লম্বা খাদই বলা চলে। ওখানটায় খুঁজতে গেল কেউ, কেউ খুঁজতে লাগল সরু পথের আশেপাশে। এমন কি টিটুও চুপ করে বসে রইল না। তার অবশ্য পায়ের ছাপ নিয়ে মাথাব্যথা নেই,

সে খুঁজছে খরগোশ। উঁচু-নিচু জায়গায় অনেক গর্ত দেখা যাচ্ছে। গন্ধ শুঁকে একটাকে নতুন মনে হলো। আঁচড়ে আঁচড়ে ওটার মুখটাকে বড় করতে লাগল সে। এমন ভঙ্গি করছে, যেন খরগোশের ওপর বেজায় *রাগ: ব্যাটারা, আরেকটু বড় করে খুঁড়তে পারিস না গর্তের মুখ, তাহলে তো সহজে তাড়া করা যেত!*

'ও ব্যাটাও সূত্র খুঁজছে,' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

খোয়া বিছানো পথ। পায়ের ছাপ পড়ে না। তাই সেখানে কিছু পাওয়া গেল না। খাদের কাছে সরে চলে এল মুসা। একধরনের কাঁটা ঝোপ আর বুনো গোলাপের ঝাড় হয়ে আছে। নিচের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই, দেখে যাও! দেখে যাও!'

দৌড়ে এল সবাই। কি বুঝল কে জানে, টিটুও ছুটে এল।

কি দেখেছে, জিজ্ঞেস করল রবিন।

আঙুল তুলে দেখাল মুসা। গর্তের মাটি ভেজা, নরম। তাতে বিছুটি জন্মে আছে। এক জায়গায় দলে-মুচড়ে প্রায় মাটিতে মিশে আছে কিছু বিছুটি। কেউ দাঁড়িয়েছিল ওখানে, কোন সন্দেহ নেই। আর এ রকম বাজে জায়গায় নেমে দাঁড়ানোর একটাই অর্থ, লুকিয়ে ছিল।

'ওই দেখো,' মুসা বলল, 'কোনদিক দিয়ে নেমে কোনদিক দিয়ে উঠেছে লোকটা, তা-ও বোঝা যায়!'

পাতাবাহারের বেড়ার একজায়গায় একটা ফোকর হয়ে আছে। ডাল ভেঙে, পাতা ছিঁড়ে ফোকরটা করা হয়েছে ওখানে। তার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়েই ঢুকেছে। বেরিয়েছেও নিশ্চয় এ পথেই, কে জানে!

চোখ বড় বড় করে ফারিহা বলল, 'এটা সূত্র, তাই না মুসা?'

'খুব ভাল সূত্র,' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে মুসার চোখ। 'রবিন, পায়ের ছাপ খোঁজো। চোখে কিছু পড়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না।'

বিছুটি এত ঘন হয়ে জন্মেছে, চাপটা তার ওপর দিয়েই গেছে, মাটিতে পায়ের ছাপ বসার সুযোগ হয়নি। তবে গাছগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার চিহ্ন রেখে দিয়েছে। ভালমতই বোঝা যায় লোকটার গতিবিধি।

বিছুটির চিহ্ন ধরে সাবধানে এগিয়ে চলল ওরা। খাদটা বাঁকা হয়ে ঘুরে কটেজের পেছনে এসে ঘরের কাছাকাছি হয়ে গেছে। কিন্তু ওখানটায় এত লোকের পায়ের ছাপ রয়েছে, খাদ থেকে কোনটা উঠেছে কিছুই বোঝা গেল না।

'আগেই বলেছি এ দিকটায় সুবিধে হবে না,' কিশোর বলল। 'কিছু পেলে পাওয়া যাবে বেড়ার বাইরে। লোকটা যখন ওই ফোকর দিয়ে ঢুকতে পেরেছে, আমরাও বেরোতে পারব। ওপাশে গিয়ে দেখা দরকার।'

কথাটা মনে ধরল সবারই। সবার আগে বেরিয়ে গেল মুসা, সবার পেছনে কিশোর। এবং তার চোখেই পড়ল জিনিসটা। গাছের একটা ভাঙা ডালের চোখা মাথায় আটকে আছে খুব ছোট একটুকরো মোটা কাপড়।

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। কাপড়টা খুলে নিয়ে বেরিয়ে এল অন্যপাশে। সবাইকে দেখিয়ে বলল, 'বেরোনোর সময় কোট থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেছে। আরেকটা সূত্র পাওয়া গেল। বুঝতে পারছি, বাদামী রঙের ফ্ল্যানেলের পুরানো কোট ছিল লোকটার গায়ে।'

আস্তে করে কিশোরের হাত থেকে টুকরোটা নিয়ে নিল মুসা। ভাল করে একবার দেখে পকেট থেকে দেশলাইয়ের একটা খালি বাক্স বের করে তাতে ভরে রাখল। মনে মনে গাল দিচ্ছে ভাগ্যকে। ভাবছে, এটা তার চোখে পড়া উচিত ছিল—কারণ সে নেতা, কিশোরের নয়। ভোঁতা গলায় স্বীকার করতে বাধ্য হলো, 'ভাল একটা সূত্র।'

'চমৎকার,' বলল রবিন। 'এখন আমাদেরকে খুঁজে বেড়াতে হবে একটা পুরানো বাদামী কোট, যেটা থেকে কাপড় ছিঁড়ে গেছে। কোটটা কার জানা গেলে কে বেরিয়েছিল এখান দিয়ে তা-ও জানা যাবে।'

উত্তেজিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল ফারিহা। 'বাহ্, গোয়েন্দাগিরি তো খুব মজার!'

পায়ের ছাপটা মুসাই আবিষ্কার করল। বেড়ার ওপাশে মাঠ, তাতে বড় বড় ঘাস। ওখানে পায়ের ছাপ পড়লেও দেখা যাবে না। কিন্তু একটা জায়গার ঘাস চেঁছে তুলে ফেলেছে চাষী, বোধহয় কিছু লাগানোর জন্যে। ওখানটাতেই স্পষ্ট হয়ে আছে ছাপ।

রবিন বলল, 'চাষীর পায়ের ছাপ।'

'না, চাষীর ছাপ ওইগুলো,' খানিক দূরে আরও কয়েকটা ছাপ দেখিয়ে বলল মুসা। 'দেখছ না, কাঁটা বসানো জুতো। এ জিনিস পায়ে পরে কাজ করতে সুবিধে হয় ওদের। আর এই ছাপটা অন্য রকম, রবার সোলের জুতো। নকশাটা দেখছ কেমন চারকোনা খাঁজ কাটা। এ জিনিস পরে সাধারণত হাঁটতে বেরোয় লোকে। আর কি রকম বড় দেখেছ! বিশাল পা! এগোও, দেখি, আর পাওয়া যায় নাকি?'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগল ওরা। ঘাসের জন্যে কিছু চোখে পড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে মাঠের আরেক ধারে চলে এল। সেখানে আরও তিন-চার জোড়া জুতোর ছাপ দেখতে পেল রবিন। হাত তুলে ডেকে বলল, 'দেখে যাও। একই ছাপ মনে হচ্ছে।'

দৌড়ে এল সবাই। মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ, এক। এগুলোও রবার সোল, নিচের নকশাও একই রকম মনে হচ্ছে। রবিন, দৌড়ে গিয়ে দেখে এসো তো আরেকবার। শিওর হওয়া দরকার।'

'গিয়ে আবার দেখা লাগে নাকি? মনেই তো আছে,' কিশোর বলল। 'এগুলো একই জুতো।'

'একই যে সেটা আমিও বুঝতে পারছি,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'কিন্তু ভালমত দেখে শিওর হতে দোষ কোথায়? গোয়েন্দাগিরিতে কোন কিছুকেই অবহেলা করা উচিত নয়,' শারলক হোমসের একটা ডায়লগ ঝেড়ে দিল সে। 'রবিন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।'

দৌড়ে গেল রবিন। চেঁছে তোলা জায়গাটায় যে ছাপ পড়েছে সেটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে জানাল, 'হ্যাঁ, একই ছাপ।'

মুসারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মাঠ শেষ। কিনারের সরু একটু জায়গায় ঘাস নেই, সেখানেই পড়েছে ছাপগুলো। তারপর পাকা রাস্তা। সেখানে ছাপ পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং রাস্তা ধরে এগিয়ে আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ফিরে এল রবিন।

মুসা বলল, 'আর এগিয়ে লাভ নেই, বুঝলে। তবে যা পেয়েছি, অনেক। জেনেছি, কোন কারণে একটা লোক লুকিয়ে ছিল খাদের মধ্যে। তার গায়ে বাদামী রঙের কোট ছিল। পায়ে রবার সোলের জুতো ছিল। একদিনের তদন্তের জন্যে যথেষ্ট।'

'ছাপগুলোর নকশা এঁকে ফেলা দরকার,' কিশোর বলল। 'সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব। জুতোটা পেয়ে গেলে মিলিয়ে দেখা সহজ হবে।'

প্রতিবাদ করল না মুসা। যুক্তি আছে কিশোরের কথায়। বলল, 'ঝামেলা র‍্যাম্পারকটের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকলাম আমরা। অন্তত বাদামী কোটটার কথা তো আর জানতে পারছে না সে।'

'তোমরা এখানে থাকো,' কিশোর বলল। 'আমি একদৌড়ে যাব আর আসব। সরাই থেকে কাগজ-কলম নিয়ে আসি।'

'ও আর এঁকে কি হবে? মনেই তো থাকবে।'

'থাকবে না। এই তো, এইমাত্র দেখে এসেই ভুলে গেলে, শিওর হতে পাঠানো লাগল আরেকজনকে। মনে থাকবে কি করে?'

খোঁচাটা হজম করতে পারল না মুসা। রেগে গেল, 'আমি বলছি আঁকা লাগবে না! আমি নেতা, ভুলে যেয়ো না! আমি যা বলব, সেটাই মানতে হবে!'

'গায়ের জোরে নাকি? কপালে নেতার ছাপ থাকলেই তো শুধু চলবে না, তার কাজে-কর্মে-কথায় যুক্তি থাকতে হবে, তবেই না মানামানি...'

ঝগড়া শুরু হয়ে যায় দেখে তাড়াতাড়ি থামানোর চেষ্টা করল রবিন, 'চলো কটেজটার কাছে ফিরে যাই। আর কোন সূত্র আছে কিনা দেখি।'

মুখ মলিন করে ফারিহা বলল, 'সবাই কিছু না কিছু পেলে, আমি তো কিছুই পেলাম না।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'অত মন খারাপ করার কি আছে? দল বেঁধে কাজ করলে সাফল্যের ভাগটা সকলেরই সমান। সবাই পেল দেখলে কোথায়? টিটুও তো কিছু পায়নি।'

যুক্তিটা পছন্দ হলো ফারিহার। হাসি ফুটল মুখে।

আবার কটেজের কাছে ফিরে চলল ওরা। বেড়ার ফোকর গলে চলে এল এ পাশে। ছাপের ছবি এঁকে নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তে অটল রইল কিশোর। মুসার কোন কথাই কানে তুলল না। দৌড় দিল কাগজ আর পেন্সিল আনার জন্যে।

'দেখলে, কেমন করল?' রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'এত অবাধ্যতা…'

'অবাধ্যতা বলো আর যা-ই বলো, মাথাটা কিন্তু ওর পরিষ্কার। আর ফালতু কথা বলে না…'

'ঠিক,' রবিনের সঙ্গে একমত হলো ফারিহা। 'কিশোরকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর করে কথা বলে।'

'হুঁহ্,' মুখ গোমড়া করে ফেলল মুসা, 'সুন্দর কথা না ছাই, খালি চালবাজি! এসো, দাঁড়িয়ে না থেকে আরও সূত্র খুঁজি।'

সূত্রের আশায় পোড়া কটেজটার কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল ওরা।

হঠাৎ ধমকে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ, 'এই, এখানে কি? ঝামেলা!'

'সর্বনাশ!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা, 'ঝামেলা র‍্যাম্পারকট! খোঁজো, খোঁজো, আমার পয়সাটা খোঁজো!'

ফিসফিস করে ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় খুঁজব? পয়সা তো ফেলোনি…'

'চুপ! যা বলছি করো, খোঁজার ভান করো!'

পয়সা খোঁজায় লাগল ওরা।

'এই, কথা কানে যায় না!' গর্জে উঠল ফগ। 'কি খুঁজছ?'

মুখটাকে নিরীহ করে জবাব দিল মুসা, 'পয়সা পড়ে গেছে।'

'নিশ্চয় কাল রাতে ফেলেছ! ও রকম ছোঁক ছোঁক করতে এলে তো হারাবেই।' আপনমনে গজগজ করতে লাগল ফগ, 'কি যে হলো আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো! এক্কেবারে কথা শুনতে চায় না। পড়া নেই লেখা নেই, কাজ নেই কর্ম নেই, খালি শয়তানি আর শয়তানি! বিচ্ছুর দল!'

ফগের চোখ এড়িয়ে পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে ফুলগাছের গোড়ায় ফেলে দিল মুসা। চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই যে পেয়েছি,' নিচু হয়ে আবার পয়সাটা তুলে নিল সে। পকেটে রেখে বলল, 'যাচ্ছি, মিস্টার কট…'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' খেঁকিয়ে উঠল পুলিশম্যান।

'অত বড় নাম মনে থাকে না…'

'ঝামেলা!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ফগ। 'যাও, ভাগো জলদি! আর যেন এখানে না দেখি। আমি জরুরী কাজ করব।'

'আপনি সূত্র খুঁজছেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল ফারিহা। পিঠে মুসার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে আঁউ করে উঠল।

কিন্তু বোধহয় রেগে যাওয়াতেই অন্যমনস্ক হয়ে ছিল ফগ, প্রশ্নটা শুনতে পেল না। প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ওদের বের করে দিল গেটের বাইরে। আঙুল তুলে শাসাল, 'খবরদার, আর যেন এদিকে না দেখি!'

কিছুদূরে এসে গাল দিল মুসা, 'ছোটদের একদম দেখতে পারে না শয়তানটা। কিন্তু ছোটরা যে কি করে বসে আছে, তা যদি জানত লাল হয়ে যেত মুখ।'

'ওর মুখ তো এমনিতেই লাল,' ফারিহা বলল।

'আরও বেশি হত।' ফারিহাকে ধমক লাগাল মুসা, 'বড় বেশি কথা বলো

তুমি! দিয়েছিলে তো আরেকটু হলে ফাঁস করে! পোলাপান নিয়ে কাজ করার এই এক অসুবিধে!'

'আমি কিছু বলতাম না!'

'বলতাম না মানে? বলে ফেলেইছিলে, আমি তো ঠেকালাম। গাধা কোথাকার!'

'অহেতুক বকাবকি করছ আমাকে! এত জোরে মারলে কেন? পিঠটা এখনও ব্যথা করছে।'

'আহ্, আস্তে কথা বলো,' হুঁশিয়ার করল রবিন। 'ওই দেখো, ঝামেলা এখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শুনতে পাবে।'

পথে কিশোরকে থামাল ওরা। জানাল, কি ভাবে ওদেরকে বের করে দিয়েছে ফগ।

'অন্যকে ঝামেলা ঝামেলা করে,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, 'কিন্তু ও নিজেই তো একটা মহাঝামেলা।...কি আর করা, ও চলে গেলে অন্য আরেক সময় গিয়ে নকশাটা আঁকতে হবে আরকি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'তাছাড়া আজ এমনিতেও দেরি হয়ে গেছে। আর বেশি দেরি করলে মা বকা দেবে। হ্যাঁ, শোনো, কাল সকাল দশটায় হেডকোয়ার্টারে চলে আসবে।'

পাঁচ

পরদিন সকালে আবার মুসাদের বাড়ির ছাউনিতে মিলিত হলো গোয়েন্দারা।

ঘরে ঢুকে কিশোর দেখল, মুসা, রবিন ও ফারিহা বসে আছে। কোন কথা না বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল সে। তাতে আঁকা একটা জুতোর ছাপ। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না মুসাও, সত্যি ভাল এঁকেছে। একেবারে নিখুঁত। কিশোর পাশার ওপর আস্তে আস্তে ভক্তি এসে যাচ্ছে ওর, আবার রাগও হচ্ছে, ওর মত করতে পারে না বলে। বলল, 'ভালই। থাক এটা আমার কাছে।'

খুশি হয়েই দিয়ে দিল কিশোর। উল্টোপাল্টা কথা বলে তাকে যে রাগিয়ে দেয়নি মুসা, এতেই সে খুশি।

পকেট থেকে নোটবুক বের করল রবিন। বলল, 'কাল যা যা ঘটেছে, নোট লিখে রেখেছি এতে। খুঁটিনাটি সব। কোন কাজে লাগবে?'

'লাগতে পারে।' হাত বাড়াল মুসা, 'দাও। তোমার নোট, কিশোরের নকশা, কাপড়ের টুকরোটা, সব একসাথে রেখে দিই। বলা যায় না, কখন প্রয়োজন হবে। ভাল কোথাও রাখা দরকার।'

'কোথায় রাখবে?' জানতে চাইল ফারিহা।

'আছে, জায়গা আছে।' উঠে গিয়ে দাঁড়াল একপাশের দেয়ালের কাছে। মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে বোর্ডটা দেখছ, এটা আলগা।

বোঝা যায় না। জরুরী যা কিছু আছে, সব এখানে লুকাই আমি।'

বোর্ডটা ধরে টানতেই খুলে চলে এল। বেরিয়ে পড়ল একটা চারকোনা ফোকর। লাফাতে লাফাতে এল টিটু। এইসব ফোকর-টোকরগুলো তার খুব পছন্দ। ইঁদুর, ছুঁচো, খরগোশের বাসা থাকে এ সব জায়গায়। তাড়া করতে যা মজা, জন্মানোটাই সার্থক মনে হয় তখন।

জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে এসে আবার আগের জায়গায় বসল মুসা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আজকের কি কাজ? কি কি করব আমরা?'

'পায়ের ছাপ খোঁজা তো হলো, এবার জিজ্ঞাসাবাদ করার কাজটা সারতে হবে। একজন যাব মিসেস ডারবির সঙ্গে কথা বলতে।'

'কে যাবে? আমি যাই?' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল ফারিহা।

'না, তুমি পেটে কথা রাখতে পারো না। আমাদের তদন্তের কথা ভরভর করে সব বলে দিয়ে দেবে সর্বনাশ করে।'

রেগে গেল ফারিহা, 'কে বলল পারি না! ছয় বছর বয়েস থেকে আমি আর কোন কথা বলি না। যে যা বলে সব মনে রেখে দিই। এই যে আমাদের ক্লাসের জেনি কত কিছু করে, বলেছি কাউকে?'

'বলোনি। কিন্তু এখনই তোমার পেট থেকে সব কিছু বের করে নেয়া যাবে। চুপ থাকো। যা বলব, শুনতে হবে। নইলে বের করে দেব দল থেকে।'

আর কিছু বলল না ফারিহা। ঠোঁট ফুলিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে রইল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' মুসা বলল, 'রবিন, তুমি যাবে মিসেস ডারবির সঙ্গে কথা বলতে। মানুষের সঙ্গে খুব ভাল মিশতে পারো তুমি, মানুষ তোমাকে পছন্দও করে। আগুন লাগার ব্যাপারে যা যা জানে, সব জেনে আসার চেষ্টা করবে মিসেস ডারবির কাছ থেকে।'

'তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমি আর তুমি যাব শোফারের সঙ্গে কথা বলতে। একজন কথা বলব, আরেকজন খেয়াল রাখব ঝামেলা আসে কিনা। আমি জানি, সকাল বেলা গাড়ি ধোয় রোজার। এই সময় তার সঙ্গে আলাপ করার সুবিধে।'

বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না ফারিহা, 'আমি কি করব তাহলে?'

'তোমার আজ কিছুই করার নেই।'

মুখ দেখে মনে হলো, এখুনি কেঁদে ফেলবে মেয়েটা। মায়া হলো কিশোরের। কোমল কণ্ঠে বলল, 'কিছুই করার নেই কথাটা ঠিক না। টিটুকে রেখে যাচ্ছি আমরা। ওকে নেব না। একলা ওকে ছাড়া রেখে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, খালি দুষ্টুমি করে। ওকে তোমার দায়িত্বে রেখে যাব। ইচ্ছে করলে ওকে নিয়ে গাঁয়ের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসতে পারো। দেখো, শয়তানি করে করে তোমাকে অস্থির করে দেবে।' হাসল সে।

যাক, মন্দের ভাল; একেবারেই কিছু না করার চেয়ে এটাও ভাল মনে হলো ফারিহার। উজ্জ্বল হলো চেহারা। বলল, 'তাই করব। দেখো, হয়তো

কোন সূত্রও বের করে ফেলতে পারি।'

'তা পারতেও পারো, অসম্ভব না।'

'এখানে বসে থেকে আর কি করব, বেরিয়ে যাই?' মুসার দিকে তাকাল ফারিহা।

'যাও। সাবধান থাকবে। খরগোশের গর্তে যেন ঢুকে না পড়ে কুকুরটা।'

টিটুকে নিয়ে খুশিমনে বেরিয়ে গেল ফারিহা।

'আর কিছু আলোচনার আছে?' জানতে চাইল রবিন।

'না।'

'তাহলে চলো আমরাও বেরোই।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গেটের বাইরে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'শোনো, একসাথে না গিয়ে ভাগ হয়ে যাই আমরা। তাহলে চোখে পড়ব না। তুমি আর আমি আগে যাই। রবিন পরে আসুক।'

'ঠিক আছে, আসুক,' রাজি হলো মুসা।

দ্রুত এগিয়ে চলল সে আর কিশোর। আরগফের বাড়িতে পৌঁছল। ড্রাইভওয়েটা অনেক লম্বা। মূল বাড়িটার একধারে গ্যারেজ। সেদিক থেকে পানি ছিটানো আর শিসের শব্দ শোনা গেল।

'বললাম না, গাড়ি ধোয় এই সময়,' নিচু স্বরে বলল মুসা। 'এসো। গিয়ে এমন কারও সাথে দেখা করতে চাইব যে এখানে থাকেই না। তারপর তাকে গাড়ি ধোয়ায় সাহায্য করতে চাইব।'

ড্রাইভওয়ে ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জনে। গ্যারেজটা চোখে পড়ল। ওটার সামনে একজন লোক একটা গাড়ি ধুচ্ছে। লোক এবং গাড়ি, দুটোই ওদের পরিচিত। আগুন লেগেছে যে রাতে সে রাতে দেখেছে।

কাছে গিয়ে মুসা বলল, 'মর্নিং। মিসেস হার্বার্ট কি এ বাড়িতে থাকেন?'

'না,' জবাব দিল রোজার। 'এটা মিস্টার আরগফের বাড়ি। কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

'এই তো···ইয়ে···রকি বীচ···বেড়াতে,' গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'খুব সুন্দর গাড়ি।'

'হ্যাঁ, রোলস রয়েস তো। চালাতে খুব আরাম। বেশি নোংরা হয়ে গেছে। ধুলে দেখবে আরও ঝকমকে হয়ে যাবে। সাহেব বলে দিয়েছেন, আজ সব কাজ বাদ দিয়ে হলেও এটাকে ভালমত পরিষ্কার করতে।'

'আপনার খুব কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। জানেন, গাড়ি আমার খুব ভাল লাগে। বাবার গাড়িটা প্রায়ই ধুয়ে দিই আমি। যদি চান তো আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কোন কাজ নেই আমাদের। হোসপাইপটা ধরব?'

সামান্য দ্বিধা করে রাজি হয়ে গেল শোফার।

কাজে লেগে গেল দুই গোয়েন্দা। কিশোরকে চোখ টিপে ইশারা করল মুসা, কথা চালিয়ে যেতে। সে নিজে গাড়ি ধুতে ধুতে নজর রাখবে কেউ আসে কিনা, ফগকেই তার বেশি ভয়। এলে চিনে ফেলবে, দেবে সব গড়বড় করে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল কিশোর। কথা শুরু করল। এ কথা ও কথা থেকে কায়দা করে চলে এল আগুন লাগার আলোচনায়।

'সাংঘাতিক একটা কাণ্ড হয়ে গেল,' ন্যাকড়া দিয়ে গাড়ির বনেট মুছে চকচকে করতে করতে বলল রোজার। 'সাহেব তো খুব মুষড়ে পড়েছেন, এতগুলো দামী কাগজ নষ্ট হয়ে গেল বলে। মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। এমনিতেই বদমেজাজী, এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে।...ওরা তো বলে গেল আপনাআপনি লাগেনি, আগুনটা লাগানো হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষের সঙ্গে যা দুর্ব্যবহার করেন...টরিস তো বলত, লোকে অনেক ভদ্র, এখনও যে কেউ চড় মেরে বসেনি এটাই বেশি।'

কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। 'টরিস কে?'

'কেন চেনো না...ও, তোমরা চিনবে কি করে...টরিস ছিল সাহেবের খানসামা। আগুন যেদিন লেগেছে সেদিন চলে গেছে।'

'কেন গেল?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'সাহেব বের করে দিয়েছেন।'

'কেন?'

'সাহেবের পোশাক পরেছিল। মাঝে মাঝেই চুরি করে তাঁর পোশাক পরত টরিস। কিছুটা বড় হত, তা-ও পরত। জিজ্ঞেস করলে বলত, অত দামী কাপড় পরতে নাকি তার ভাল লাগে। সাহেবের ঘন নীল স্যুট, লাল ফুটকি দেয়া নীল টাই, হাতে সোনা-বাঁধানো ছড়িটা নিয়ে ফুলবাবু সেজে বাগানে বেরোল। আর পড়বি তো পড় বাঘের সামনে।'

'খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল বেচারা, তাই না?'

'ঘাবড়াবে না আবার। যারতার সামনে পড়েছে, তাঁর নাম মিস্টার আরগফ। ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। পাওনা বেতন বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাগট্যাগ নিয়ে তখুনি বেরিয়ে যেতে। বেরিয়ে এসে তাঁর সম্পর্কে এমন আজেবাজে কথা বলল না সে, শুনলে কান গরম হয়ে যায়। সকাল এগারোটা বাজে তখন। চলে গেল পাশের গাঁয়ে, তার মায়ের কাছে। অসময়ে মালপত্র নিয়ে ছেলেকে হাজির হতে দেখে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছে তার মা।'

কিশোর আর মুসা দু'জনে একই কথা ভাবছে: *প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঘরটা টরিসই হয়তো পুড়িয়েছে। তাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করতে হবে সেদিন বিকেলে সে কি করছিল।*

হঠাৎ জানালা থেকে গর্জে উঠলেন আরগফ, 'রোজার, কি হচ্ছে কি ওখানে? কাজ করার জন্যে রেখেছি আমি তোমাকে, খোশগল্প করার জন্যে নয়। একটা সামান্য গাড়ি ধুতে সারাদিন লাগাবে নাকি?'

ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলল রোজার, 'না, এই তো হয়ে গেছে!' নিচু স্বরে গোয়েন্দাদের বলল, 'তোমরা এখন যাও। অনেক সাহায্য করেছ, থ্যাঙ্কস।'

মুখ তুলে জানালার দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। একহাতে কাপ আরেক হাতে পিরিচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আরগফ। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন তাদের দিকেই।

আর ওখানে থাকার সাহস হলো না দু'জনের কারোরই। তাড়াতাড়ি রওনা দিল গেটের দিকে।

বাইরে বেরিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছেড়ে মুসা বলল, 'বাপরে বাপ, মানুষ না তো, বাঘ! আরগফ না রেখে টাইগার নাম রাখা উচিত ছিল!'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'বদমেজাজী বাঘ!'

শেষ কথাটা বাংলায় বলেছে কিশোর, বুঝতে পারল না মুসা, জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

'ওটা আমার মাতৃভাষা, বাংলা। বললাম, ব্যাড টেম্পারড টাইগার। রবিন গিয়ে এখন তাঁর খপ্পরে না পড়লেই হয়!'

ছয়

গেটের ভেতরে ঢুকে মুসা আর কিশোরকে কোথাও দেখল না রবিন। বাড়ির একপাশ থেকে হোসপাইপে পানি ছিটানোর শব্দ কানে এল। সেদিকে না গিয়ে এগোল রান্নাঘরের দিকে। বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে এগোতে গিয়ে হঠাৎ কানে এল, 'মিঁয়াও!'

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, একটা গাছের উঁচু ডালে উঠে বসে আছে একটা বেড়ালছানা। তার দিকে তাকাচ্ছে চোখে মিনতি নিয়ে। বোঝা গেল, ওঠার সময় উঠেছে, এখন আর নামতে পারছে না, কিংবা সাহস করছে না।

হাসল সে। 'দাঁড়া, নামিয়ে দিচ্ছি।'

গাছে উঠে সহজেই ছানাটাকে নামিয়ে আনল রবিন। তার হাতের সঙ্গে কুঁকড়ে একেবারে মিশে যেতে চাইল ওটা।

রান্নাঘরের ওপাশ থেকে ঝাড়ু দেয়ার শব্দ শোনা গেল। ছানাটাকে হাতে নিয়ে সেখানে এসে উঁকি দিল রবিন। ষোলো বছরের একটা মেয়ে আঙিনা ঝাড়ু দিচ্ছে। রান্নাঘরের খোলা জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে মহিলা কণ্ঠ, ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে:

'একটা কাগজের টুকরো যদি থাকে, একটা পাতা, দেখে নেব। ঝাড়ু দেয়া কাকে বলে শিখিয়ে দেব। আগের বার ঝাড়ু দিতে বললাম, সব ময়লা রেখে দিল। ভাঙা বোতল, ছেঁড়া খবরের কাগজ, আরও কি কি। তোমার মা কি কোন কাজ শেখায়নি নাকি? ঝাড়ু দিতে জানো না, ঘরের ময়লা পরিষ্কার করতে জানো না, রুটি সেঁকতে জানো না, জানোটা কি শুনি? আবার কাজ করতে এসেছে। আজকালকার মাগুলো হয়েছে যেমন আলসে, মেয়েগুলোকেও তেমনি বানায়। পড়ত যদি আমার হাতে, কাজ করা কাকে বলে শিখিয়ে দিতাম। মিস্টার আরগফের মত ভদ্রলোকদের ফাঁকি দিয়ে আর টাকা মেরে খাওয়া লাগত না। সবার ওপর তাঁর চোখ পড়ে, তোমার ওপর যে

কেন পড়ে না বুঝি না!' একটু বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে গেল মহিলা।

কানেও তুলল না মেয়েটা, যেন শোনেইনি, তার কাজ সে করে যেতে লাগল। আঙিনা ধুলোয় অন্ধকার করে দিয়ে ঝাড়ু দিয়ে চলল।

পেছন থেকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'অ্যাই, শুনুন, এই বাচ্চাটা কার?'

ফিরে তাকাল মেয়েটা। জানালার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল, 'মিসেস ডারবি, এই তো আপনার ছানা! একটা ছেলে নিয়ে এসেছে, খালি খালি আমার দোষ...'

জানালায় উঁকি দিল মিসেস ডারবি। পরক্ষণেই সরে গেল মুখটা। খুলে গেল দরজার পাল্লা। কুমড়োর মত গোল, মোটাসোটা মহিলা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। রবিনের হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ছানাটা। আদর করতে করতে বলল, 'আমার মনু, আমার ধনু...' তাকাল রবিনের দিকে। 'কোথায় পেলে?'

'ওই গাছের ডালে আটকে ছিল। নামিয়ে এনেছি।'

'আহ্, খুব ভাল করেছ, ভাল ছেলে তুমি।' সিঁড়ি বেয়ে আবার দরজায় উঠে গিয়ে ডাক দিল, 'কিটি, কিটি, কোথায় গেলি তুই? বাচ্চা সামলে রাখতে পারিস না? এই যে, নিয়ে যা। আবার যদি হারাস, ভাল হবে না।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রায় মহিলারই মত মোটা, গোলগাল একটা সাদা-কালো রঙের বেড়াল। ছানাটার দিকে তাকাল। মিঁউ করে উঠল ছানাটা। মহিলার কোল থেকে লাফিয়ে নামার চেষ্টা করতে লাগল।

আস্তে নামিয়ে দিল মিসেস ডারবি। কিটিকে বলল, 'নে, নিয়ে যা।'

'ছানাটা কিন্তু সুন্দর,' রবিন বলল, 'একেবারে মায়ের মত।'

খুশি হলো মিসেস ডারবি। 'আরও দুটো বাচ্চা আছে। এসো না, ঘরে এসো, দেখবে। একেবারে তুলতুলে। কুত্তা আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কিন্তু বেড়াল এনে দাও, আর কিচ্ছু চাইব না।'

মহিলার পেছনে রান্নাঘরে ঢুকল রবিন। মুখে করে বাচ্চাটাকে একটা ঝুড়িতে তুলে দিল কিটি। আরও দুটো প্রায় একই রঙের বাচ্চা রয়েছে ঝুড়িতে।

'বাহ্, দারুণ তো,' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ভান করল রবিন। 'আমি একটু খেলি ওদের সঙ্গে? আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার খুব ভাল লাগছে।'

আরও খুশি হলো মিসেস ডারবি। পুরোপুরি পছন্দ করে ফেলল রবিনকে। 'খেল না, খেল, অসুবিধে কি? আরেকটু বড় হোক, একটা বাচ্চা তোমাকে দিয়ে দেব, যাও। ওই যে গাছ থেকে যেটাকে নামিয়ে আনলে, ওটাই দেব। তা কোথায় থাকো তুমি?'

'এই তো কয়েকটা গলি পরেই। সেদিন যে আগুন লাগল, বাড়ির জানালা থেকেই দেখেছি আমি। ছুটে এলাম। আপনাকেও দেখেছি ওখানে।'

আগুনের কথায় কেঁপে উঠল মহিলা। কোমরে হাত রেখে এত জোরে

মাথা ঝাঁকাতে লাগল ফোলা গালের ঝোলা মাংস কাঁপতে লাগল থরথর করে। 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড যে হয়ে গেল! উফ্! আগুনটা দেখার পর এমন চমকানোই চমকেছিলাম, মুরগীর পালক দিয়ে বাড়ি মেরেও আমাকে তখন ফেলে দিতে পারত যে কেউ!'

মনে মনে হাসি পেল রবিনের। মুরগীর পালক তো দূরের কথা, তার মনে হলো যত দুর্যোগের সময়ই হোক না কেন, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মেরেও মহিলার কিছু করতে পারবে না কেউ। চোখ বড় বড় করে বলল, 'ও মা, তাই নাকি! কি সর্বনাশ!'

'তবে আর বলছি কি!' রুটি বানাচ্ছিল মহিলা, বেড়ালছানার খবর পেয়ে কাজ ফেলে বেরিয়েছিল, এগিয়ে গিয়ে আবার বেলন তুলে নিল হাতে। বকবক করে চলল, 'রান্নাঘরে ছিলাম তখন আমি। চা খেতে খেতে আমার বোনের সঙ্গে গল্প করছিলাম। সারাদিনে অনেক কাজ করেছি সেদিন, পুরো ভাঁড়ারটা ঝাড়া দিয়েছি, শরীরে আর মানছিল না, ব্যথা, তাই একটু আরাম করছিলাম। হঠাৎ বলল আমার বোন, কেরোলিন, পোড়া গন্ধ!'

বেড়ালকে আদর করা বাদ দিয়ে গুটি গুটি পায়ে সরে এল রবিন। তাতে মোটেও অখুশি হলো না মিসেস ডারবি, বরং আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল তার। বলতে লাগল, 'আমি বললাম টেরোলিনকে— আমার বোনের নাম টেরোলিন—চুলায় সুপ বসিয়েছি, সেটাই হয়তো পুড়ছে। আমার উঠতে কষ্ট হওয়ায় তাকে দেখতে বললাম। কিন্তু সে বলল, সুপের গন্ধ না, অন্য কিছু। বাগানের দিকের দরজাটা খুলেই আঁতকে উঠল। বলল, দেখো, দেখো, কি সর্বনাশ! কি হয়েছে দেখার জন্যে আমিও তাকালাম। যা দেখলাম না, কি বলব, দেখি, বাগানের মধ্যে আগুন! যেন মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে!'

'তখনই চমকে গেলেন, না?'

'চমকানো বলে চমকানো! লাগার আর জায়গা পেল না, একেবারে সাহেবের কাজের ঘরটায়। কাণ্ড! কি একটা সাংঘাতিক দিন যে গেছে! প্রথমে ঘাড় ধরে টরিসকে বের করে দিলেন সাহেব। তারপর এলেন মিস্টার দুর্গন্ধ, লেগে গেলেন দু'জনে। লাগেন প্রায়ই, তবে সেদিনের মত কোনদিন লাগেননি। এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন, মনে হলো ডাকাত পড়েছে। তারপর এল সেই নোংরা ভবঘুরেটা। মুরগীর ঘরে ডিম চুরি করতে ঢুকল, ধরা পড়ল সাহেবের হাতে। এতগুলো ঘটনার পর সেই একই দিনে ঘরে আগুন লাগা, সাংঘাতিক কাণ্ড বলবে না!'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। এগুলো খবর বটে তার কাছে। একই দিনে অনেকগুলো লোকের সঙ্গে ঝগড়া, তারপর ঘরে আগুন। টরিস কে, জানতে চাইল।

'সাহেবের খানসামা,' জবাব দিল মিসেস ডারবি। 'একটা নাম্বার ওয়ান শয়তান। ওর কোন কিছুই ভাল লাগত না আমার। গেছে, ভাল হয়েছে, বেঁচেছি। আগুন লাগিয়ে থাকলেও অবাক হব না।'

কিন্তু ফোঁস করে উঠল পলি, শুনে ফেলেছে। ঘরের কোণে ঝাড়ুটা আছাড় দিয়ে ফেলে বলল, 'অসম্ভব! মিস্টার টরিস একজন ভদ্রলোক! সে কিছু করেনি। কিছু করে থাকলে করেছেন মিস্টার দুর্গন্ধ!'

এ রকম নাম থাকতে পারে কারও বিশ্বাস হলো না রবিনের। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি এটা তাঁর নাম?'

'হলেই ভাল হত, মানাত খুব,' জবাব দিল মিসেস ডারবি, 'এত নোংরার নোংরা। নাম আসলে হেনরি ফোর্ড, নোংরামির জন্যে সবাই ডাকে দুর্গন্ধ। একটা চাকরানী রেখেছে, ওটা বোধহয় আরও নোংরা। কোন কাজের না। পয়সা দিয়ে রেখেছে যখন জামাকাপড়গুলো একটু ধুয়ে দে, তা না, দেবে না। ছেঁড়া মোজা পরে, ময়লা কোট গায়ে দিয়ে, একটা জঘন্য হ্যাট মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়েন মানুষটা, খেয়ালই করে না। তবে যাই বলো, ভদ্রলোক লেখাপড়া জানেন। এত বেশি জানতে কাউকে দেখিনি আমি। পুরানো বই পড়তে যে তাঁর এত মজা লাগে, কি পান ওসব বইতে তিনিই জানেন!'

'মিস্টার আরগফের সঙ্গে ঝগড়া করেন কেন?'

'খোদাই জানে! সব সময় ঝগড়া করে। দেখা হলেই হলো। দু'জনেই অনেক কিছু জানেন, সে সব নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু একমত হতে পারেন না কিছুতে। কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়ায় চলে যান। আগুন লাগল যে দিন সেদিন সকালে ঝগড়া যেন চরমে উঠল। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে ঘর থেকে বেরোলেন মিস্টার দুর্গন্ধ, এত জোরে দরজা লাগালেন, দড়াম করে উঠল, আরেকটু হলেই লাফ দিয়ে চুলা থেকে আমার সসপ্যানটা পড়ে যাচ্ছিল। রেগেমেগে চলে গেছেন বটে, তবে তিনি আগুন লাগিয়েছেন ভেব না। তাঁর মত মানুষ একটা কাগজের টুকরোও ধরাতে পারবেন না, সব কিছু রেডি করে হাতে তুলে দিলেও না। যে পারবে সে হলো টরিস। যার খেয়েছে এতদিন তাঁর সঙ্গেই বেঈমানী, এটা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।'

আবার ফুঁসে উঠল পলি, 'অসম্ভব! সে লাগাতেই পারে না। তার মত ভাল মানুষ হয় না। কারও সম্পর্কে এ ভাবে কথা বলার কোন অধিকার নেই আপনার, মিসেস ডারবি।'

রবিনের মনে হলো, খানসামার ব্যাপারে একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে মেয়েটা।

প্রচণ্ড রেগে গেল মিসেস ডারবি। 'কী! আমাকে শেখানো হচ্ছে! বড়দের সঙ্গে এ ভাবে কথা! আমার অধিকার নেই! কার আছে, তোমার? দাঁড়াও, মজাটা কি করে দেখাতে হয়, আমারও জানা আছে। কাজগুলো শেষ করো আগে, তারপরে দেখব। মেঝেতে একরত্তি ময়লা যদি থাকে, ছবিগুলোতে ধুলো লেগে থাকে, ঘরের কোণে কোথাও একটা মাকড়সার ঝুল থাকে, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল। বড়দের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, শিখিয়ে ছেড়ে দেব আমি তোমাকে। বেয়াদব মেয়ে! বড় বড় কথা বলা বের করে দেব!'

'বড় বড় কথা কই বললাম? আমি তো শুধু…'

'শুধু শুধু করতে হবে না আর এখানে!' বেলন দিয়ে এত জোরে টেবিলে বাড়ি মারল, ঝনঝন করে উঠল থালা-বাসন। রবিনের মনে হলো, বাড়িটা পলির মাথায় মারতে পারলে খুশি হত সে। 'যাও, জলদি গিয়ে সিরাপের বোতলটা কোথায় রেখেছ, বের করে আনো। কাল সারাটা দিন খুঁজেও তো বের করতে পারলে না, আজ আমি ওটা চাই। নইলে তোমার বেতন থেকে দাম কাটব। মুরোদ তো ওই, আবার লম্বা লম্বা কথা!'

পলির অপরাধ শোনার কোন আগ্রহ নেই রবিনের, সে শুনতে চায় আরগফের সঙ্গে কার কার শত্রুতা, কার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। তিনজন পাওয়া গেল মোট: টরিস, মিস্টার দুর্গন্ধ, আর অবশ্যই সেই ভবঘুরেটা। জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ডারবি, চোরটাকে কিছু করলেন না মিস্টার আরগফ?'

'করতেন না আবার, পিটিয়ে হাড্ডি ভেঙে দিতেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি তো। না পেরে এমন রাগাই রাগলেন মিস্টার আরগফ, চেঁচিয়ে সারা বাড়ি আর বাগান কাঁপিয়ে ফেলেছেন!' এ সব আলোচনা করতে খুব মজা পাচ্ছে মিসেস ডারবি, পলির বেয়াদবির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হাসি ফুটল মুখে। 'আহ্, যদি দেখতে! আমি তো মনে মনে হাসি; বলি, যাক, মেজাজ দেখানোর একটা চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন সাহেব।' ভাঁড়ারের দরজার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তে হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেল মহিলার, 'তাঁর মেজাজ তো সব কেবল অন্যের বেলায়, এর সামান্য ছিটেফোঁটাও যদি ওই অকর্মা মেয়েটার ওপর পড়ত, তাহলেই ঠিক হয়ে যেত।'

ভাঁড়ার থেকে মুখ কালো করে বেরিয়ে এল পলি। হাতের বোতলটা আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'বোতল ভাঙার কি হলো, অ্যাঁ, কি হলো শুনি!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ডারবি। 'হয়েছে কি তোমার? বেয়াদবিটা যেন আজ অনেক বেড়ে গেল? জলদি যাও, পেছনের সিঁড়িটা ধুয়ে ফেলোগে। কাজের মধ্যে থাকলে মেজাজ অনেকটা সিধে হবে। যাও।'

ঝটকা দিয়ে একটা বালতি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল পলি।

'মিসেস ডারবি,' অনুরোধ করল রবিন, 'ভবঘুরেটার কথা বলুন, প্লীজ। আপনার মুখে শুনতে ভাল লাগছে। ডিম চুরি করতে ঢুকেছিল ঠিক কোন সময়টায়?'

'ঘড়ি তো দেখিনি, সকালের দিকে,' ডিম মাখানো ময়দা বেলন দিয়ে বেলতে বেলতে জবাব দিল মিসেস ডারবি। 'আমার কাছে এসেছিল প্রথমে। কিছু খাবার দেয়ার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। লোকটাকে দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার, এত নোংরা মানুষ দেখতে পারি না। দিলাম না। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। তখন গিয়ে মুরগীর ঘরে ঢুকল সে। তার কপাল খারাপ, সাহেব যে তখন কটেজের জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন খেয়ালই করেনি। সাহেবের চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চোরটা। আমার জানালার সামনে দিয়ে দুড়দাড় করে ছুটে গেল। মনে হলো, হাজারখানেক পাগলা কুত্তা তাড়া করেছে ওকে।'

'রেগে গিয়ে আগুনটা সে-ই লাগিয়ে বসেনি তো?'

'না,' টরিস ছাড়া আর কেউ আগুন লাগিয়েছে এটা কিছুতেই মানতে চাইল না মিসেস ডারবি। বেলন নেড়ে আবার বলল, 'না। ওটা তো একটা ছুঁচো। ও কি লাগাবে? লাগিয়েছে টরিস। কত্তবড় শয়তান জানো? রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম, চুরি করে আমার ভাঁড়ারে ঢুকে জ্যাম, কেক, সব চুরি করে খেত। কেনরে বাবা, আমার কাছে চাইলেই পারতি, চুরি করা কেন। এই যার স্বভাব, আগুন লাগানো তার জন্যে কিছু না।'

রবিনের মনে পড়ল, অনেকদিন আগে একবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সে। রাতে ভীষণ খিদে পেয়েছিল তার। লজ্জায় কাউকে ডাকতে না পেরে শেষে নিজেই গিয়ে ভাঁড়ার থেকে খাবার নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। চুরি করে তো খেয়েছে, কিন্তু তাই বলে কারও ঘরে কি সে আগুন লাগাতে পারবে? অসম্ভব। পারবে না। সুতরাং ভাঁড়ার থেকে যে লোক খাবার চুরি করতে পারে, সে ঘরেও আগুন দিতে পারে, মিসেস ডারবির এ কথাটা মেনে নিতে পারল না সে। কিন্তু বলল না সে-কথা।

হঠাৎ বাড়ির কোন একটা ঘর থেকে চিৎকার করে কথা বলার শব্দ হলো। মাথা কাত করে কান পেতে শুনল মিসেস ডারবি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ওই যে, সাহেব, আবার খেপেছেন।'

খানিক পরে কাছেই আবার চিৎকার শোনা গেল।

মিসেস ডারবি বলল, 'আজকেও আবার শুরু করলেন দেখি! কার ওপর...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকল বেড়ালটা। গায়ের রোম ফুলে উঠেছে, লেজটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আঁতকে উঠল মিসেস ডারবি। 'কিটি! আবার সাহেবের পায়ের নিচে পড়েছিস! আহারে, বেচারি ভীতু ভেড়ার বাচ্চা আমার!'

কিন্তু ভীতু ভেড়ার বাচ্চাটা ফিরেও তাকাল না তার দিকে। টেবিলের নিচে ঢুকে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। ঝুড়িতে সতর্ক হয়ে গেল তার বাচ্চাগুলো। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল ওগুলোও।

গটমট করে রান্নাঘরে ঢুকলেন আরগফ। ভয়ানক রেগে গেছেন। চিৎকার করে বললেন, 'মিসেস ডারবি, কতবার বলব তোমার ওই হতচ্ছাড়া বেড়ালগুলোকে সামলে রাখতে? খালি পায়ের নিচে এসে পড়ে! আর একবার যদি এ রকম হয়, মাত্র একবার, তাহলে পানিতে চুবিয়ে মারব আমি ওগুলোকে!'

'এবং সেদিন আমিও আপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে যাব, দেখি কে আপনার বাড়ি সামলায়!' সমান তেজে জবাব দিয়ে আছাড় মেরে বেলনটা টেবিলে নামিয়ে রাখল মিসেস ডারবি।

এমন দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকালেন আরগফ, যেন বেড়ালের বদলে রাঁধুনিকেই চুবিয়ে মারবেন। 'ওই কুৎসিত জানোয়ার কেন রাখো বাড়িতে... ওগুলো আবার কি! বাচ্চা নাকি! বাচ্চা হলো কবে!'

'হ্যাঁ, ওগুলো বাচ্চাই, স্যার,' বিন্দুমাত্র দমল না মিসেস ডারবি। 'হলো এই দিন কয়েক আগে। বড় হলে সব কটার জন্যে ভাল দেখে ঘর খুঁজে বের করব আমি। আপনি ভাববেন না, আপনার এখানে রাখার দরকার পড়বে না।'

এই সময় রবিনের ওপর চোখ পড়ল আরগফের। গেলেন আরও রেগে। 'ছেলেটা এখানে কি করছে? ওকে ঢুকতে দিয়েছ কেন? শেষবারের মত সাবধান করছি তোমাকে মিসেস ডারবি, এ ধরনের আজেবাজে জিনিস ঘরে ঢুকতে দেবে না। বেড়ালও যা, ছেলেমেয়েও তাই। বের করো এগুলোকে, জলদি বের করো!'

হাতের কাপ আর পিরিচটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রেখে আবার গটমট করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ডারবি। তিনি যাতে শুনতে না পান এ রকম স্বরে বলল, 'ভাগ্য ভাল, ঘরটায় আগেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! আজ পর্যন্ত থাকলে আমিই সারতাম কাজটা! এ রকম মানুষের ঘরে আগুন লাগাবে না কি করবে! গায়ে যে লাগায় না এটাই বেশি!' গজগজ করতে লাগল সে।

রবিন বুঝল, এখানে আর অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া যা শোনার শুনে নিয়েছে, এতটা জানতে পারবে আশা করেনি। বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে কথা শুনতে হলো, মিসেস ডারবি, সরি। কিছু মনে করবেন না। আমি এখন যাই।'

'আরে না না, মনে আবার করব কি? অপমানটা তো তোমাকেই করল। এক মিনিট,' বলে তাকের কাছে চলে গেল মিসেস ডারবি। বড় দেখে একটা কেকের টুকরো নিয়ে গুঁজে দিল রবিনের হাতে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন। ভাবতে ভাবতে চলল, ঘরে আগুন লাগানোর মত আরগফের শত্রু পাওয়া গেছে মোটে তিনজন। সংখ্যাটা অনেক কম মনে হলো তার কাছে। তাঁর মত মানুষের জন্যে এই সংখ্যাটা হওয়া উচিত ছিল অন্তত তিন হাজার!

সাত

ছাউনিতে এসে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা। তিনজনেই উত্তেজিত। ফারিহার আসার অপেক্ষায় না থেকে কে কি জেনে এসেছে বলতে আরম্ভ করে দিল।

'শোফারের সঙ্গে কথা বলে এলাম আবার,' মুসা জানাল রবিনকে। 'খানসামার কথা বলল সে। নাম টরিস। আগুন যেদিন লেগেছে সেদিন চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে।'

'কাজেই আগুনটা যদি সে-ই লাগিয়ে থাকে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'পাশের গাঁয়ে মায়ের কাছে চলে গেছে সে। তাকে খুঁজে বের করে কথা বলতে হবে আমাদের।'

'আগুন মিস্টার দুর্গন্ধও লাগাতে পারেন,' না বলে আর থাকতে পারল না রবিন।

'দুর্গন্ধ!' বলে উঠল মুসা, 'এটা আবার কেমন নাম হলো?'

'ডাক নাম। মিসেস ডারবি রেখেছে। খুব নোংরা থাকে তো, সে জন্যে।'

বেড়ালের বাচ্চাটা পাওয়া থেকে শুরু করে আরগফ এসে ধমক দেয়া পর্যন্ত সব খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, 'আরগফের ধমক একটুও সহ্য করেনি মিসেস ডারবি, মুখে মুখে জবাব দিয়ে দিয়েছে। আরগফ বেরিয়ে গেলে বলেছে, আগেই কটেজটা পুড়ে না গেলে সে-ই পুড়িয়ে দিত।'

'তারমানে সন্দেহ করার মত আরও একজন পাওয়া গেল!' চোখ বড় বড় করে বলল মুসা। 'আজ যদি লাগানোর ইচ্ছে হয়, তাহলে আগেই বা হবে না কেন? আরগফ নিশ্চয় সব সময়ই খারাপ ব্যবহার করেন। হয়তো মিসেস ডারবিই লাগিয়েছে। লাগানোর সুযোগটা তারই সবচেয়ে বেশি ছিল।'

'চারজনকে পেয়ে গেলাম,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর। 'অর্থাৎ, চারজনের লাগানোর মোটিভ আছে। ভবঘুরে, মিস্টার দুর্গন্ধ, টরিস আর মিসেস ডারবি। হুঁ, ভালই এগোচ্ছে তদন্ত।'

'এগোচ্ছে কোথায়, এ তো পিছাচ্ছে,' মুসা বলল। 'সন্দেহ হয় এমন লোকের সংখ্যা বাড়ছেই। জটিল করে তুলছে তদন্ত। চার-চারজন মানুষ, কে লাগিয়েছে, কি করে বের করব এখন?'

'এত ভাবছ কেন? গোয়েন্দাগিরির কাজ কঠিনই হয়। গোয়েন্দার সামনে যেচে এসে তো আর বলবে না অপরাধী যে, আমি করেছি কাজটা। যাই হোক, চারজনের গতিবিধির খবর নেব আমরা। তারপর একজন একজন করে তালিকা থেকে নাম কাটব। যে বাকি থাকবে তার ওপর তখন সন্দেহ জোরাল হবে। বাদ দেয়ার ব্যাপারটা, যেমন ধরো, মিস্টার দুর্গন্ধ সেদিন কটেজের কাছে যাননি যদি শিওর হতে পারি, তাহলে তাঁকে বাদ। টরিস যদি অনেক দূরে থেকে থাকে তাহলে সে-ও বাদ। এমনি করেই চলতে থাকবে।'

'অনেক দূরে বলতে কি বোঝাতে চাইছ?' প্রশ্ন করল রবিন।

'এই ধরো, মাইল পঞ্চাশেক দূরে কোথাও। যেখান থেকে চট করে এসে আগুন লাগিয়ে আবার চলে যাওয়া সম্ভব হবে না। যদি জানি, নিশ্চিত হতে পারি টরিস সেদিন বিকেলে তার মায়ের সঙ্গেই ছিল, তাহলেও সে বাদ। এ ভাবেই একজনের পর একজনকে বাদ দেব।'

'যদি দেখা যায় সবাই বাদ পড়েছে?'

'তাহলে অন্য কাউকে সন্দেহ করার কথা ভাবব।'

'আর যদি দেখা যায় চারজনই কাছাকাছি ছিল, কটেজের কাছে যেতেও দেখা গেছে, তখন?'

'তখন অবশ্য ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যাবে। তবে আগে থেকেই এত কিছু ভেবে লাভ নেই। কাজে নামি, তারপর দেখা যাবে।'

'ভবঘুরেটাকে খুঁজে বের করব কি করে?' মুসার প্রশ্ন। 'জানোই তো

ওরা কেমন হয়, আজ এখানে কাল ওখানে। বাড়ি নেই ঘর নেই, কোথায় যে চলে যাবে ঠিক আছে কিছু? আর খুঁজে পেলেও তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না বাড়িটাতে আগুন লাগিয়েছে কিনা। কি করে প্রমাণ করব?'

'কেন, সূত্রের কথা ভুলে গেলে?' জবাব দিল রবিন, 'প্রথমেই ওর জুতোর সাইজটা দেখে নেব। তারপর তলাটা। মিলে গেলে দেখব বাদামী কোট পরেছে কিনা...'

'আমি যখন দেখেছি,' কিশোর বলল, 'তখন কিন্তু তার গায়ে কোট ছিল না, ছিল ম্যাকিনটশ।'

একটা মুহূর্ত কোন জবাব খুঁজে পেল না রবিন কিংবা মুসা। তারপর রবিন বলল, 'হয়তো ম্যাকিনটশের নিচেই আছে কোটটা। বেড়ার ভেতরে ঢোকার আগে ম্যাকিনটশ খুলে নিয়ে থাকতে পারে।'

এটা ঠিক মেনে নিতে পারল না কিশোর, সব সময় যেটা পরে থাকে সেটা কোন কারণ ছাড়া খুলতে যাবে কেন? তাছাড়া এখন শীতকাল।

মুসা বলল, 'কোট পরেছে কিনা দেখাটা তো পরের কথা, আগে তো খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে। এই সমস্যার সমাধান করি কি করে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল কিশোর, 'আরি, টিটুর ডাক না? নিশ্চয় ফারিহা এসেছে।'

জোরাল হলো কুকুরের ডাক। ছুটে ঘরে ঢুকল টিটু। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল গলা ফাটিয়ে। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

তার পেছনেই ঢুকল ফারিহা। সে-ও উত্তেজিত। কাউকে কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জানো কাকে দেখেছি! ভবঘুরেটাকে!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'বলো কি! কোথায়?'

কিশোরও উঠে দাঁড়াল। 'কি করে জানলে ওই লোকটাই ভবঘুরে?'

'জানব না কেন? গায়ে পুরানো ম্যাকিনটশ, মাথার হ্যাটটা তো পুরানো হতে হতে বাদই হয়ে গেছে, চূড়ায় ইয়াবড় এক ছিদ্র, ও রকম হ্যাট যে কেউ পরে, ইস্...'

'হ্যাঁ, ঠিক লোককেই পেয়েছ,' কিশোর বলল।

'কিন্তু কোথায় দেখলে তাকে তুমি?' তখুনি যাওয়ার জন্যে তৈরি মুসা।

'টিটুকে নিয়ে তো বেরোলাম। খুব ভাল কুকুর, ওকে নিয়ে বেড়াতে যা মজা। সব কিছুতেই আগ্রহ, সব কিছুই তার দেখা চাই। রাস্তা পার হয়ে মাঠে নামলাম, চলে গেলাম নদীর ধারে। হাঁটতে হাঁটতে চললাম আরও দূরে, আরও দূরে। একটা মাঠে চলে গেলাম যেখানে ভেড়া চরে। আর তার কাছেই একটা খড়ের গাদা।'

খোক খোক করে ছোট ছোট দুটো হাঁক ছাড়ল টিটু, যেন ফারিহার কথা সমর্থন করেই। তার গলা জড়িয়ে কাছে টেনে নিল ফারিহা, 'লক্ষ্মী কুকুর তুই, টিটু। ওখানেই লোকটাকে দেখলাম আমরা, তাই না রে?'

টিটু বলল, 'গাররর!'

'দেখলে তো? সে-ও দেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে খড়ের গাদাটার কাছে

যেতেই নাক ডাকার শব্দ কানে এল। ঘুরে ওপাশে যেতেই দেখি, ও মা, একটা ভবঘুরে…'

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না মুসা। 'এখনও আছে?'

'জানি না। থাকতে পারে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি জুতো পরেছে সে, দেখেছ?'

'হায় হায়, এই কথাটাই তো মনে ছিল না!' বোকা হয়ে গেল যেন ফারিহা। 'সহজেই দেখতে পারতাম! ঘুমিয়ে ছিল!'

'জলদি চলো!' বলে আর দেরি করল না মুসা। ছুটে বেরোল ঘর থেকে। তার পেছনে অন্যেরা।

প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে খড়ের গাদাটার কাছে পৌঁছল ওরা। কাছে আসতেই কানে এল নাক ডাকার শব্দ। ফিরে তাকিয়ে সবাইকে শব্দ না করতে ইশারা করল মুসা। তারপর ইশারায় কিশোরকে এগিয়ে যেতে বলল, দেখে আসার জন্যে।

গরগর শুরু করেছিল টিটু। তাকে থামাল কিশোর। কুকুরটাকে ফারিহার কোলে তুলে দিয়ে গাদার পাশ ঘুরে এগোল।

খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে মহাআরামে নাক ডাকাচ্ছে একজন বুড়ো লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ধূসর ভুরু, লাল নাক, পুরানো হ্যাটের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে লম্বা ধূসর চুল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর পা টিপে টিপে ফিরে এল আবার।

ফিসফিস করে জানাল, 'হ্যাঁ, এই লোকটাই। কিন্তু ম্যাকিনটশ সরিয়ে ভেতরের কোট দেখাটাই হবে মুশকিল। পা দুটোও এমনভাবে বাঁকিয়ে রেখেছে, জুতোর তলা দেখা যায় না। মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘাড়টাড় বাঁকিয়ে চেষ্টা করলে হয়তো দেখা যায়।'

'দাঁড়াও, দেখে আসি,' মুসা বলল। 'তোমরা এখানে থাকো। টিটুকে চুপ করিয়ে রাখো, আর দেখো কেউ চলে আসে কিনা।'

পা টিপে টিপে আবার অন্য পাশে চলে এল সে। নাক ডাকিয়ে চলেছে লোকটা। তার কাছে নিঃশব্দে বসে পড়ল মুসা। প্যান্টটা এতই ময়লা, কি রঙ ছিল তা-ও বোঝা যায় না। ম্যাকিনটশ ফাঁক করে নিচে কি আছে দেখার জন্যে হাত বাড়াল সে।

নড়ে উঠল লোকটা। ঝট করে হাত সরিয়ে নিল মুসা। ম্যাকিনটশ সরানোর সাহস আর হলো না। জুতোর তলাটা দেখার জন্যে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

ঠিক এই সময় চোখ মেলল লোকটা। মুসাকে ও রকম করে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে কপালে উঠল চোখ। বলে উঠল, 'এই, কি হয়েছে তোমার?'

ভীষণ চমকে লাফ দিয়ে উঠে বসল মুসা।

'পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছ,' আবার বলল লোকটা, 'ব্যাপার কি? আমাকে এ দেশের রাজা মনে করেছ নাকি?' ধমকে উঠল পরক্ষণেই, 'যাও,

সরো এখান থেকে! পোলাপান আমি একদম সহ্য করতে পারি না। বিচ্ছু একেকটা, জ্বালানোর ওস্তাদ!'

সরে এল মুসা।

আবার চোখ মুদল লোকটা। নাক ডাকানো শুরু হতে দেরি হলো না। আবার মাথা নুইয়ে জুতোর তলা দেখতে যাবে মুসা, এই সময় মৃদু শিস শোনা গেল ওপাশ থেকে। সঙ্কেত, লোক আসছে। আগন্তুক চলে না যাওয়া পর্যন্ত আর জুতোর তলা দেখা যাবে না। মাটিতে পড়ে ও রকম উঁকিঝুঁকি দিতে দেখলে লোকটার সন্দেহ হবেই। বাধ্য হয়ে অন্যদের কাছে সরে চলে এল মুসা।

'আসছে নাকি কেউ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর, 'ঝামেলা!'

সর্বনাশ! ওটা আবার এ দিকে কেন? খড়ের গাদায় গা মিশিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল মুসা। ফগই আসছে। মনে হচ্ছে খড়ের গাদাটার পাশ দিয়েই যাওয়ার ইচ্ছে। বিড়বিড় করল সে, 'মরতে আসার আর জায়গা পেল না!'

ঘাবড়ে গেল গোয়েন্দারা। ওদেরকে দেখলে চটে গিয়ে কি যে করবে ফগ কে জানে! মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজল ওরা। একটা মই উঠে গেছে গাদার ওপরে। আর কোন উপায় না দেখে সেটা বেয়েই সবাইকে ওপরে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিল মুসা। একে একে উঠে গেল ফারিহা, রবিন ও কিশোর। টিটুকে একহাতে নিয়ে আরেক হাতে মই ধরে মুসাও উঠে পড়ল। সময়মতই লুকিয়ে বসল।

হঠাৎই ভবঘুরের ওপর চোখ পড়ল ফগের। থমকে দাঁড়াল। যেদিকে চলেছিল সেদিকে না গিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল গাদার দিকে।

ওপর থেকে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দারা, ফগ কি করে দেখার জন্যে।

নিঃশব্দে লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল পুলিশম্যান। পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল। তার ভেতর থেকে বের করল একটা কাগজ। তাতে জুতোর নকশা আঁকা।

মুসার গায়ে এত জোরে ঠেলা মারল কিশোর, আরেকটু হলেই পড়ে যেত মুসা। সামলে নিল কোনমতে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'দেখেছ, আমাদের মতই নকশা এঁকে নিয়েছে! যত বোকা ভেবেছিলাম, ততটা সে নয়!'

পা টিপে টিপে লোকটার পায়ের পাতার কাছে গিয়ে এ ভাবে ঝুঁকে, ও ভাবে ঝুঁকে, মাথা নামিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে জুতোর তলা দেখার চেষ্টা করতে লাগল ফগ। কোনভাবেই না পেরে শেষে মুসার মতই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দেখার জন্যে।

আর ঠিক এই সময় আবার চোখ মেলল লোকটা। পুলিশকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে এতটাই অবাক হলো, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল,

যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে। বিড়বিড় করতে লাগল, 'স্বপ্ন দেখছি নাকি আমি! প্রথমে একটা ছেলে...এখন পুলিশ গড়াগড়ি খাচ্ছে পায়ের কাছে! সত্যিই কি রাজা হয়ে গেলাম!'

আর লুকোছাপার মধ্যে না গিয়ে খসখসে গলায় ফগ বলল, 'না, রাজা হওয়া তোমার কপালে নেই। আমি তোমার জুতোর তলা দেখতে চাইছি।'

'কেন, ওপরটা দেখে চলছে না!' মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে লোকটার। 'এই ছেঁড়া জুতো এত দামী জিনিস হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, গেল। আমি শুধু তলাটাই দেখতে চাই!'

'আমি আপনাকে জুতোর তলা দেখাতে যাব কেন?'

'আমি বলছি, তাই। কারণ আছে বলেই দেখতে চেয়েছি,' কঠোর কণ্ঠে বলল ফগ।

একটা মুহূর্ত নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। কণ্ঠস্বর কিছুটা নরম করে বলল, 'যদি না দেখাই?'

'ঝামেলা! তাহলে থানায় ধরে নিয়ে যাব। এসো আমার সঙ্গে।'

থানার কথা শুনে ভড়কে গেল লোকটা। পিছাতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ ঘুরে মারল দৌড়।

গর্জে উঠে তার পিছু নিতে গেল ফগ।

দেখার জন্যে আরেকটু সরতে গেল কিশোর। এতটাই উত্তেজিত, সরার যে আর জায়গা নেই খেয়ালই করল না। গেল পিছলে। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। ধড়াস করে পড়ল মাটিতে।

বিকট চিৎকার শুনে চমকে ফিরে তাকাল ফগ। তাজ্জব হয়ে গেল কিশোরকে দেখে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল উঁকি দিয়ে আছে আরও অনেকগুলো মুখ। গর্জন করে উঠল সে, 'এই, ওখানে কি করছ! নামো জলদি! চাষী ধরতে পারলে বুঝবে মজা, কান আর একটারও আস্ত রাখবে না! কতক্ষণ ধরে আছো ওখানে? গুপ্তচরগিরি করা হচ্ছে, না? ঝামেলা!'

এমন গোঙানো শুরু করল কিশোর, লোকটার পেছনে যাবে, না ছেলেটার কাছে আসবে, এই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল ফগ। শেষে কিশোরের কাছে আসাটাই প্রয়োজন মনে করল। এসে ধরে তাকে টেনেটুনে তুলল। তুলেই মারল এক ঝাঁকুনি, 'ওখানে উঠে কি দেখছিলে?'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'মা গো, মরে গেছি! একটা হাড্ডিও আর আস্ত নেই! হাঁটু, কনুই, কোমর, কিচ্ছু নেই, সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে!' গোঙাতে লাগল সে, যেন যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।

মই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমে এল অন্যেরা। এমন করে বলছে কিশোর, সবাই বিশ্বাস করে বসেছে তার কথা। ওরা ভাবল, সত্যিই বুঝি মারা যাচ্ছে সে। কুকুরটা ঘুরতে শুরু করল ফগের পায়ের কাছে, যেন কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজছে।

তার দিকে একটা লাথি হাঁকাল ফগ, কিন্তু লাগাতে পারল না; তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র কুকুরটা, লাফ দিয়ে সরে গেল।

চিৎকার করে উঠল পুলিশম্যান, 'যত্তসব ঝামেলা! যাও, ভাগো এখান থেকে! আর যদি ঝামেলা করতে দেখি, থানায় ধরে নিয়ে যাব! ভাগো! ভাগো!'

কিশোরকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল তার বন্ধুরা। তার গোঙানি দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ফগকে। হঠাৎ মনে পড়ল ভবঘুরের কথা। ফিরে তাকিয়ে দেখে, গায়েব হয়ে গেছে লোকটা।

আবার ফিরে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে। রেগেমেগে ধমকে উঠল, 'ঝামেলা! দিলে তো সব নষ্ট করে! গেল পালিয়ে লোকটা!'

'কেন, চোর নাকি ও?' কিছুই যেন জানে না, এমন নিরীহ ভালমানুষের ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কিছু করেছে?'

'সেটা তোমাদের বলতে যাব কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ফগ। 'খবরদার, আমার সামনে আর পড়বে না! ঝামেলা!' বলে আর দাঁড়াল না, গটগট করে হাঁটতে শুরু করল।

ককাতে লাগল কিশোর, 'আমার কোমরটা গেছে! ওফ্, বাবা গো, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না!' হাড্ডি না ভাঙলেও ব্যথা মোটামুটি ভালই পেয়েছে।

'না পারলে সরাইতে চলে যাও,' মুসা বলল। 'একা একা যেতে পারবে, নাকি দিয়ে আসতে হবে?'

'পারব, উফ...তোমরা কি করবে?...উফ্, বাবা গো! গেছি আজকে!'

'ঝামেলা ধরে ফেলার আগেই ভবঘুরেটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। জুতোর সোলটা দেখতেই হবে। ঠিকই বলেছ, ঝামেলাকে যতটা বোকা ভেবেছি আমরা, ততটা সে নয়। ভাগ্যিস কোটের কাপড়টা আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, যাও। কি হয়, জানিও আমাকে...উফ্...'

ফারিহাকে বলল মুসা, 'তোমার আসার দরকার নেই। তুমি কিশোরের সঙ্গে চলে যাও।'

এক হাতে কোমর চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে চলল ফারিহা, মুসাদের সঙ্গে যেতে পারলেই খুশি হত সে। ওদের আগে আগে লাফাতে লাফাতে চলল টিটু।

আট

ভবঘুরে যেদিকে গেছে তাড়াতাড়ি করে সেদিকে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা। রবিন ভাবছে, মুসা অতভাবে চেষ্টা করে দেখল, ফগও দেখল, তবু লোকটার জুতোর তলা দেখতে পারল না। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। তলার ব্যাপারে কি সাবধান ছিল লোকটা, ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে?

কোথাও লোকটাকে দেখতে পেল না গোয়েন্দারা। চাষীর একজন শ্রমিককে কাজ করতে দেখে কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'একজন

বুড়োকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন? ভবঘুরে?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। বনের দিকে চলে গেল,' হাত তুলে দূরের ছোট বনটা দেখাল লোকটা।

সেদিকে দৌড় দিল ছেলেরা।

বনে ঢুকে খুঁজতে শুরু করল। বড় বড় গাছ আছে বনটাতে, ঝোপঝাড় আছে, লতায় ছেয়ে আছে সেগুলো।

ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগল ওদের। শুঁকে শুঁকে এগিয়ে গিয়ে দেখল পড়ে থাকা একটা মরা গাছের ওপর বসে আছে বুড়ো ভবঘুরে। মাথার হ্যাটটা খুলে রেখেছে, বেরিয়ে পড়েছে জট পাকানো এলোমেলো লম্বা চুল। আগুন ধরিয়ে একটা টিনের পাত্রে কি যেন রান্না করছে।

মুসাকে দেখেই কুঁচকে ফেলল ভুরু। 'তুমি! আবার এসেছ! আমার পিছে লেগেছ কেন? কি করেছি আমি?'

'মিস্টার আরগফের মুরগীর খোঁয়াড় থেকে ডিম চুরি করার চেষ্টা করেছেন,' মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিল মুসা। 'আমরা জানি।'

'আরগফ, হুঁহ্! আমি হলে শয়তানটার নাম রাখতাম শকুন, ধাড়ি শকুন!' কাঠি দিয়ে পাত্রের খাবার নাড়তে নাড়তে বলল বুড়ো।

'একজন ভদ্রলোককে শয়তান বলছেন, আপনি কি সাধু নাকি? ডিম চুরি করতে যাননি?'

'খিদে পেলে কি করব? প্রথমে তো চাইতেই গিয়েছিলাম, কুত্তার মত দূর দূর করে তাড়াল আমাকে বুড়িটা। খিদেয় পেট জ্বললে তুমিও চুরি করতে। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি করি না আমি। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, আমার কোন বদনাম দিতে পারবে না কেউ।'

'ক্ষতিই যদি না করেন, আরগফের বাড়ির খাদে লুকাতে গিয়েছিলেন কেন?'

অবাক হলো বুড়ো। 'আমি! আমি খাদে লুকাতে যাব কেন? খাদে তো লুকিয়েছে...' থেমে গেল সে। 'অনেক কথাই জানি আমি, বলব না। কে যায় বিপদ ঘাড়ে নিতে...পুলিশটাকে আমার পেছনে তোমরাই লাগিয়েছ, তাই না?'

'না। ও যে হুট করে ও ভাবে চলে আসবে আমরাও জানতাম না।'

'পুলিশটাকে আমার পেছনে লাগানো হয়েছে, যে-ই লাগাক। অথচ ডিম চুরি করতে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করিনি আমি...'

গুঙিয়ে উঠল বুড়ো। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে পড়েছে জুতোর ফুটো দিয়ে। পায়ের তুলনায় জুতো ছোট। ব্যথা লাগে সে জন্যে। টান দিয়ে জুতো খুলে নিল। মোজাটায় অসংখ্য ফুটো। সেটাও খুলে নিয়ে হাত বোলাতে লাগল পায়ে।

একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে জুতোটা। তলা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রবারের সোল নয়, চামড়ার, তা-ও ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে।

'কই, রবার সোল তো নয়!' ফিসফিস করে রবিনকে বলল মুসা।

'তারমানে খাদে বুড়ো লুকায়নি। কোটটাও দেখো, কি পুরানো। সবুজ রঙ, বাদামী নয়।'

'অ্যাই, ফিসফিস করে কি বলছ?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'যাও এখান থেকে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। আমি কারও কোন ক্ষতি করি না, কিন্তু লোকে খালি আমার পেছনে লাগে। বুড়িগুলো দেখলে তো এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন আমি একটা শুঁয়োপোকা। পুলিশ ভাবে চোর, রাজ্যের যত অপরাধ করে বেড়াই আমি। দোহাই তোমাদের, যাও।' শেষ দিকে করুণ হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর। হঠাৎ কি মনে পড়ায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'এই শোনো, তোমাদের বাড়িতে একজোড়া জুতো হবে? বড্ড কষ্ট, বুঝলে। একজোড়া জুতো পেলে আর কিচ্ছু চাইতাম না।'

'পায়ের সাইজ কি আপনার?' জানতে চাইল মুসা। ইচ্ছে, তার বাবার পুরানো জুতো যদি থেকে থাকে, দিয়ে দেবে।

কিন্তু সাইজ বলতে পারল না বুড়ো। জুতো কিনে পরার সামর্থ্যই হয়নি কখনও জীবনে, বলবে কি করে।

'দেখি, বাড়ি গিয়ে, বাবার পুরানো জুতোটুতো থাকতেও পারে,' বলল মুসা। 'কাল চলে আসুন আমাদের বাড়িতে। আরগফের বাড়ির কাছাকাছি প্রথম যে লাল বাড়িটা দেখবেন, ওটাই আমাদের। আসুন, একজোড়া জুতো পেয়েও যেতে পারেন।'

'কিন্তু পুলিশটাকে যদি খবর দিয়ে রাখো? গেলেই যদি ধরে?' বুড়োর চোখে সন্দেহ।

'কেন ধরবে? আপনি কোন অপরাধ করেছেন?'

'না।'

'তাহলে আর ভয় কিসের?'

তবু সন্তুষ্ট হতে পারল না বুড়ো। পাত্রের দিকে তাকাল। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল। তারপর অদ্ভুত দেখতে কি যেন বের করে নিয়ে খেতে শুরু করল, আর বিড়বিড় করে নিজেকেই বোঝাতে লাগল, 'আরগফটাও দেখলে তেড়ে আসতে পারে। আসুক। ওই ধাড়ি শকুনকে আমি ভয় করি না। কি করবে ও আমার? জানেই তো কেবল মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার...আগুন যেদিন লাগল সেদিনও অনেকের সঙ্গে করেছে...'

'আরগফ তেড়ে আসবেন কেন?'

'যদি বলে আগুন আমি লাগিয়েছি?'

'আপনি কি সত্যি লাগিয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে বলেও কিছু করতে পারবেন না। প্রমাণ করতে হবে। আপনি নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের বাড়িতে, কেউ কিছু করবে না আপনার। আমরা অন্তত করব না,' ঘড়ি দেখল মুসা। দেরি হয়ে গেছে। 'আমরা যাচ্ছি। আজকে ভেবেটেবে রাখুন, কিছু বলার থাকলে কাল বলবেন। কথা দিচ্ছি, সব গোপন রাখব আমরা, কোন কথা ফাঁস করব না।'

বাড়ি রওনা হলো দুই গোয়েন্দা।
রবিন চলে গেল তাদের বাড়ির দিকে।
মুসার আম্মা ভীষণ রেগে আছেন। ছেলেকে দেখেই ধমকে উঠলেন, 'কোথায় ছিলি?'
কোথায় ছিল সেটা বলতে চায় না মুসা। ওরা বাড়ি-পোড়া রহস্যের তদন্ত করছে, এটা জানলে আরও রেগে যাবেন মা, সব কিছুতে বাধা দিতে থাকবেন। হয়তো গোয়েন্দাগিরির এখানেই ইতি ঘটবে। বলল, 'বন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম।'
'মিথ্যে কথা! অন্য কিছু করেছিস। ফারিহা তো কখন এসে বসে আছে। সে তোর কথা কিছু বলতে পারল না। খবরদার বানিয়ে কথা বলবি না!'
মুসা বুঝল, ফারিহাও সব কথা গোপন রেখেছে।
'রবিনের সঙ্গে ছিলাম,' মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না মুসা।
ফারিহাও আছে সেখানে। মুসাকে বাঁচাতে প্রসঙ্গ আরেক দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, 'খালা, জানো, কিশোর আজ খড়ের গাদা থেকে পড়ে গেছে।'
'কিশোর মানে কে? ওই মোটা ছেলেটা? খড়ের গাদা থেকে পড়ল যে দেখলি কি করে? তারমানে তোরাও ছিলি সেখানে। কি করছিলি?'
এ তো মহাবিপদ, রীতিমত ঘাবড়ে গেল মুসা। মা যে ভাবে জেরা শুরু করেছে, কখন যে ফাঁস করে দেবে সব ফারিহা, আল্লাহ্ই জানে। তাড়াতাড়ি চলে গেল আরেক কথায়, 'মা, বাবার পুরানো জুতোটুতো আছে?'
'কেন?' অবাক হলেন মা। বাবার পুরানো পোশাকের খবর তো কখনও নেয় না মুসা!
'মা, পেলে একজন খুব খুশি হত।'
'কেন খুশি হত?'
'তার জুতো একেবারে ছিঁড়ে গেছে, মা। বুড়ো আঙুল বেরিয়ে থাকে,' মায়ের মনে করুণা জাগিয়ে তাঁকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করল মুসা। 'দেখলে তোমারও কষ্ট হত।'
'লোকটা কে?' কোন করুণা-টরুণা নেই, মাকে যেন আজ জেরা করার নেশায় পেয়েছে।
থমকে গেল মুসা। এইবার কি জবাব দেবে? ভবঘুরেটার কথা বলতেই হবে। এরপরও যদি জেরা চলতে থাকে, গোয়েন্দাগিরির খবর ফাঁস হয়ে পড়বেই।
ফস্ করে জবাব দিয়ে দিল ফারিহা, 'একজন ভবঘুরে, খালা।'
হাল ছেড়ে দিল মুসা, নাহ্, আর কোন আশা নেই।
'ভবঘুরে! মুসা, এ সব কি শুনছি? আজকাল ফকিরদের সঙ্গেও মেলামেশা শুরু করেছিস নাকি?'
'না, মা,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা, 'মেলামেশা করছি না। লোকটার অবস্থা দেখে খুব কষ্ট লাগল তো, তাই···তুমিই তো বলো, গরীব মানুষের জন্যে,

যারা আমাদের চেয়ে খারাপ আছে, অনেক কষ্টে আছে, তাদের প্রতি মমতা দেখাতে, বলো না? আমি তো তাই করছি। বুড়ো মানুষ, বেচারা, একজোড়া জুতোর জন্যে এত কষ্ট পাচ্ছে, দিতে বলে কি খারাপ করলাম?'

এতক্ষণে নরম হলেন মা, 'সেটা প্রথমে বললেই হত। এত কথার কি দরকার ছিল?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ফারিহার উত্তেজনাও দূর হলো।

মা বললেন, 'দেখি, খুঁজে, থাকতে পারে। পেলে দিয়ে দিস। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বস। এমনিতেই তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

খাওয়া শেষ করে মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানে চলে এল মুসা। ছাউনিতে বসে আছে ফারিহা। তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই ফারিহা, কিশোর কেমন আছে? ওর চাচী কিছু বলেছে?'

'না, বেঁচে গেছে, ওর চাচা-চাচী সরাইতে নেই, বাইরে গেছেন। সাংঘাতিক ফুলে গেছে ওরা ব্যথা পাওয়া জায়গাগুলো। দেখতে অদ্ভুত লাগে। ও বলল, ব্যথা পেলে নাকি ওর এ রকম হয়ে যায়। এমন হতে আর দেখিনি কারও। মোটা বলেই হয়তো, তাই না?'

'কি জানি,' গাল চুলকে বলল মুসা, 'মোটা মানুষ হলেও অমন হবে কেন?'

সে কথার জবাব দিতে পারল না ফারিহা, জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োটাকে পেয়েছিলে?'

'পেয়েছি। জুতোর তলা দেখেছি, কোট দেখেছি। ওই লোক নয়, বুঝলে, সে খাদে নামেনি সেদিন। লোকটা খারাপ না। তবে মনে হলো অনেক কিছু জানে। জুতোর লোভ দেখিয়ে কাল আসতে বলে দিয়েছি। দেখি তখন পটিয়ে-পাটিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করা যায় কিনা।'

এই সময় বাগানে কথা শোনা গেল। দরজায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল মুসা, রবিন আর কিশোর আসছে। ওদের আগে আগে হাস্যকর ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে আসছে টিটু।

এদিকেই আসছিল কিশোর, পথে রবিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে সে। কাছে এসে হাসল।

'ব্যথা এখন কেমন?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'আছে।'

'ব্যথা পেলে নাকি তোমার জখমগুলো অদ্ভুত হয়ে যায়?' ফারিহার মুখে শোনার পর থেকেই কিশোরের আহত জায়গার অবস্থা দেখার কৌতূহল হচ্ছে মুসার।

ছাউনির ভেতরে ঢুকে শার্ট খুলে দেখাল কিশোর, 'এই যে এ রকম।'

ফারিহা তো আগেই দেখেছে, মুসা আর রবিনও দেখে অবাক হয়ে গেল।

'আশ্চর্য!' মুসা বলল, 'এমন রঙ কেন? ছড়িয়েছেও তো অনেকখানি! মানুষের হয় নীল কিংবা বেগুনী, তোমার অমন সবুজ আর হলুদ হয়ে যাচ্ছে

কেন?’

'কি জানি…’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল রবিন, ‘ভিনগ্রহের মানুষদের নাকি অমন হয়, একটা সাইন্স ফিকশনে পড়েছি!’

চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেল মুসার। ভূতপ্রেতকে সে সাংঘাতিক ভয় পায়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘সত্যি তুমি পৃথিবীর মানুষ তো?’

‘তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সাইন্স ফিকশন বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, ওগুলো সব গুল। আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। তবে ব্যথা পেলে আহত জায়গাগুলোর যে অদ্ভুত চেহারা হয়ে যায়, সেটা দেখে অনেকেই অবাক হয়। চাচী তো আমাকে ডাক্তারের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখে বললেন, চামড়ার নিচে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বির জন্যে অনেক সময় হয় ও রকম। ওজন কমে চর্বি সরে গেলেই আবার ঠিক হয়ে যায়।’ হাসল কিশোর, ‘একবার হয়েছিল কি, শোনো। বল খেলতে গিয়ে গোল পোস্টে বাড়ি খেলাম। পরদিন দেখি ব্যথা পাওয়া জায়গাটার চেহারা হয়ে গেছে গির্জার ঘণ্টার মত।’

‘তাই নাকি!’ সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে বলল ফারিহা, ‘ইস্, যদি দেখতে পারতাম!’

‘আরেকবার, একটা ছেলে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল আমাকে। পরদিন সকালে উঠে দেখি, চমৎকার একটা সাপের ছবি আঁকা হয়ে গেছে শরীরে।’

তিন শ্রোতাকেই মুগ্ধ করে ফেলল কিশোর। মুসা তো আবদারই ধরে বসল, ‘আস্তে একটা বাড়ি মেরে দেখি? খুব বেশি ব্যথা পাবে?’

কিশোর বলল, ‘তা পাব না। তবে জোরে না মারলে ছবি আঁকা হবে না। বাড়ি দিয়ে দাগ ফেলতে হবে।’

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা, ‘তাহলে আর হলো না। মজা দেখার জন্যে কাউকে ব্যথা দেয়া কোন কাজের কথা নয়…’

‘আচ্ছা, আসল কথা বলো এখন। বুড়োটাকে পেয়েছিলে?’

‘পেয়েছি,’ জবাব দিল রবিন। ‘ওর জুতোর তলা দেখেছি, কোট দেখেছি, কথাও বলেছি। ও সেদিন খাদে নামেনি। কাল ওকে আসতে বলে দিয়েছে মুসা।’

‘আসবে?’ আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ।

‘আসতে পারে। জুতোর লোভ দেখিয়েছে তো।’

সব কথা খুলে বলল তাকে মুসা আর রবিন।

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল দু-বার কিশোর। তারপর বলল, ‘হুঁ, মনে হচ্ছে লোকটা কিছু জানে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকটের আগেই তার সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার। টরিস আর মিস্টার দুর্গন্ধের সঙ্গে নিশ্চয় আরগফকে ঝগড়া করতে দেখেছে সে। কি কি কথা হয়েছে, শুনেছে। ঝামেলা সেটা জেনে গেলে আমাদের আগেই হয়তো রহস্যটা ভেদ করে ফেলবে।’

'কি করা যায়, বলো তো?'

মাথা দুলিয়ে বেশ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে টিটু বলল, 'খোক! খোক! খোউ! যেন মুসার কথায় সমর্থন দিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, কি করা যায়?'

চালবাজ কুকুরটার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। কাছে টেনে নিল ওকে ফারিহা।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে, বুড়োটা আগুন লাগায়নি। সে লাগিয়ে থাকলে, এ এলাকায় আর থাকত না। লাগিয়েই পালাত, বহুদূরে চলে যেত। টরিসের সঙ্গে দেখা করা জরুরী হয়ে পড়েছে এখন।'

'করাটা বোধহয় তেমন কঠিন হবে না,' মুসা বলল। 'পাশের গাঁয়েই আছে যখন...'

'কাল তাহলে চলেই যাই, কি বলো?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা যাওয়া যায়।'

'হাঁটতে পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আমার অবশ্য এখানে থাকা দরকার। যদি বুড়ো সত্যি চলে আসে? জুতোর লোভ আছে, আসার সম্ভাবনাই বেশি। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমার।'

'হাঁটতে না পারার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল।

'আজকে তো খোঁড়াচ্ছ।'

'কাল সেরে যাবে। আমার ব্যথা বেশিক্ষণ থাকে না।'

'সেটাও কি চর্বির জন্যে?' জানতে চাইল রবিন।

'তা জানি না।'

ঠোঁট ফুলিয়ে ফারিহা বলল, 'তোমরা একেকজন তো একেক কাজ নিয়ে বসে আছো, আমি কি করব? মুসা, কিশোরদের সঙ্গে আমিও যাই?'

'না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা। 'তুমি এতটা হাঁটতে পারবে না। আর যদি পারও, তাহলেও যেতে দেয়া যাবে না। কত সময় লাগবে তার ঠিক নেই। এতক্ষণ তোমাকে না দেখলে মা অস্থির হয়ে যাবে, জবাব দিতে দিতে জান যাবে আমার। আমি এই বিপদ ঘাড়ে নিতে পারব না।'

কি আর করবে? চুপ হয়ে গেল ফারিহা। ছোট হওয়ার অনেক জ্বালা। কবে যে মুসাদের মত বড় হবে! দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

নয়

মুখে স্বীকার না করলেও ব্যথাটা ভালই পেয়েছে কিশোর। সেদিন আর কিছু করার মত অবস্থা নেই তার। সুতরাং তাকে আর ফারিহাকে বাগানে রেখে বেরোল মুসা আর রবিন। বসে বসে বই পড়তে লাগল কিশোর। ফারিহা খেলতে লাগল টিটুর সঙ্গে।

আরগফের বাড়তে মিসেস ডারবির সঙ্গে দেখা করতে চলেছে দুই গোয়েন্দা। আগুন লাগানোর ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল কিনা বুঝতে চায়।

মুসা বলল, 'মহিলা কিছু করেছে বলে আমার মনে হয় না। তবে শার্লক হোমস বলে, গোয়েন্দাদের কোন কিছুই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কি বলো, ঠিক না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমি যাচ্ছি আসলে টরিসের ঠিকানাটা নিতে।'

'এক কাজ করি, দাঁড়াও, মিসেস ডারবির বেড়ালটার জন্যে খাবার নিয়ে যাই। মহিলা খুশি হবে। সাহায্য করবে আমাদের।'

'ভাল কথা মনে করেছ। চলো, আমাদের রান্নাঘর থেকে নিয়ে নেব।' মোড় নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল রবিন।

মা ওপরতলায়, রান্নাঘরে রাঁধুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছে একটা মাছের মাথা চাইল রবিন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রাঁধুনি, 'মাছের মাথা দিয়ে কি করবে?'

'বেড়ালকে দেব।'

বেশি কথা বলে না মহিলা। ফ্রিজ খুলে একটা মাথা বের করে দিল। সেটা কাগজে মুড়ে বেরিয়ে এল রবিন।

নির্জন লাগছে আরগফের বাড়িটা, কাউকে চোখে পড়ল না। আস্তে করে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। চলে এল রান্নাঘরের কাছে। জানালায় উঁকি দিল। মিসেস ডারবিকে দেখা গেল না। ঝুঁকে বসে কি যেন লিখছে পলি।

ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রবিন। চমকে মুখ তুলে তাকাল পলি। চোখ দেখে মনে হলো, কাঁদছিল।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ডারবি কোথায়?'

'ওপরে। মেজাজ খুব খারাপ। তার গায়ের ওপর দুধের জগ ফেলে দিয়েছিলাম, সে জন্যে। আমি যতই বোঝাই ইচ্ছে করে ফেলিনি, বিশ্বাস করে না।' মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও কে? তোমার বন্ধু বুঝি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবিন, 'হ্যাঁ। ও মুসা। আচ্ছা পলি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'করো। আপনি আপনি করছ কেন? কেউ আপনি বললে আমার লজ্জা লাগে। তুমি করেই বলবে, কিছু মনে করব না।'

'হঠাৎ করে কাউকে তুমি বলতে আমারও লজ্জা লাগে। আচ্ছা, পলি, আগুন লাগার সময় তুমি কোথায় ছিলে? লাগতে দেখোনি?'

'বিকেলে আমার ছুটি ছিল সেদিন। গিয়েছিলাম এক জায়গায়। আসার পর দেখি পুড়ে গেছে।'

'কোথায় গিয়েছিলে, বলতে অসুবিধে আছে?'

দ্বিধা করল পলি। মাথা ঝাঁকাল। 'আছে। তবে আগুন লাগার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'কেন, তুমি কি ভাবছ তোমাকে সন্দেহ করছি আমরা?'

'করতেই পারো। অঘটন যখন একটা ঘটেছে, কত কিছুই তো হতে পারে এখন,' মুখ কালো করে বলল পলি।

তার এই আচরণে অবাক হলো দুই গোয়েন্দা। ওদেরকে যদি বেরিয়ে যেতে বলে দেয় এখন, এই ভয়ে মুসা বলল তাড়াতাড়ি, 'না না, তোমাকে সন্দেহ করছি না আমরা। আমাদের অবাক লাগছে, ঘরে বসেও কেন শুরুতেই পোড়া গন্ধ পেল না মিসেস ডারবি আর তার বোন...'

জানালার দিকে চোখ পড়তেই পলি বলল, 'ওই যে মিসেস ডারবির বোন আসছে।'

জানালা দিয়ে মুসা আর রবিনও তাকাল। ভীষণ মোটা এক মহিলা—মিসেস ডারবির চেয়ে মোটা—হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ড্রাইভওয়ে ধরে। মাথায় বড় একটা হ্যাট—সামনেটায় ফিতে দিয়ে তৈরি রঙিন ফুল বসানো, বড় বড় ফুলওয়ালা গাউন পরা, হাসি হাসি চোখ। রান্নাঘরের দরজায় ঢুকে গোয়েন্দাদের দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'হালো, মিসেস পটার,' শুকনো কণ্ঠে স্বাগত জানাল পলি, 'আসুন। মিসেস ডারবি ওপরতলায়, কাপড় বদলাতে গেছেন। চলে আসবেন এখুনি।'

হেলেদুলে এসে একটা রকিং চেয়ারে বসে সামনে পেছনে দোলাতে শুরু করল মিসেস পটার। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। বলল, 'বাপরে বাপ, যা গরম পড়েছে। ছেলেগুলো কে?'

'এই তো, কাছেই থাকি আমরা,' জবাব দিল রবিন। 'মিসেস ডারবির কিটির জন্যে একটা মাছের মাথা নিয়ে এসেছি।' ঝুড়ির দিকে তাকাল সে। টেবিলের নিচে আর এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াল তার দৃষ্টি। কিন্তু কোথাও ছানাগুলোকে দেখল না। 'বাচ্চাগুলো কই?'

আঁতকে উঠল পলি। 'সর্বনাশ! ওপরতলায় চলে যায়নি তো! মিসেস ডারবি বেরোতে না দিতে বলেছেন!'

'বাইরে-টাইরে গেছে হয়তো খেলতে,' অভয় দিয়ে বলল মুসা। 'বেড়ালের বাচ্চা কি আর খেলা ফেলে একজায়গায় বসে থাকে নাকি।' হলঘরের দিকের দরজাটা খোলা। কোনখান থেকে তাদের কথা আরগফ শুনে ফেলেন, এই ভয়ে এগিয়ে গিয়ে পাল্লাটা লাগিয়ে দিয়ে এল সে।

রবিন ডাক দিল, 'কিটি, এই কিটি, কোথায় তুই?'

ঘরে ঢুকল বেড়ালটা। ওপর দিকে লেজ সোজা করে ছুটে এল, মাছের গন্ধ পেয়েছে।

প্যাকেট খুলে মাছের মাথাটা বেড়ালের খাবারের বাসনে রেখে দিল রবিন।

কামড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে ওটাকে বাসন থেকে নামিয়ে নিল কিটি। মেঝেতে রেখে খেতে শুরু করল।

'আগুন দেখে ভয় পায়নি কিটি?' আসল কথায় আসার জন্যে বলল মুসা।

'জানি না। অত উত্তেজনার মাঝে বেড়ালের দিকে আর কে তাকাতে

গেছে,' মিসেস পটার বলল।

'আপনি নাকি সেদিন ছিলেন এখানে,' রবিন বলল, 'আপনার বোনের কাছে শুনলাম। কটেজটায় আগুন ধরল যে টের পেলেন না কেন?'

'কে বলল পাইনি। আমিই তো পেলাম প্রথমে। বার বার বলেছি, কেরোলিন, কিছু পুড়ছে। পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। সে-ই পাচ্ছিল না। নাকের ক্ষমতা ছোটবেলা থেকেই তার কম। সারা রান্নাঘরে গন্ধ শুঁকে বেড়িয়েছি। এমন কি হলঘরে গিয়েও খুঁজে এসেছি। কিছুই দেখলাম না।'

'মিসেস ডারবি খোঁজেননি?'

'তার খোঁজার মত অবস্থাই ছিল না। দুপুর থেকেই বাতের ব্যথাটা বাড়ছিল। আটকে ফেলেছিল তাকে।'

'আটকে ফেলেছিল মানে?' আগ্রহ ফুটল মুসার চোখে।

'চায়ের সময় হয়ে গিয়েছিল তখন, এই রকিং চেয়ারটাতেই বসে ছিল। আমাকে বলল, টেরি, আমি তো গেছি আটকে। বাতের ব্যথাটা এত বেড়েছে, নড়তেই পারি না। বললাম, বসে থাকো। তোমাকে কিছু করতে হবে না। চা-টাগুলো আমিই করে দিচ্ছি। মিস্টার আরগফও বাড়ি ছিলেন না, ডিনারের ঝামেলা নেই, ফলে কাজ অতটা ছিল না। বললাম, তুমি যতক্ষণ ভাল না হও আমি এখানেই থাকব।'

কান খাড়া করে শুনছে গোয়েন্দারা। দু-জনে একই কথা ভাবছে: *মিসেস ডারবি যদি চেয়ার থেকেই উঠতে না পারে, বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে থাকে দুপুর থেকে, তাহলে কটেজে আগুন লাগাতে যাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে।*

'তারমানে,' রবিন বলল, 'আপনি আগুনটা না দেখা পর্যন্ত চেয়ার থেকেই ওঠেননি মিসেস ডারবি?'

'না। এখানেই বসে ছিল। যখন সাংঘাতিক পোড়া গন্ধ ছুটল, আমি রান্নাঘরে খুঁজে দেখলাম, হলঘর দেখলাম, শেষে দরজা খুলে উঁকি দিলাম বাগানে। আর তখনই দেখি, ও-মা, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কটেজে। চিৎকার করে উঠলাম, কেরি, আগুন লেগেছে, আগুন! দেখে যাও। আমাদের কিছু করা উচিত। ককাতে ককাতে তখন কোনমতে উঠল সে।'

মহিলার কথা যেন গিলছে গোয়েন্দারা। তারমানে সন্দেহের তালিকা থেকে আরও একজনকে বাদ দেয়া যায়। ভবঘুরে বাদ, মিসেস ডারবি বাদ, বাকি রইল আর দু-জন; টরিস এবং মিস্টার ফোর্ড।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মিসেস ডারবি। দুধ পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া পোশাকটা পাল্টে এসেছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল পলির দিকে। ছেলেদের দিকে চোখ পড়তে অবাক হলো।

'কেরি, ব্যথাটা এখন কেমন?' জিজ্ঞেস করল তার বোন।

'ভাল,' জবাব দিয়ে আবার রবিনের দিকে তাকাল মিসেস ডারবি। 'তুমি?'

'কিটিকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করল, মিসেস ডারবি। ওর জন্যে একটা মাছের মাথা নিয়ে এসেছি। এ হলো আমার বন্ধু মুসা আমান। বেড়ালটার কথা

শুনে দেখতে আসার জন্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্থির করে ফেলল আমাকে। না এসে আর পারলাম না।'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মিসেস ডারবির। তার *অমূল্য* বেড়ালের কেউ প্রশংসা করলে সাংঘাতিক খুশি হয়। 'তাই নাকি, ভাল ভাল।' বোনের দিকে এগোল সে। 'বাতের ব্যথা তো কমেছে, কিন্তু অন্য যন্ত্রণায় অস্থির।' আড়চোখে পলির দিকে তাকিয়ে নিল একবার। 'দেখো না, দুধ ফেলে ভিজিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করে ছুঁড়ে দিয়েছে আমার দিকে।'

'না, ইচ্ছে করে ফেলিনি,' কেঁদে ফেলবে যেন পলি। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কিছু একটা বলার জন্যে উসখুস করছে। শেষে বলেই ফেলল, 'মিসেস ডারবি, আমি এই চিঠিটা একটু পোস্ট করে দিয়ে আসি?'

'না,' কঠোর কণ্ঠে মানা করে দিল মিসেস ডারবি, 'কোথাও যেতে পারবে না এখন। মিস্টার আরগফকে চা দিতে হবে। ওসব চিঠিফিটি বাদ দিয়ে কাজের কাজ কিছু করো, যাও।'

'কিন্তু এখনকার ডাক ধরতে না পারলে...'

'ওসব বুঝি না। যেতে পারবে না বলেছি, ব্যস, যেতে পারবে না। যাও, কাজ করো।'

নীরবে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে কাপ পিরিচ বের করে ধুতে শুরু করল পলি। তার জন্যে রীতিমত কষ্ট হতে লাগল গোয়েন্দাদের। মুসা তো পারলে ধরে মেরেই বসে মিসেস ডারবিকে। কিন্তু উল্টোপাল্টা কিছু না করতে তাকে ইশারায় নিষেধ করল রবিন।

টরিসের কথা কি করে তুলবে ভাবতে লাগল সে। লোকটার ঠিকানাটা ওদের দরকার। ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার আরগফ নতুন খানসামা রেখেছেন?'

'কয়েকজনের ইন্টারভিউ তো নিল আজকে,' একটা আর্মচেয়ারে বসল মিসেস ডারবি। 'এখনও কাউকে পছন্দ করতে পারেনি। তবে লোক যখন দরকার, রাখতে তো একজনকে হবেই। আমি কেবল বলি, আর যে রকমই হোক, টরিসের মত বদমাশ যাতে না হয়।'

'থাকে কোথায় ওই লোকটা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এ গাঁয়ে ও রকম কাউকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

'এখানে থাকে না। কোথায় যেন থাকে...দাঁড়াও মনে করি, আমার আবার কিছু মনে থাকে না।...কোথায় যেন থাকে...'

মনে প্রায় করে ফেলেছিল মিসেস ডারবি, এই সময় পড়ল বাধা, যেন পড়ার আর সময় পেল না। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। উড়ে এসে মেঝেতে আছড়ে পড়ল তিনটে বেড়ালছানা, করুণ ভঙ্গিতে মিউ মিউ শুরু করল।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকাল সবাই।

গর্জন করে উঠলেন আরগফ, 'আমার পড়ার ঘরে গেল কি করে এগুলো? কোন কথাই কি মানা হবে না নাকি? এই শেষবার বলছি, আজকে বিকেলের

মধ্যে যদি এগুলোকে বিদেয় করা না হয়, সোজা নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দেব!'

ধাম করে দরজা লাগিয়ে দিতে যাবেন, চোখ পড়ল দুই গোয়েন্দার ওপর। গটগট করে ঢুকলেন রান্নাঘরে। বন্দুকে নিশানা করার ভঙ্গিতে হাত সোজা করে আঙুল তুললেন রবিনের দিকে, 'এই ছেলে, সেদিন না ঘর থেকে বের করে দিলাম, আবার ঢুকেছ কোন সাহসে!'

এক মুহূর্তও আর থাকার সাহস করল না দু-জনে। খোলা দরজার দিকে দিল দৌড়। ভয় পেয়েছে। ওদের মনে হয়েছে, বেড়ালের বাচ্চাগুলোর মতই ওদেরকেও ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন আরগফ।

ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটতে ছুটতে থেমে গেল মুসা। গেট এখনও অনেকটা দূরে। রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'এক কাজ করি, দাঁড়াও, লুকিয়ে থাকি কোথাও। আরগফ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আবার যাব। টরিসের ঠিকানা জানতেই হবে।'

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে পা টিপে টিপে আবার রান্নাঘরের দিকে চলল ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল। আরগফ নেই দেখে ঢুকে পড়ল আবার।

'আবার কি চাও?' হাসিমুখে বলল মিসেস ডারবি। 'এত ভয় পাওয়া লাগে নাকি? এমন দৌড় দিলে, যেন তোমরা ইঁদুর, বেড়ালে তাড়া করেছে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে আমার।'

'টরিসের ঠিকানা মনে করে ফেলেছিলেন আপনি, মিসেস ডারবি,' মুসা বলল।

'করেছিলাম, আবার ভুলে গেছি। চট করেই মনে হয় আমার, আবার চট করেই ভুলে যাই। দাঁড়াও, আবার মনে করার চেষ্টা করি…'

কপাল কুঁচকে, চোখ সরু করে মনে করার জোর চেষ্টা চালাল আবার মিসেস ডারবি।

টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেরা। ঠিক এই সময় আবার ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে এসে থামল রান্নাঘরের কাছে। জোরে টোকা দেয়া হলো দরজায়।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিসেস ডারবি। আরগফ এসেছেন ভেবে আবার দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ছেলেরা, কিন্তু যার কণ্ঠ শুনল, শুনে স্থির হয়ে গেল পাথরের মত। কল্পনাই করতে পারেনি এই লোক এখানে আসবে। কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট!

'দেখুন তো কি ঝামেলা, আবার বিরক্ত করতে এলাম, মিসেস ডারবি,' পকেট থেকে বড় একটা কালো নোটবুক বের করল ফগ। 'অনেক তথ্য দিয়েছেন, আরও কিছু দরকার। টরিসের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ছেলেরা। টরিসের পেছনেও লেগেছে তাহলে ঝামেলা!

'তার ঠিকানা বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল ফগ।

অবাক হয়েছে মিসেস ডারবি। চোখ বড় বড় করে বলল, 'আশ্চর্য, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে, মিস্টার কট…'

'ফগর্যাম্পারকট,' শুদ্ধ করে দিল ফগ।

স্পষ্ট বিরক্তি দেখা দিল মিসেস ডারবির চোখে। এতবড় নাম উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় বোধহয়, কিংবা ভুলে যায়। ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করল, 'সরি, হ্যাঁ, ফগ-র্যাম-পার-কট! অবাকটা কি লাগছে জানেন? এটাই মনে করার চেষ্টা করছিলাম আপনি ঢোকার আগে। ছেলেগুলো জানতে চেয়েছে।'

'ছেলেগুলো মানে?' দরজার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল ফগ। 'ও, তোমরা! ঝামেলা হলো তো! এখানে কি? শয়তানি করার আর জায়গা পাও না! টরিসের ঠিকানা দিয়ে কি করবে? যাও, ভাগো, যত্তসব ঝামেলা!'

চুপ করে রইল ছেলেরা। নড়ল না।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' গর্জে উঠল ফগ। 'বললাম যেতে! যাও, ভাগো! জরুরী কথা হচ্ছে এখন, তোমাদের সামনে বলা যাবে না।'

বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ভীষণ নিরাশ হয়ে, মনে মনে 'ঝামেলার' চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে বেরিয়ে এল দু-জনে। এগিয়ে চলল ড্রাইভওয়ে ধরে।

'দুই-দুইবার এই কাণ্ড ঘটল!' রাগ করে বলল রবিন। 'যখনই ঠিকানাটা মনে আসে মিসেস ডারবির, অমনি বাধা!'

'আল্লাহ্, এখন মনে না আসত! ঝামেলাকে বলতে না পারত…'

একটা ঝোপের ভেতর থেকে শিস শোনা গেল।

ঘুরে তাকাল দু-জনেই। ঝোপের আড়ালে থেকে হাত নেড়ে ইশারায় ওদেরকেই ডাকছে পলি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দু-জনে।

পলির চোখে ভয়। ফিসফিস করে অনুরোধ করল ওদেরকে, 'একটা কাজ করে দেবে আমার? চিঠিটা পোস্ট করে দেবে? টরিসের কাছে পাঠাচ্ছি, তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছে, সে আগুন লাগিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু সে লাগায়নি, আমি জানি। দেবে চিঠিটা পোস্ট করে?'

রান্নাঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল মিসেস ডারবির, 'পলি, কোথায় গেলে! এই পলি!'

চিঠিটা রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল পলি। উত্তেজিত এবং বিস্মিত হয়ে দুই গোয়েন্দা ছুটল গেটের দিকে। বাইরে বেরোনোর আগে আর থামল না। রাস্তা পার হয়ে পাতাবাহারের একটা বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে তারপর চিঠিটার দিকে তাকাল রবিন।

টিকেট নেই, তাড়াহুড়োয় লাগাতে ভুলে গেছে মেয়েটা। তবে ঠিকানা লেখা আছে।

'একেই বলে কপাল!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'সারাটা বিকেল ঠিকানাটা জানার চেষ্টা করে করে অস্থির হয়ে গেলাম, পেলাম না। এখন

একেবারে হাতে এনে তুলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে!'

'কিন্তু কথা হলো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন, 'চিঠিটা পোস্ট করে আমরা কি সাবধান করতে চাই টরিসকে? চিঠি পেলেই পালাবে সে, লুকিয়ে পড়বে, আর খুঁজে পাব না তাকে। রহস্যের সমাধানও করতে পারব না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। অবশেষে মাথা নাড়ল মুসা, 'না, চিঠি তাকে দেব না। আজই চায়ের পর আবার বেরোব আমরা। টরিসের মায়ের ওখানে যাব। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্য কোনভাবেও খবর পেয়ে পালাতে পারে সে।' হাত বাড়াল, 'দেখি, ওটা দাও। রেখে দিই।'

চিঠিটা নিয়ে পকেটে ভরে রাখল মুসা।

দশ

বাগানে ঢুকতেই ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল টিটু। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। মুসা আর রবিন কাছে গেলে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

'শুরুতে যতটা খারাপ,' জবাব দিল মুসা, 'শেষে ততটাই ভাল।'

টিটুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল ফারিহা। একটা ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে সে-ও দৌড়ে এল।

সব কথা খুলে বলল মুসা ও রবিন।

শেষে মুসা বলল, 'সাইকেল নিয়ে আজই যাচ্ছি আমি আর রবিন। এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল।'

'আমিও যাব!' ফারিহা বলল।

'হ্যাঁ, নিই, তারপর মা-র কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে মরি,' কড়া জবাব দিল মুসা। 'ও সবের দরকার নেই। তুমি বাড়িতেই থাকো।'

মুখ মলিন করে ফেলল ফারিহা।

কিশোর বলল, 'আমার যেতে খুবই ইচ্ছে করছে।'

'যাবে নাকি?' রবিন বলল, 'সাইকেল একটা জোগাড় করে দিতে পারব।'

'নাহ্,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'সাইকেলের ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারব না, ব্যথা লাগবে।'

'কোন কাজেই যখন আমাকে নেবে না,' কাঁদো কাঁদো গলায় ফারিহা বলল, 'আমাকে আর দলে রাখার দরকার কি? বাদই দাও!'

নরম হলো মুসা। 'কাজ চাও? বেশ, একটা কাজ দিতে পারি। মিস্টার দুর্গন্ধের ঠিকানা খুঁজে বের করো। পারবে?'

'নিশ্চয় পারব!' খুশি হয়ে উঠল ফারিহা। 'কিন্তু কি ভাবে করব?'

'সেটা আমি কি জানি? গোয়েন্দাগিরি যখন করতে চাও, নিজেই ভেবে বার করো।'

আবার মুষড়ে পড়ল ফারিহা। তার অবস্থা দেখে হেসে ফেলল কিশোর। বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। টেলিফোন বুক খুঁজলেই নামটা পেয়ে যাবে।'

'তোমরা তাহলে এই কাজই করো,' মুসা বলল। 'আমরা চা খেয়েই পাশের গাঁয়ে চলে যাব।'

চা দেয়া হয়েছে, ডাকলেন মুসার আম্মা।

রবিন আর ফারিহা তো গেলই, কিশোরকেও ডেকে নিয়ে গেল মুসা। টিটুকে কি আর ফেলে যাওয়া যায়। সে-ও গেল সঙ্গে। রুটি, মাখন আর জ্যাম দিয়ে বিকেলের নাস্তা সারা হলো।

বেলা তখনও অনেক বাকি। রবিন চলে গেল ওদের বাড়িতে, সাইকেলটা নিয়ে আসবে, তার মা-কেও বলে আসবে যে ফিরতে দেরি হতে পারে।

সাইকেল নিয়ে এল রবিন। বেরিয়ে পড়ল মুসার সঙ্গে।

'টরিসের সঙ্গে কেন দেখা করতে চাই জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেব?' সাইকেল চালাতে চালাতে বলল মুসা।

রবিনও ভাবতে লাগল। সহসা কেউই কোন জবাব খুঁজে পেল না। রবিন বলল, 'অতদূর সাইকেল চালিয়ে ঘেমে যাব। গিয়ে পানি খেতে চাইব। আমাদের ঘাম দেখলে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। টরিস বাড়ি না থাকলে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে। জিজ্ঞেস করব, ঘটনার দিন বিকেলে তার ছেলে কোথায় ছিল। যদি বলে, তার সঙ্গেই ছিল, তাহলে সন্দেহ থেকে টরিসকেও বাদ দেব আমরা।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' মুসা বলল। 'আরেক কাজ করতে পারি। একটা চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতে পারি। পাম্প করতে সময় লাগবে। সেই সুযোগে আরেকটু কথা বলার সময় পাবে তুমি।'

'ঠিক। চালাক হয়ে যাচ্ছি আমরা, তারমানে গোয়েন্দাগিরি করতে পারব।'

জোরে জোরে প্যাডাল করে বেশ তাড়াতাড়িই ইয়োলোস্টোন গাঁয়ে এসে পৌছল ওরা। এই গ্রামটাও খুব সুন্দর, গ্রীনহিলসের চেয়ে কম নয়। একটা পুকুরে সাদা সাদা অনেক রাজহাঁস সাঁতার কাটছে দেখল। ছোট্ট একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে টরিসের মায়ের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, প্রচুর গাছপালায় ঘেরা একটা জায়গায় বাড়িটা।

বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল দু-জনে। কাঠের গেটটা লাগানো। সেটা খুলতে গেল রবিন। সাইকেলের সামনের চাকার হাওয়া ছেড়ে দিল মুসা।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজায় থাবা দিল রবিন।

'কে?' ভেতর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'আমরা। একটু পানি দেবেন?'

'ভেতরে এসো।'

ঠেলে পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকল রবিন। পেছনে মুসা। রান্নাঘরে কাপড়

ইস্তিরি করছে চোখা চেহারার হালকা-পাতলা একজন মহিলা। ইঙ্গিতে সিংকের ওপরের ট্যাপটা দেখিয়ে বলল, 'টেবিলে গেলাস আছে। নিয়ে খাও।'

'থ্যাংক ইউ,' বলে টেবিলের দিকে এগোল রবিন। 'অনেক দূর থেকে এসেছি তো, এক্কেবারে ঘেমে গেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?' কাপড়ের ওপর ইস্তিরি চালাতে চালাতে জানতে চাইল মহিলা।

'গ্রীনহিলস। এই তো, আপনাদের পাশের গ্রাম···'

'চিনি। আমার ছেলে চাকরি করত সেখানে। মিস্টার আরগফের বাড়িতে।'

'তাই নাকি?' ট্যাপ থেকে পানি নিতে নিতে অবাক হওয়ার ভান করল রবিন। 'আগুন লেগেছিল যে সেই আরগফের বাড়িতে?'

'আগুন!' ইস্তিরি থামিয়ে দিল মহিলা, অবাক হয়েছে। 'কিসের আগুন? কই, আমি তো কিছু শুনিনি! বাড়ি পুড়েছে?'

'না, একটা কটেজ। তাঁর কাজের ঘর। কেউ আহত হয়নি। কেন, আপনার ছেলে কিছু বলেনি?'

সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল মহিলা, 'কবে আগুন লেগেছে?'

জানাল তাকে রবিন।

চিন্তায় পড়ে গেছে মহিলা। 'তার মানে যেদিন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে টরিসকে! সে চলে আসার পর লেগেছে, সে জন্যেই কিছু জানে না। মিস্টার আরগফের সঙ্গে নাকি কথা কাটাকাটি হয়েছিল, বলেছে আমাকে। দুপুর বেলা হঠাৎ ওকে চলে আসতে দেখে অবাকই হয়েছিলাম।'

'তাহলে আগুন লাগাটা দেখেনি আপনার ছেলে,' এতক্ষণে মুখ খুলল মুসা। 'এরপর কি বাড়িতেই ছিল নাকি? সন্ধেটা এখানে থেকেছে?'

'না। চা খেয়েই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাতে ফিরেছে। কোথায় গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করিনি। ডার্ট খেলতে গিয়েছিল হয়তো। খুব ভাল ডার্ট ছুঁড়তে পারে সে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা, কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। দু-জনেই ভাবছে: *ডার্ট খেলতে গিয়েছিল, না কোথায় গিয়েছিল, সে তো আমরা ভাল করেই জানি!* ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক। সন্ধেটা কোথায় কাটিয়েছে টরিস? সাইকেলে করে গ্রীনহিলসে ফিরে যাওয়াটা খুবই সহজ। খাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থেকে অন্ধকারে কটেজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আবার সাইকেল নিয়ে পালিয়ে আসাটাও কঠিন কিছু নয়।

মুসা ভাবতে লাগল, কি জুতো পরে টরিস? এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কোণে পুরুষের একজোড়া জুতো পড়ে থাকতে দেখল সে। ছাপগুলো যে মাপের, সেই মাপের জুতো। তবে রবার সোল নয়। হয়তো আসল জুতোগুলো এখন টরিসের পায়ে রয়েছে।

'আপনার ছেলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাইরে গেছে। ফেরার সময় হয়ে গেছে।'

'ও।'

পানি খাওয়া শেষ দু-জনেরই। খেতে খেতে পেট ভরে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন বাহানা নেই। সুতরাং মুসা বলল, 'রবিন, আমি চাকাটায় পাম্প করতে যাচ্ছি।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল মহিলা, 'হাওয়া বেরিয়ে গেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল মুসা। বেরোনোর আগেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল একজন লোক।

'এই তো, টরিস এসে পড়েছে,' তার মা বলল।

সুদর্শন যুবক টরিস। ঝাঁকড়া চুল, চোখা চিবুক, নীল চোখ। বাদামী একটা ফ্ল্যানেলের কোট গায়ে।

সবার আগে কোটটার দিকে চোখ পড়ল গোয়েন্দাদের। আসল লোকটাকে কি পেয়ে গেল শেষ পর্যন্ত?

'এরা কারা?' ছেলেদের দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল টরিস।

'পানি খেতে এসেছে।'

'গ্রীনহিলসে থাকি আমরা,' জবাব দিল মুসা। ভাবছে, কোটের কোন জায়গাটা ছেঁড়া কি করে দেখা যায়?

'ও, ওই শয়তান আরগফটার গাঁয়ে!' নাক কুঁচকে বলল টরিস, 'বুড়ো শকুনটাকে চেনো নাকি?'

'চিনব না কেন?' জবাব দিল রবিন। 'আমরাও তাঁকে দেখতে পারি না। দেখলেই খালি ধমক মারেন। তাঁর বাড়িতে আগুন লেগেছে, জানেন? আপনি যেদিন চলে এসেছেন, সেদিনই লেগেছে।'

'আমি কোনদিন এসেছি তুমি জানলে কি করে?'

'এই তো, আপনার আম্মা বললেন একটু আগে।'

'পুরো বাড়িটা যদি পুড়ত তাহলে ভাল হত,' গজগজ করতে লাগল টরিস। 'ও রকম বদমেজাজী বুড়ো শকুনকে কেউ দেখতে পারে নাকি! বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে-ও যদি পুড়ে মরত, খুশি হতাম!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা, যেন মুখ দেখেই বুঝতে চায় সে-ই আগুন লাগিয়েছে কিনা।

যেন কথার কথা বলছে এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'তা দিয়ে তোমাদের কি দরকার!' রেগে উঠল টরিস। তার চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করেছে মুসা, ছেঁড়াটা কোথায় আছে দেখার জন্যে। সেটা লক্ষ করে আরও খেপে গেল সে, 'এই ছেলে, এমন করছ কেন? কুত্তার মত শুঁকছ কেন? থামো!'

'না, আপনার কোটে কাদা লেগে আছে তো,' মুসা বলল, 'দাঁড়ান, মুছে দিই।' পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেল সে, এবং অঘটনটা ঘটাল। ওই পকেটেই যে পলির চিঠিটা রেখেছিল, ভুলে গিয়েছিল। রুমাল বের করতে গিয়ে হাতে ঠেকল বটে, কিন্তু অতটা গুরুত্ব না দিয়ে মারল রুমালে টান, আর

ওটার কোনায় আটকে গিয়ে খামটাও বেরিয়ে এল, সে ধরার আগেই পড়ে গেল মাটিতে।

ঠিকানাটা দেখে ফেলল টরিস। নিচু হয়ে তুলে নিল। খুব অবাক হয়েছে। কুঁচকে গেছে ভুরু। মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি?'

এতটা অসাবধান হয়েছিল বলে নিজেকেই কষে এক লাথি মারতে ইচ্ছে করল মুসার। ঢোক গিলে বলল, 'পলি এটা পোস্ট করতে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা ভাবলাম, এদিকেই যখন আসছি, হাতে হাতে দিয়ে যাব।'

'তাহলে আগে দিলে না কেন?'

মুসা আর রবিন দু-জনেই বুঝে ফেলল, আরও কিছু প্রশ্ন আসবে এরপর, যেগুলোর জবাব দিতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে ওরা। তার চেয়ে কেটে পড়াই ভাল।

পানি খেতে দেয়ার জন্যে মহিলাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিল রবিন। টরিসের কথা যেন শুনতেই পায়নি মুসা, এমনি ভঙ্গি করে ছুটে গেল দরজার দিকে।

ঘর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরোল দু-জনে। সাইকেল ঠেলে গেটের বাইরে বের করে চড়ে বসল। সামনের চাকায় যে হাওয়া নেই, পরোয়াই করল না মুসা। গায়ের জোরে প্যাডালে চাপ দিতে লাগল। বার বার পেছন ফিরে দেখতে লাগল, তেড়ে আসছে কিনা টরিস।

কিছুদূর আসার পরও যখন দেখল টরিস আসছে না, নামল সাইকেল থেকে। চাকাটায় বাতাস ভরে নিতে হবে, এ ভাবে বেশিক্ষণ চালানো অসম্ভব।

রবিন বলল, 'এই বোকামিটা কি করে করলে?'

'গাধা যে আমি!' পাম্পটা খুলে নিল মুসা।

'কি মনে হয় তোমার, আগুন টরিসই লাগিয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেদিনই আরগফের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তার, চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার পর কোথায় ছিল বলতে পারল না তার মা। গায়ে বাদামী রঙের ফ্ল্যানেলের কোট...' পাম্প করতে করতে থেমে গেল মুসা। 'রবিন, ওর পায়ের জুতো দেখেছ? আমি দেখতে পারিনি। রবার সোল?'

'দেখেছি। রবার সোলই। কিন্তু নিচের নকশা তো আর দেখতে পারিনি, বুঝব কি করে তারই পায়ের ছাপ কিনা?'

'হুঁ, অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। টরিসকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না।'

পাম্প করা হয়ে গেলে আবার সাইকেলে চাপল দু-জনে। কথা বলতে বলতে চলল।

একজায়গায় ঢালু হয়ে গেছে পাহাড়ী পথ। সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক। তার ওপাশে কি আছে দেখা যায় না। দেখলে অবশ্যই সতর্ক হত মুসা। হলো না বলেই ঘটল দুর্ঘটনা। ঢালু পথ বেয়ে তীব্র গতিতে নেমে ওপাশে ঘুরতে

যেতেই ধাক্কা লেগে গেল আরেক সাইকেল আরোহীর সঙ্গে। লোকটার চেহারা দেখে ধড়াস করে উঠল বুক।

স্বয়ং ফগর‍্যাম্পারকট!

'ঝামেলা!' উঠে বসেই চেঁচিয়ে উঠল ফগ। 'বিচ্ছুগুলো দেখি সব জায়গাতেই ছড়িয়ে থাকে! এই, এখানে কেন এসেছ?'

ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দিল মুসা, 'ঝামেলা করতে আসিনি...'

'চুপ, বেয়াদব! যাও, ভাগো!'

'তাই তো করতে চাই, কিন্তু সরছেন না তো।'

সাইকেলটা তুলে নিল ফগ। গর্জে উঠল, 'আবার যদি দেখি এদিকে...'

হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে রবিনের। চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। জবাব দিল, 'এটা সরকারি রাস্তা...'

'চুপ! আবার বেশি কথা বলে। যত্তসব ঝামেলা! যাও, ভাগো!'

সাইকেলে চাপল আবার ফগ।

আর হাসি চাপতে পারল না রবিন। হেসে উঠল হো হো করে।

কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আবার বলল ফগ, 'ঝামেলা!'

আবার এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। রবিন বলল, 'মুসা, আমি শিওর, টরিসের বাড়ি যাচ্ছে ঝামেলা।'

'যাক,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'চিঠি পড়ে সাবধান হয়ে যাবে টরিস। এতক্ষণে হয়তো পালিয়েছে বাড়ি থেকে।'

এগারো

সন্ধেয় বাড়ি ফিরল দু-জনে। ওদের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কিশোর আর ফারিহা।

দেখেই জিজ্ঞেস করল ফারিহা, 'কি খবর? এত দেরি কেন? টরিসের দেখা পেয়েছ? ও কি বলল?'

'আরে কি মুশকিল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, 'দম নিতে দাও না। কিশোর, এখানেই বসবে, নাকি ছাউনিতে?'

'সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে আর লাভ কি এখন। বাগানেই বসি, খোলা জায়গায়।'

কি কি ঘটেছে, সব জানাল রবিন ও মুসা। ঝামেলার সঙ্গে মুসার সংঘর্ষের কথায় আসতেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল ফারিহা। রবিনও হাসতে লাগল। কিন্তু কিশোর গম্ভীর হয়ে গেল, 'তারমানে পিছে লেগেই আছে ঝামেলা, ছাড়বে না!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'আমরা তার চেয়ে একটুখানি এগিয়ে আছি।

মিস্টার দুর্গন্ধের সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলা উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঠিকানা জোগাড় করেছ?'

'করেছি,' জানাল কিশোর।

'আমাদের একগলি পরেই তো থাকে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ফারিহা। 'অথচ আমরা জানিই না!'

'তাই নাকি?' অবাক হলো রবিন।

'জানব কি করে,' মুসা অতটা অবাক হলো না। 'বাড়ি বাড়ি কি আর খোঁজ নিতে যাই নাকি আমরা, কে কোথায় থাকে।'

'মিস্টার ফোর্ডের হাউসকীপারের নাম মিসেস টপার,' কিশোর বলল।

'তুমি জানলে কি করে?' এইবার অবাক হলো মুসা।

'এটা কোন কঠিন কাজ হলো নাকি?' হাসল কিশোর। 'তোমাদের মালীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই বাড়িতে কে কে থাকে। বলে দিল। সবই জানে লোকটা, গাঁয়ের খোঁজ-খবর রাখে। ওই মহিলাই নাকি মিস্টার দুর্গন্ধকে সাফসুতরো করে রাখে, খাবার রান্না করে দেয়, ঘরবাড়ির কাজকর্ম করে, এমন কি বৃষ্টি পড়লে সাহেবের রেনকোটটাও এগিয়ে দেয়।'

'কেন, পাগল নাকি লোকটা?'

'না, খামখেয়ালী। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। অনেক অনেক পুরানো চিঠি, দলিল, বইপত্রে আগ্রহী। ওসব নিয়েই পড়ে থাকেন, দুনিয়ার আর কোন কিছুতে আগ্রহ নেই। কোথাও বেরোন না, কারও সঙ্গে মেশেন না, একমাত্র আরগফের সঙ্গে ছাড়া...'

'সে জন্যেই এখানে যে আছেন তিনি, এটা জানি না আমরা।'

'কালই তাহলে দেখা করতে যাব,' রবিন বলল। 'দেরি করা উচিত না। সময় থাকলে এখনই যেতাম।'

'কিন্তু কাল তো আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'পুরানো জুতো একজোড়া পেয়ে গেছে মা। যদি নিতে আসে ভবঘুরেটা? আমার বিশ্বাস, আসবেই, জুতোটা তার খুব দরকার।'

'তাহলে কিশোরকে নিয়েই যাব।'

'আমি কি করব?' জানতে চাইল ফারিহা।

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে,' মুসা বলল। 'টিটুর সঙ্গে খেলবে। মিস্টার দুর্গন্ধ কুকুর পছন্দ করেন বলে মনে হয় না। দেখলে বিরক্ত হতে পারেন।'

'কোন অভিযানেই তাহলে আমি বেরোব না?'

'এটা অভিযান কোথায় দেখলে? একজনের বাড়িতে শুধু কথা বলতে যাওয়া হবে, আর কিছু না।'

'কোন কাজই আমি করব না?'

'কাজই তো দেয়া হলো, টিটুকে পাহারা দেয়া। আজও তো টেলিফোন বুক ঘাঁটায় কিশোরকে সাহায্য করেছ।'

'ওটা কোন কাজ হলো নাকি? ঘর থেকে বইটা শুধু এনে দিয়েছি। এক মিনিটে বের করে ফেলেছে কিশোর।'

'তাতেই চলবে। যার যেটুকু কাজ, সেটুকু করলেই চলবে,' ফারিহাকে আর কথা বাড়াতে দিল না মুসা। 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রবিন, বাড়ি যাবে না?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

কিশোর বলল, 'আমিও যাই। চাচা-চাচী এতক্ষণে বোধহয় ফিরেছেন পিকনিক থেকে। উঠি।'

'তোমার ব্যথাটা কেমন?'

'অনেকটা কমেছে। কাল বেরোতে পারব। যাই।'

সে রাতে গোয়েন্দাদের কারোরই ভাল ঘুম হলো না। সারাদিনের ঘটনায় সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। ফারিহা স্বপ্ন দেখল, সে আগুন লাগিয়েছে এই সন্দেহ করে ঝামেলা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দিয়েছে। চিৎকার দিয়ে জেগে গেল সে। এরপর ভয়ে আর ঘুমই আসতে চাইল না। কিশোর ঘুমাতে পারল না গায়ের ব্যথায়।

সকাল সকাল বিছানা ছাড়ল সবাই। নাস্তা সেরে মুসাদের বাগানে চলে এল কিশোর আর রবিন। কথামত ওরা রওনা হয়ে গেল মিস্টার ফোর্ডের বাড়ির দিকে। মুসা বসে রইল ভবঘুরের আসার অপেক্ষায়। ফারিহা টিটুকে নিয়ে খেলতে লাগল।

বসে আছে তো আছেই মুসা, গেটের দিকে তাকিয়ে, লোকটা আর আসে না।

হঠাৎ পেছন দিকে তাকিয়ে খউ খউ করে উঠল টিটু। পেছনের বেড়া টপকে কি করে যে ভেতরে ঢুকেছে লোকটা, টেরই পায়নি মুসা কিংবা ফারিহা। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এল সে। সেই ছেঁড়া জুতোই পরনে, আঙুল বেরিয়ে আছে।

হাত নেড়ে ডাকল তাকে মুসা, 'আসুন।'

কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ো। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও যেন ভয় পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশটাকে খবর দিয়ে রাখোনি তো?'

'না,' বুড়োর এই পুলিশভীতি অধৈর্য করে তুলল মুসাকে। 'ওকে আমরাও দেখতে পারি না।'

'কি করে বিশ্বাস করব?'

'ও এখানে নেই দেখে।'

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারল না বুড়ো। 'জুতো পাওয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বুড়োকে ছাউনিতে নিয়ে এল সে। পেছনে এল ফারিহা আর টিটু। একনাগাড়ে খেউ খেউ করছে কুকুরটা। তাকে থামানোর চেষ্টা করেও পারছে না ফারিহা। কথা বলাই মুশকিল। শেষে ওকে নিয়ে ফারিহাকে বেরিয়ে যেতে বলল মুসা।

একটা বাক্সের ওপর জুতোজোড়া রেখে দিয়েছে মুসা। বেশি পুরানো হয়নি, প্রায় নতুনই আছে, তার ওপর ঝেড়েমুছে চকচকে করে ফেলেছে মুসা। বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'চলবে?'

চোখ জ্বলজ্বল করছে বুড়োর। ছুটে গিয়ে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে বসে পড়ল। দুই টানে পুরানোগুলো খুলে ফেলে দিয়ে নতুনগুলো পরতে লাগল। এক সাইজ বড় হয়। তবু আগেরগুলোর চেয়ে অনেক অনেক ভাল। হাসি ফুটল তার মুখে, যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে।

এত সহজেই খুশি হয়ে যায় যে লোক, তাকে খারাপ ভাবতে পারল না আর মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'পছন্দ হয়েছে?'

মাথা কাত করল বুড়ো। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'কিছু যদি মনে না করেন, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? ভাববেন না আবার, জুতো ঘুষ দিয়ে কথা আদায় করতে চাইছি।'

সতর্ক হয়ে উঠল বুড়ো। 'কী?'

'আগুন লেগেছিল যখন, সে সময় মিস্টার আরগফের বাগানে কাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন?'

চুপ করে রইল বুড়ো।

'দেখেছেন তো, নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল মুসার। 'কাকে?'

'একজন নয়।'

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'সেটা বলব না। তবে আমি যেখানেই থাকি না কেন আরগফের কোন ক্ষতি করিনি।'

'তাহলে বলতে অসুবিধে কি?'

চুপ করে রইল বুড়ো। মুসা ভাবল, এমনও হতে পারে, সকাল বেলা তাড়া খাওয়ার পরেও সন্ধ্যায় আবার হয়তো ডিম চুরি করতে গিয়েছিল বুড়ো, লুকিয়ে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়, পেটের খিদে বড় খিদে। জিজ্ঞেস করল, 'ঝাঁকড়া চুল, বাদামী কোট পরা সুন্দর চেহারার কোন যুবককে দেখেছেন? নীল নীল চোখ?'

'অন্ধকারে তো আর চোখের রঙ চেনা যায় না। তবে ঝাঁকড়া চুল ছিল। ফিসফিস করে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। যার সঙ্গে বলছিল তাকে দেখিনি।'

এইটা একটা সংবাদ বটে! টরিসের সঙ্গে আরও কেউ লুকিয়ে ছিল ঝোপে। তবে কি আগুন লাগানোয় দু-জন লোকের হাত আছে? দু-জন হলে আরেকজন কে? মিস্টার দুর্গন্ধ?

'আর কিছু জানেন না আপনি, তাই না? আর কাউকে দেখেননি?'

আরেক দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ল বুড়ো। উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়ল। বলল, 'জুতো দিয়ে তো মস্ত উপকার করলে। খুব খিদে পেয়েছে। মা-র কাছ থেকে কিছু খাবার এনে দিতে পারবে?'

এমন করে বলল বুড়ো, মায়াই লাগল মুসার। বলল, 'বসুন। দেখি, কিছু আছে কিনা।'

পুরো বাড়িটার চারপাশে একপাক ঘুরে এল কিশোর ও রবিন। গেট ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে খোলা যাবে না। একটাই পথ, দেয়াল টপকাতে হবে।

'কি করি বলো তো?' পরামর্শের জন্যে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটা বল নিয়ে এসো। ভেতরে ছুঁড়ে দেবে। তারপর ওটা খোঁজার ছুতোয় ঢুকে যাবে ভেতরে।'

'তুমি?'

'আমার ব্যথাগুলোর অবস্থা ভাল না। দেয়াল টপকাতে গেলে লাগবে। ভেতরে ঢুকে কোনভাবে গেটটা খুলে দিও।'

বল নিয়ে এল রবিন। বাগানটা যেদিকে আছে সেদিকের দেয়ালের ওপর দিয়ে অন্যপাশে ছুঁড়ে মারল। একটা গাছ বেয়ে উঠে দেয়ালে চড়ে বসল। লাফিয়ে নামল ওপাশে। দেখতে পাচ্ছে বলটা। একটা গোলাপঝাড়ের গোড়ায় পড়ে আছে। কিন্তু তুলল না ওটা সে। শব্দ করে খুঁজতে লাগল, ইচ্ছে, বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসুক।

একপাশের একটা জানালা খুলে গেল। উঁকি দিলেন একজন বৃদ্ধ। সারা মাথায় টাক, ঘাড়ের কাছটায় কেবল খুলি কামড়ে রয়েছে কয়েক গোছা চুল। লম্বা দাড়ি। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। এত ভারী কাঁচ, তার ভেতর দিয়ে দেখলে অস্বাভাবিক বড় লাগে চোখগুলোকে।

'এই, কি করছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। খুব ভদ্রভাবে বলল, 'বল খুঁজছি।'

'পেয়েছ?'

'না।'

জোরাল একঝলক বাতাস বয়ে গেল এই সময়। কাঁপিয়ে দিল মিস্টার ফোর্ডের লম্বা দাড়ি। ঘর থেকে একটা কাগজ উড়িয়ে এনে ফেলল জানালার বাইরে। হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেও পারলেন না তিনি। চশমাটা পিছলে নেমে এল নাকের ওপর।

'দাঁড়ান, দিচ্ছি,' উবু হয়ে কাগজটা তুলে মিস্টার ফোর্ডের হাতে দিল রবিন। 'অদ্ভুত তো কাগজটা, এমন কেন?'

সাধারণ কাগজের চেয়ে অনেক মোটা, হলদেটে কাগজটা হাতে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'এটা পার্চমেন্ট। অনেক পুরানো।'

পুরানো কাগজের প্রতি আগ্রহ দেখানোর ভান দেখিয়ে বলল রবিন, 'তাই নাকি, স্যার? কি কাগজ? কত পুরানো? ইনটারেসটিং তো!'

এই কয়েক কথাতেই খুশি হয়ে গেলেন প্রফেসর। বললেন, 'এটা আর এমন কি পুরানো। এর চেয়ে পুরানো কাগজ আছে আমার কাছে। ওগুলো পড়ে পড়ে মানে বোঝার চেষ্টা করি আমি। পুরানো ইতিহাস জানার চেষ্টা করি।'

'বলেন কি? সাংঘাতিক কাণ্ড তো! আমাকে দেখাবেন, স্যার? কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'অসুবিধে কিসের?' হাসলেন প্রফেসর। 'এসো এসো, কোন কিছু শিখতে চাইলে ছোটবেলা থেকেই শেখা উচিত। এসো।'

'আমার বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, স্যার। পুরানো কাগজে তারও অনেক আগ্রহ। আমি দেখলে আর সে দেখতে না পারলে খুব দুঃখ পাবে। তাকে নিয়ে আসি, স্যার?'

'যাও, যাও, নিয়ে এসো।'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর রবিন। দৌড় দিল গেটের দিকে। খুলে দিল। বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ঢুকে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

'খুব ভাল। আমাদের ঘরের ভেতর যেতে বলেছেন প্রফেসর। এসো।'

জানালার কাছে নেই প্রফেসর। সরে গেছেন। কিশোরকে নিয়ে বারান্দায় উঠল রবিন। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই অনেকটা পাখির মত কিচির মিচির করে বলে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠ, 'এই, কে তোমরা? কি চাও?'

এই মহিলাই মিসেস টপার, অনুমান করল রবিন। প্রফেসর সাহেব যে ওদেরকে তাঁর স্টাডিতে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন, জানাল সে।

চোখ কপালে তুলল মহিলা। 'অনুমতি দিয়েছেন! আশ্চর্য! তিনি তো কাউকেই ঢুকতে দেন না, দূর দূর করে তাড়ান! তোমাদের ঢুকতে বললেন?'

'বললেন তো।'

'কিন্তু মিস্টার আরগফ ছাড়া তো আর কাউকে ও ঘরে ঢুকতে দেন না তিনি। ঝগড়া করার পর তিনিও আসেননি আর।'

'হয়তো মিস্টার ফোর্ডই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন,' তথ্য আদায়ের চেষ্টা করল কিশোর।

'নাহ্, যাওয়ার কথা নয়। আমাকে তো বললেন, যে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তার মুখ দেখা ছেড়ে দেবেন। আর যাবেন না ও বাড়িতে। এইবার ঝগড়াটা ভালমতই হয়েছে। তবে মিস্টার আরগফেরও দোষ আছে, খুব বাজে আচরণ করেন লোকের সঙ্গে। মিস্টার ফোর্ডের মত মানুষের সঙ্গে এটা করা তাঁর উচিত হয়নি।'

'খুব ভাল মানুষ বুঝি?'

'খুব ভাল। একটু ভুলোমন, এই যা। তবে এটাকে খারাপ বলা যায় না।'

'তাঁর পক্ষে কি মিস্টার আরগফের ঘরে আগুন লাগানো সম্ভব?'

'মাথা খারাপ নাকি! কারও কোন ক্ষতিই তাঁকে দিয়ে সম্ভব নয়।'

'আগুন যেদিন লাগল সেদিন সন্ধ্যায় কি বেরিয়েছিলেন?'

'বেরিয়েছিলেন, ছ-টার সময়, হাঁটতে। রোজই এই সময় বেরোন। ফিরে এসেছেন আগুনটা কেউ দেখার আগেই।'

একে অন্যের দিকে তাকাল রবিন ও কিশোর। তাহলে সেদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মিস্টার ফোর্ড। চুরি করে আরগফের বাগানে ঢুকে আগুন লাগিয়ে, আবার সময়মত ফিরে আসা কি সম্ভব ছিল তাঁর জন্যে?

'আপনি কি আগুন দেখেছেন?' মিসেস টপারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কিন্তু জবাব পাওয়ার আগেই দরজায় দেখা দিলেন প্রফেসর। ছেলেরা এত দেরি করছে কেন দেখতে এসেছেন। স্টাডিতে যাওয়ার জন্যে ডাকলেন।
'পা মুছে যাও,' সাবধান করল মিসেস টপার।
স্টাডিটা এত বেশি অগোছাল, কাগজ, বইপত্র এমন করে পড়ে আছে, না মাড়িয়ে হাঁটাই মুশকিল।
'এর ভেতর দিয়ে হাঁটেন কি করে?' রবিন বলল, 'গুছিয়ে দেয়ার মানুষও নেই নাকি?'
'আছে,' চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, তুলে দিলেন মিস্টার ফোর্ড। 'মিসেস টপার তো গোছাতেই চায়, আমিই দিই না। এই একটা ঘরের দিকে নজর দিতে মানা করে দিয়েছি তাকে। এসো, হাতে তৈরি কাগজের ওপর লেখা একটা বই দেখাই তোমাদের। এটা লেখা হয়েছে…কত সালে যেন…খালি ভুলে যাই। দাঁড়াও দেখে নিই। সালটা আমিই ঠিক বলেছি, কিন্তু আরগফটা অহেতুক তর্ক করে। গোলমাল করে দেয় সব। তাতেই তো ভুলগুলো হয়ে যায় আমার।'
'আমার নাম কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ও আমার বন্ধু, রবিন মিলফোর্ড। পুরানো ইতিহাসে খুব আগ্রহ আমাদের।'
'খুব ভাল, সে জন্যেই ঢুকতে দিলাম তোমাদের,' হাতটা ধরলেন প্রফেসর। 'আমি প্রফেসর হেনরি ফোর্ড। ইতিহাস, পুরানো ভাষা, এ সবের বিশেষজ্ঞ। ভুল আমি করি না, অথচ ওই আরগফটা…'
'দু-তিন দিন আগে আপনাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল, না?' আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর।
নাকের ওপর থেকে চশমাটা খুলে নিলেন প্রফেসর। কাঁচ মুছে আবার নাকে বসালেন। তাকালেন পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে। 'হ্যাঁ, হয়েছিল। ঝগড়া আমার একটুও ভাল লাগে না। আরগফের বুদ্ধি আছে, মেজাজটা যদি আরেকটু ভাল হত…আমার সঙ্গে কোন কিছুতেই যেন একমত হতে পারে না। এই দলিলটার কথাই ধরো…' নিচু হয়ে কতগুলো কাগজ তুলে নিলেন প্রফেসর।
একনাগাড়ে বকবক করে গেলেন তিনি, ছেলেদের বোঝাতে লাগলেন ওতে কি আছে, কিন্তু একটা বর্ণও বুঝল না ওরা। প্রফেসর তো ভাবলেন গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে ওরা, খুশিও হলেন উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে, লেকচার দিয়ে চললেন।
বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল দুই গোয়েন্দা। তাক থেকে আরেকটা দলিল নামিয়ে আনতে যেতেই ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর, 'আমি তাঁকে আটকে রাখছি। তুমি হলঘরে গিয়ে দেখো, রবার সোলের জুতোজোড়া পাও কিনা।'
বেরিয়ে গেল রবিন।
ফিরে এলেন প্রফেসর। 'ওই ছেলেটা কোথায় গেল? কি যেন নাম

বললে?'

'রবিন। বাথরুমে গেছে।'

লেকচারটা চলল এবার কিশোরের ওপর।

হলঘরে দেয়াল আলমারিটার সামনে এসে দাঁড়াল রবিন। মিসেস টপারের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাল্লা খুলল সে। নানা রকম জুতো—বুট, শু, গলোশে ভর্তি একটা তাক। অনেকগুলো কোট আর ছড়ি রয়েছে। জুতোগুলো উল্টে উল্টে দেখতে লাগল সে। সাইজটা মনে হয় ঠিকই আছে, কিন্তু রবার সোলের চারকোনা নকশা কাটাওয়ালা জুতো আর পায় না।

পেয়ে গেল হঠাৎ করেই। একটা তাকের ভেতরের দিকের কোণে। যেন ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। টান দিয়ে কাছে এনে উল্টেই স্থির হয়ে গেল। এই তো পাওয়া গেছে! কিশোরের আঁকা ড্রয়িংটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেলে নিশ্চিত হতে পারবে। কিন্তু নেবে কি করে?

বেশি চিন্তা করার সময় নেই। একটা জুতো তুলে ঢুকিয়ে ফেলল গায়ের জারসির মধ্যে। বেঢপ হয়ে ফুলে রইল জায়গাটা। কিন্তু লুকানোর আর কোন ভাল জায়গাও নেই। আলমারির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরোতে গেল ঘর থেকে। পড়ল মিসেস টপারের সামনে।

'ও ঘরে কি করছিলে?'

'বা-বাথরুম…' কুঁজো হয়ে গেল রবিন। দু-হাত তুলে আনল পেটের কাছে, জুতোটা ঢাকার জন্যে।

মিসেস টপারের হাতে একটা ট্রে, তাতে বনরুটি আর দুধ, প্রফেসরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। রবিনের পেটের দিকে অতটা খেয়াল করল না। বুঝতে পারল না কিছু লুকানো আছে ওখানে।

প্রফেসরের ঘরে ঢুকে ট্রেটা একগাদা বইয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল মহিলা।

রবিনের পেটের দিকে চোখ পড়তেই চোখ সরু করে ফেলল কিশোর। ইশারায় জিজ্ঞেস করল, 'পেয়েছ?'

মাথা কাত করে ইশারায়ই জবাব দিল, 'পেয়েছি!'

আর প্রফেসরের লেকচার শোনার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি রুটি আর দুধ খেয়ে নিতে লাগল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু খেয়ালই নেই প্রফেসরের। তিনি তাঁর লেকচার দিয়েই চলেছেন।

দরজায় আবার উঁকি দিল মিসেস টপার। খেতে বলল প্রফেসরকে। তবু তিনি শুনলেন না। শেষে মিসেস টপারকে ঢুকে তাঁর হাত থেকে কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে খাবারের প্লেট ধরিয়ে দিতে হলো হাতে। বলল, 'এখনও আপনি নাস্তাই করেননি, ভুলে গেছেন?' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগে অতটা অমন ছিলেন না। মিস্টার আরগফের বাড়িতে আগুন লাগার পর থেকে হয়েছেন। মনে হয়, কিছু একটা যেন ভাবনায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে।'

'দেবে না,' নাকের ওপর নামানো চশমা ঠেলে তুলে দিয়ে গেলাসে চুমুক দিলেন প্রফেসর। 'অতগুলো দামী দলিল পুড়ে গেল…দাম জানো ওগুলোর?

লাখ লাখ ডলার। বীমা করানো আছে, টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে কি? কাগজগুলো তো আর পাওয়া যাবে না।'

মিস্টার ফোর্ডকে খাওয়া শুরু করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মিসেস টপার। কাগজ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। রান্নাঘরে জরুরী কাজ পড়ে আছে।

'ওই কাগজ নিয়েই সেদিন সকালে ঝগড়া করেছিলেন নাকি মিস্টার আরগফের সঙ্গে?' সুযোগটা ছাড়ল না কিশোর, জিজ্ঞেস করে বসল।

'দাম নিয়ে করিনি, লেখা নিয়ে করেছি। আমি শিওর, এগুলো লিখেছিল ইউলিনাস নামে একজন লোক, কিন্তু আরগফ মানতে রাজি না। আরেকটা দলিলের কথা আমি বললাম, তিনজনে লিখেছে, সে সেটাও মানবে না। তর্ক করে না পেরে রেগেমেগে যা তা বলে গালিগালাজ করল আমাকে। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। ওর এ রকম মূর্তি আর দেখিনি, ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কাগজগুলো ফেলেই পালিয়ে এলাম।'

'আগুন লাগার কথা কখন জানলেন?'

'পরদিন সকালে।'

'বিকেলে যখন হাঁটতে বেরোলেন, মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে নিশ্চয় যাননি? গেলে তো আগুনটা দেখতেই পেতেন।'

বনরুটিতে কামড় দিতে গিয়েও থমকে গেলেন প্রফেসর। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালেন কিশোরের দিকে। পুরু লেন্সের ওপাশে তাঁর অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল কিশোর।

'প্রশ্ন করা কি তোমার স্বভাব নাকি?' প্রফেসরের কণ্ঠস্বর বদলে গেছে।

'না…এই কৌতূহল আরকি…'

হাসলেন প্রফেসর। 'পুরানো ইতিহাসে আগ্রহ না দেখিয়ে গোয়েন্দাগিরি নিয়ে থাকো তুমি, ভাল করতে পারবে।' রুটি মুখে পুরলেন তিনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, প্রফেসর তাহলে সন্দেহ করেননি।

'কৌতূহল থাকা ভাল,' রুটি চিবাতে চিবাতে প্রফেসর বললেন, 'শেখা সহজ হয়। হ্যাঁ, কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'আগুন লাগার দিন হাঁটতে বেরিয়ে মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন?'

'মনে করতে পারছি না। অনেক কথাই আমার মনে থাকে না। তবে ঝগড়াটা যে আমার মাথা গরম করে দিয়েছিল, এটা মনে আছে।'

খাওয়া শেষ হলো। আর একটা মিনিটও বসল না গোয়েন্দারা, সহ্য করতে পারবে না প্রফেসরের লেকচার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে এল।

গোলাপঝাড়ের গোড়া থেকে বলটা তুলে নিল রবিন। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমার শেষ প্রশ্নটায় কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর, দেখেছ? আমার কি মনে হয় জানো, অবশ্যই গিয়েছিলেন তিনি আরগফের বাড়িতে, রাগের মাথায় আগুনটা তিনিই লাগিয়েছেন। তারপর ভুলে গেছেন।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, 'তাঁর মত একজন মানুষ এ কাজ করতে পারেন বলে মনেই হয় না। তোমার জারসির নিচে কি? জুতো?'

'হ্যাঁ। রবার সোল, চারকোণা নকশা কাটা।'

বারো

একবার দেখেই মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, এই জুতো না।'

কিন্তু রবিন আর মুসার ধারণা, এটাই। ছাউনিতে এসে বসেছে ওরা সবাই।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এটা নয়, কেন মনে হচ্ছে তোমার?'

'মাপটা সামান্য ছোট,' জবাব দিল কিশোর।

'বেশ, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে।' বোর্ডের আড়াল থেকে নকশাটা বের করে আনতে উঠল মুসা।

নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল কিশোরের কথাই ঠিক। হতাশ হয়ে চুপ করে রইল রবিন, এত কষ্ট মাঠে মারা গেল। কি ঝুঁকি নিয়েই না জুতোটা এনেছে সে!

'গোয়েন্দা হওয়া যেমন মজার, তেমনি কঠিন, তাই না?' ফারিহা বলল। যেন তার সঙ্গে সঙ্গত করার জন্যেই টিটু বলল, 'খোক!'

'চুপ!' ধমক লাগাল মুসা। 'খালি বেশি কথা!' বার বার এ ভাবে হতাশ হতে তারও ভাল লাগছে না।

'ওকে ধমকালে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না,' কিশোর বলল। 'হ্যাঁ, এবার তোমার কথা বলো। ভবঘুরেটা এসেছিল?'

'এসেছিল,' আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। যা যা বলেছে বুড়ো, দ্রুত জানাল।

'তার মানে আরও ঘোরাল হয়ে উঠল রহস্য,' কিশোরের মুখ দেখে মনে হলো এই জটিলতায় সে মজাই পাচ্ছে। তার এই আচরণ কেমন রহস্যময় লাগল রবিন ও মুসার কাছে।

মুসা বলল, 'টরিসকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে বুড়ো, ফিসফিস করে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে। সেই লোকটা কি প্রফেসর ফোর্ড? কি মনে হয়? সেদিন বিকেলে নাকি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন? দু-জনে মিলে আগুন লাগানোর মতলব করেননি তো?'

'করতেও পারেন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'একে অন্যকে হয়তো চেনে তাঁরা। দু-জনে মিলে ঠিক করেছেন বুড়ো শকুনটাকে খানিকটা শিক্ষা দেবেন। কিন্তু সেটা প্রমাণ করব কি করে আমরা?'

'ফোর্ডের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে আমাদের। জুতোটাও রেখে আসতে হবে তাঁর আলমারিতে। চুরি করা জিনিস রাখব না আমরা, সেটা

অন্যায়। আচ্ছা, আসার পথে ঝামেলাকে দেখেছ?'
মাথা নাড়ল রবিন আর কিশোর। দেখেনি, দেখতে চায়ও না ওই ভয়ানক লোকটাকে।
এরপর কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলল। অনেক জটিলতা এখনও রয়ে গেছে। কে যে কাজটা করেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আলোচনা করতে গিয়ে টরিসের ওপরই সন্দেহটা জোরদার হচ্ছে।
কিশোর বলল, 'পলির সঙ্গে দেখা করা দরকার। টরিসের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠতা আছে বোঝা যায়, নইলে চিঠি লিখে সাবধান করতে যেত না। আমার মনে হয়, সে কিছু বলতে পারবে।'
'কিন্তু সেদিন বিকেলে তো বাড়ি ছিল না পলি,' বলল রবিন। 'তখন তার ছুটি ছিল।'
'ছুটি থাকলে যে ফিরে গিয়ে বাগানে লুকাতে পারবে না এমন তো কোন কথা নেই।'
'দূর!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, 'এখন মনে হচ্ছে, গাঁয়ের অর্ধেক লোকই যেন গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল বাগানে। যার কথা ওঠে, তাকেই সন্দেহ হয়! এখন লিলিকেও হচ্ছে।'
মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে না ওকে, তবে অনেক কিছু যে জানে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওর সঙ্গে দেখা করতে তোমার আপত্তি আছে?'
'তা থাকবে কেন? রহস্যটা ভেদ করতেই হবে। তো, কখন যাচ্ছি? ফোর্ডের জুতোটাই বা কখন ফেরত দিতে যাব?'
'রাতে ছাড়া আর হবে না। দিনে আবার ও বাড়িতে ঢুকলেই সন্দেহ করে বসবে মিসেস টপার, প্রফেসরও করতে পারেন।'
'কিন্তু রবিন তো রাতে বেরোতে পারবে না। ওর মা দেবেন না। বেরোলে চুরি করে বেরোতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করি চলো। তুমি আর আমিই যাই। তোমার চাচা-চাচী তো কিছু বলেন বলে মনে হয় না তোমাকে...'
'নাহ্, আমাকে বিশ্বাস করে, খারাপ কিছু করব না জানে। চাচী অতটা স্বাধীনতা অবশ্য দিতে চায় না, তবে চাচা মানা করে না কোন কিছুতে।'
'তার মানে তোমার বেরোতে অসুবিধে নেই। তবে আমাকে চুরি করেই বেরোতে হবে।'
'আমিও আসতে পারি,' রবিন বলল। 'না হয় লুকিয়েই এলাম...'
'নাহ্, দরকার নেই। এত লোক যাওয়া লাগবে না, আমরা দু-জনই যথেষ্ট। ধরা পড়লে অহেতুক বকা শুনবে, কেন বেরিয়েছিলে জানাতেই হবে তোমাকে। আমাদের গোয়েন্দাগিরির কথা যাবে ফাঁস হয়ে, সব বন্ধ করে দেয়া হবে তখন।'
'তুমিও তো ধরা পড়তে পারো?'
'তা পারি। তবে দু-জনের ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে একজনের নেয়াই ভাল।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো। পলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি কখন?'
'দুপুরের খাওয়ার পর। খেয়েই চলে আসবে। কিশোর, তোমার ব্যথাগুলো কেমন?'
'ভালই।'
উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোন কিছুর চেহারা হয়নি?'
'হবে না কেন?' হাসল কিশোর। 'একটা হয়েছে হলদে রঙের কুকুরের মাথার মত দেখতে।'
'তাই নাকি!' তিনজনেই আগ্রহী হয়ে উঠল দেখার জন্যে। ফারিহা অনুরোধ করল, 'দেখাবে?'
অগত্যা শার্ট খুলে দেখাতেই হলো কিশোরকে। অবাক হলো দর্শকরা। সত্যিই, আঘাতটা দেখতে হুবহু একেবারে টিটুর মুখের মত! আশ্চর্য! এই ছেলেটার সব কিছুই কেমন অদ্ভুত!

খাওয়ার পর আবার মুসাদের ছাউনিতে জমায়েত হলো গোয়েন্দারা। তারপর দল বেঁধে বেরোল আরগফের বাড়ির উদ্দেশে। কিটির জন্যে কাগজে মুড়ে আবার মাছ নিয়ে নিয়েছে রবিন। বার বার তার হাতের কাছে যাচ্ছে, আর প্যাকেটটা শুঁকছে টিটু।
বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখল গাড়িতে করে চলে যাচ্ছেন আরগফ। খুশি হলো ওরা। তাঁর সামনে পড়ার ভয় আর থাকল না। এখন দু-জনে আটকে রাখবে মিসেস ডারবিকে, আর অন্য দু-জন কথা বলবে পলির সঙ্গে।
তবে ওদের ভাগ্য আজ খুবই ভাল, মিসেস ডারবিও নেই বাড়িতে। সুতরাং টিটুকে নিয়েও বিপদে পড়তে হলো না। রান্নাঘরে একা বসে আছে পলি। ছেলেমেয়েদের দেখে খুশি হলো। বলল, 'দাঁড়াও, বেড়ালগুলোকে হলঘরে আটকে রেখে আসি, তাহলে কুকুরটা ঘরে ঢুকতে পারবে। কি নাম ওর?'
'টিটু,' ফারিহা জানাল।
'বাহ্, ভাল নাম, সুন্দর নাম। এই টিটু, হাড় খাবি?'
শিগগিরই বেড়ালগুলো মাছ চিবাতে লাগল হলঘরে বসে, আর রান্নাঘরের মেঝেতে হাড় চুষতে লাগল কুকুরটা। ছেলেমেয়েদেরকে কিছু চকলেট বের করে দিল পলি। মিসেস ডারবি না থাকায়, খবরদারি করার কেউ না থাকায় আনন্দে আছে মেয়েটা, মনটন ভাল।
'আপনার…' শুরু করতে গেল মুসা।
'বলেছি না আপনি বলবে না,' বাধা দিল পলি।
'ওহ্, মনে থাকে না। বড়দের আপনি বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে তো। আচ্ছা, যাক। তোমার চিঠিটা টরিসকে দিয়ে এসেছি।'
'হ্যাঁ, আজকে ওর চিঠি পেয়েছি,' পলি জানাল। 'খামে টিকিট লাগাতে ভুলে গেছিলাম। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। জানো, ওই শয়তান পুলিশটা

ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নানা আজেবাজে কথা বলেছে, হুমকি-ধামকি দিয়েছে। টরিস তো খুব চিন্তায় পড়ে গেছে।'

'টরিসই আগুন লাগিয়েছে, এ কথা বলেছে নাকি ফগ?' জানতে চাইল রবিন।

'ফগ কি আর একা বলে, অনেকেই বলে এ কথা। কিন্তু এটা ঠিক নয়।'

'তুমি জানলে কি করে?' আচমকা প্রশ্ন করে বসল কিশোর।

'জানি,' চোখ নামিয়ে ফেলল পলি।

'কিন্তু তোমার তো জানার কথা নয়। আগুন লাগার সময় ছিলে না এখানে। কি করে জানলে?'

দ্বিধা করতে লাগল পলি। শেষে বলল, 'বলব সব কথা, কিন্তু যীশুর নামে কসম খেয়ে কথা দিতে হবে তোমাদের, এ কথা কাউকে বলবে না।'

কসম খেতে মুহূর্ত দেরি করল না কেউ।

ভাবনার ছাপ দূর হয়ে গেল পলির চেহারা থেকে। 'কি করে জানলাম জিজ্ঞেস করছ তো? বিকেল পাঁচটায় ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি, একসঙ্গে ছিলাম রাত দশটা পর্যন্ত।'

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। এটা একটা খবর বটে!

'সবাইকে সে কথা জানালে না কেন তাহলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'টরিসকে সন্দেহ করত না আর কেউ।'

চোখে পানি এসে গেল পলির। 'বলার উপায় নেই। আমার এখনও বিয়ের বয়েস হয়নি, ইচ্ছে করলেও কাউকে বিয়ে করতে পারব না। কিন্তু টরিসকে আমি ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসে। আমার বাবা ওকে দেখতে পারে না। বলেছে, ওর সঙ্গে আমাকে দেখলে পিঠের ছাল তুলবে। মিসেস ডারবি এ কথা জানে, আমাকে ভয় দেখায়, টরিসের সঙ্গে আমাকে মিশতে দেখলে বাবাকে বলে দেবে। ফলে ওর সঙ্গে মিশতে পারি না আমি, এ বাড়িতে যখন ছিল, এত কাছাকাছি, তখনও কথা বলতে পারিনি।'

'এ তো মধ্যযুগীয় অত্যাচার!' বলল রবিন। ভয়াবহ ওসব অত্যাচারের কথা বই পড়ে জেনেছে।

কিশোর বলল, 'সুতরাং যেই শুনলে টরিসকে সন্দেহ করছে সবাই, ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি লিখলে?'

'হ্যাঁ। সে রাতে যে ওর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম এ কথা শুনলে বাবা আর আস্ত রাখবে না আমাকে। মিসেস ডারবিও আমাকে কাজে রাখবে না। তার প্রচুর ক্ষমতা এ বাড়িতে। মিসেস আরগফকে যা বলবে তাই শুনবেন।'

'টরিসের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে?'

'তার বোনের বাড়িতে। ইয়োলোস্টোনের কাছেই থাকে। সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলাম। পথে একজায়গায় অপেক্ষা করছিল টরিস। সেদিন বিকেলে চা খেয়েছি তার বোনের বাড়িতে, রাতের খাবারও খেয়েছি। তার দুলাভাই বলেছে চিন্তা না করতে, আরেকটা চাকরি জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করবে।'

পলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। ভবঘুরে বুড়ো বলেছে, সে রাতে ঝোপের মধ্যে টরিসকে দেখেছিল, কথা বলছিল কারও সঙ্গে। রাত দশটা পর্যন্ত যদি বোনের বাড়িতেই থাকে, ঝোপের ভেতর এল কি করে? মিথ্যেটা কে বলছে? পলি, না বুড়ো?

'সত্যি বলছ, সে রাতে একবারের জন্যেও এ বাড়িতে আসেনি টরিস?'

কিশোরের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু আছে, থমকে গেল পলি। অস্থির ভঙ্গিতে রুমাল পেঁচাতে লাগল আঙুলে। চোখ নামিয়ে বলল, 'না, আসেনি। তার বোনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো…'

পলির আচরণেই বুঝে গেল কিশোর, মিথ্যে বলছে মেয়েটা। নাহলে ভয় পেত না এভাবে। বলল, 'দেখো, মিথ্যে বলে লুকাতে পারবে না। টরিসকে ঝোপের মধ্যে দেখেছে একজন।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল পলি। 'অসম্ভব! কি করে দেখবে! দেখতে পারে না!'

'কিন্তু দেখেছে।'

ফোঁপাতে শুরু করল পলি। 'কি ভাবে দেখবে? মিসেস ডারবি আর তার বোন ছিল রান্নাঘরে। মিস্টার আরগফ বাড়িতেই ছিলেন না, শোফারও ছিল না, সাহেবকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল।'

'এ সব কথা তুমি জানলে কি করে? তুমি তো ছিলেই না এখানে।'

কিশোরের এই জেরা করা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে মুসা আর রবিন। মুসার মনে হলো, উকিল, সিনেমায় উকিলকে জেরা করতে দেখেছে; আর রবিনের মনে হলো পোয়ারো, আগাথা ক্রিস্টির অতিবুদ্ধিমান গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। বুঝতে পারছে মেয়েটার পেট থেকে কথা বের করেই ছাড়বে সে। শুরুতে কিশোরকে হেলাফেলা করেছিল বলে লজ্জাই পেতে লাগল এখন।

আর কোন জবাব না পেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো পলি, 'হ্যাঁ, এখানেই ছিলাম আমরা!' ঢোক গিলল সে। 'তোমরা যীশুর নামে কসম খেয়েছ, কাউকে বলবে না। বলবে না তো?'

মাথা নাড়ল গোয়েন্দারা, বলবে না।

পলি বলল, 'টরিসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি সাইকেল নিয়ে। আমাকে বলল সে, তার কিছু জিনিস এ বাড়িতে ফেলে গেছে। কিন্তু নিতে এলে কি করে বসেন মিস্টার আরগফ, ঠিক নেই, তাঁর সামনে আসার সাহস তার হলো না। আমি বললাম, মিস্টার আরগফ বাড়ি নেই। এইই সুযোগ, সে এসে জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারে।'

হাঁ করে শুনছে গোয়েন্দারা। সত্যি কথাটা শুনছে এতক্ষণে।

রুমাল আঙুলে পেঁচাচ্ছে আর খুলছে পলি। 'ওর বোনের বাড়িতে গিয়েছিলাম, এ কথা মিথ্যে নয়। তবে থাকিনি, চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি। চলে এসেছি এখানে। সাইকেল বেড়ার বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকলাম। কাউকে দেখলাম না। একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে দেখতে লাগলাম কেউ আসে কিনা।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর। ভবঘুরের কথার সঙ্গে পলির কথা মিলে যাচ্ছে। বুড়ো বলেছে, ঝোপের মধ্যে কারও সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলেছে টরিস।

'খানিক পরেই বুঝতে পারলাম, মিসেস ডারবির সঙ্গে কথা বলছে তার বোন। বসে আছে তো আছেই, নড়ার আর নাম করে না। টরিসকে বললাম, আমি গিয়ে তার জিনিসগুলো নিয়ে আসি। সে বলল, খুঁজে পাব না, তার নিজেকেই যেতে হবে। তখন আমি নজর রাখতে লাগলাম, সে বেরিয়ে গেল ঝোপ থেকে। পা টিপে টিপে গিয়ে একটা খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল, জিনিসগুলো নিয়ে এসে আবার ঢুকল ঝোপে। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কাউকে আসতে না দেখে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, চলে এলাম সাইকেলের কাছে। একটা জনপ্রাণীকেও চোখে পড়ল না।'

'টরিসকে কটেজের কাছে যেতে দেখোনি?'

'না। সে যায়নি।'

'এত শিওর হচ্ছ কি করে? তোমাকে না জানিয়েও তো যেতে পারে?'

'হচ্ছি, তার কারণ, যেখানে বসেছিলাম, কটেজের কাছে যেতে হলে আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারত না কিছুতেই। তাছাড়া গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসতে তিন মিনিটের বেশি সময় নেয়নি সে, আগুন লাগানোর সময় কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, আমার টরিস এ রকম জঘন্য কাজ করতেই পারে না!'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'তাহলে টরিসকেও সন্দেহ থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। কিন্তু তোমার জঘন্য কাজটা তাহলে কে করল?'

'বাকি আছে ফোর্ড,' কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বলল ফারিহা, 'সে-ই করেছে।'

কথাটা শুনে চমকে গেল পলি। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। মাছের মত একবার হাঁ করেই নিঃশব্দে বন্ধ করে ফেলল আবার।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'সে রাতে এখানে এসেছিল মিস্টার ফোর্ড, ও এ কথা কি করে জানল?'

'জেনেছে যে ভাবেই হোক। তাতে আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'আপনি তো বললেন, কাউকে দেখেননি এখানে?'

'আমি দেখিনি, কিন্তু টরিস দেখেছে। জানালা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠেছিল। ওখান থেকে চোখে পড়েছে, বাগানের গেট দিয়ে চুপি চুপি ঢুকছে একজন লোক। মিস্টার ফোর্ডকে চিনতে পেরেছে সে।'

ঝট করে মুসার দিকে তাকাল রবিন, কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'প্রফেসর সাহেব তাহলে ঢুকেছিলেন বাড়িতে...'

রবিন বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস করায় ভুলে যাওয়ার বাহানা করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন সে জন্যেই। সত্যি কথাটা বলতে চাননি।'

'তারমানে আগুনটা সে-ই লাগিয়েছে,' বলে উঠল আবার ফারিহা। 'আর

কোন সন্দেহ নেই। লোকটা ভাল না, খারাপ।'

পলির দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনার কি মনে হয়? মিস্টার ফোর্ড আগুন লাগিয়েছেন?'

'জানি না। খুবই ভদ্রলোক তিনি। আমার সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করেননি। তাঁর মত লোক এ রকম কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

আরেকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করল, 'টরিসও লাগায়নি, মিস্টার ফোর্ডও যদি না হন, তাহলে কে?'

তেরো

চায়ের সময় হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার সময় হলো গোয়েন্দাদের। কারও কাছে সব কথা বলতে পেরে মনের বোঝা অনেকটা হালকা হলো পলির। হাসি ফুটল মুখে। তাকে অভয় দিয়ে বলল গোয়েন্দারা, সব কথা গোপন রাখবে, একটা কথাও কারও কাছে ফাঁস করবে না। সে যেন চিন্তা না করে।

মুসাদের বাড়িতেই চা খেলো সবাই। চলে এল ছাউনিতে। আলোচনায় বসল।

রবিন বলল, 'আর কোন সন্দেহ নেই, মিস্টার ফোর্ডই কাজটা করেছেন। নইলে কিশোরের প্রশ্ন এড়ালেন কেন? মিসেস টপার বলল, আগুন লাগার পর থেকেই কেমন ভয়ে ভয়ে আছেন তিনি, অপরাধ যদি না-ই করে থাকবেন, ভয় কেন?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'জুতার সাইজও মিলে যায়। যেটা এনেছ, সেটা পরে যাননি সেদিন, অন্যটা পরে গিয়েছিলেন, সেটাই খুঁজে বের করতে হবে এখন আমাদের।'

'কার কোট থেকে কাপড় ছিঁড়েছে, সেটা বের করতে পারলেও হত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'রবিন, মিস্টার ফোর্ডের আলমারিতে ওই রঙের কোট দেখেছ?'

'না। টরিসের পরনে দেখেছি।'

'কিন্তু তার কোটে কোন ছেঁড়া দেখিনি আমি,' মুসা বলল।

'হুঁ, জুতোটাই তাহলে খুঁজে বের করতে হবে আগে,' বলল কিশোর। 'এমনও হতে পারে, লুকিয়ে রাখার জন্যে তাঁর স্টাডিতে রেখেছেন, বইপত্রের আড়ালে। কারণ তিনি জানেন, সেখানে ওগুলো মিসেস টপারের চোখে পড়বে না। ওখানে গোছগাছ করা নিষেধ।'

'ঠিক বলেছ,' তুড়ি বাজাল মুসা। 'আজ রাতে অবশ্যই খুঁজব ওখানে।'

'চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকাটা কি ঠিক হবে?' ফারিহা বলল, 'অন্যায় কাজ।'

'কিন্তু আমরা কোন অন্যায় করছি না,' যুক্তি দেখাল মুসা। 'বরং একজন যে অন্যায় করেছে সেটা বের করার চেষ্টা করছি।'

'যদি ধরা পড়ে যাও?' রাতে চুরি করে এ ভাবে আরেকজনের বাড়িতে ঢুকতে যেতে চাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না রবিনের।

'সাবধান থাকব, যাতে না পড়ি।'

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠল রবিন। কিশোরও উঠল। কুকুরটাকে ডাকল, 'টিটু, আয়, যাই।'

'কিন্তু কি করে কোনখান দিয়ে ঢুকব, কটা সময়, সেটাই তো আলোচনা হলো না,' মুসা বলল। 'বলা যায় না, অনেকে যেমন রাত তিনটেয় ঘুমায়, মিস্টার ফোর্ডও ও রকম হতে পারেন। তাহলেই আর ঢোকা হবে না। সারারাত তো আর বাইরে থাকতে পারব না।'

'না দেখলে জানতে পারব না কখন ঘুমায়,' কিশোর বলল। 'সাড়ে নটায় আমি ও বাড়ির সামনে হাজির থাকব। তুমি পেছন দিয়ে দেয়াল টপকে ঢুকে গেট খুলে দিও। এক কাজ করো, জুতোটা আমাকে দিয়ে দাও, আমার কাছেই থাক। তোমার কাছে থাকলে তোমার আম্মা দেখে ফেলতে পারেন। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান খারাপ হবে তোমার, হয়তো সব কিছুই পণ্ড হবে।'

'তা কথাটা মন্দ বলোনি,' একমত হলো মুসা। 'তুমি যে এসেছ, জানব কি করে?'

'পেঁচার ডাক ডাকব। জন্তু-জানোয়ারের ডাক ভালই নকল করতে পারি আমি।' মুখের কাছে হাত জড় করে হঠাৎ হু-উ-উ হু-উ-উ করে ডেকে উঠল কিশোর। এতই বাস্তব হলো ডাকটা, টিটুও ঘেউ ঘেউ করে উঠল, খুঁজতে শুরু করল পাখিটাকে।

কিশোরের এত গুণ দেখে অবাক হয়ে ফারিহা বলল, 'তুমি অনেক কিছু পারো, কিশোর। তোমার মত এ রকম পারতে আর কাউকে দেখিনি।'

মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে কথা মানতে বাধ্য হলো অন্য দুই গোয়েন্দাও। পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে রবিন, নেতৃত্বটা কিশোরকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় থাকবে না মুসার।

সরাইয়ে ফিরে, কাপড় বদলে ডাইনিং রুমে এসে দেখল কিশোর, চাচা-চাচী বসে আছেন।

মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরি করলি? খেয়ে এসেছিস নাকি মুসাদের বাড়ি থেকে?'

'না। তোমাকে ফেলে রাতের খাবারটা আর কোথাও খেতে ইচ্ছে করে না,' কি করে চাচীকে খুশি করতে হয় ভাল করেই জানে কিশোর, এই এক কথাতেই খুশি করে ফেলল।

কিন্তু কিশোরের চালাকিটা ঠিকই ধরে ফেললেন রাশেদ পাশা, কিছু বললেন না, মুচকি হাসলেন শুধু। একটা কিছু যে করে এসেছে তাঁর ভাতিজা, ঠিকই বুঝতে পারলেন; এই বয়েসে ছেলেরা দুষ্টুমি একআধটু করেই, সেটুকুকে প্রশ্রয় দিতে তাঁর আপত্তি নেই, খারাপ কিছু না করলেই হয়।

মেরিচাচী বললেন, 'আয়, বসে পড়, তোর জন্যেই বসে আছি।'

খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। একটা বই নিয়ে বসল সময় কাটানোর জন্যে। সাড়ে আটটায় চাচা-চাচীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। কান পাতল। কোন শব্দ নেই। চলে এল আবার নিজের ঘরে। বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। কাপড় বদলে নিয়ে দরজার ছিটকানি ভেতর থেকে লাগিয়ে দিয়ে টিটুকে বলল, 'তুই থাক। পাহারা দিবি। আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।'

জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। এগোল ফোর্ডের বাড়ির দিকে। জুতোটা নিয়েছে সঙ্গে।

বাড়ির সামনের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার হয়ে আছে। প্রফেসরের স্টাডির জানালা দেখা যায় না এখান থেকে। রান্নাঘরের জানালায় আলো, তার মানে মিসেস টপার জেগে আছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িতে দেখল, সাড়ে ন'টা বাজতে এখনও অনেক দেরি। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। গেটের কাছ থেকে সরে আসতে যাবে, এই সময় কাঁধ খামচে ধরল একটা কঠিন হাত। নিঃশব্দে কখন যে পেছনে চলে এসেছে লোকটা, টেরই পায়নি। ভীষণ চমকে গেল সে। হাত থেকে খসে পড়ল জুতোটা।

'ঝামেলা!' কানের কাছে বলল একটা খসখসে কণ্ঠ। টর্চ জ্বলে উঠল। আবার বলল কণ্ঠটা, 'ঝামেলা!' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'এই বিচ্ছুটা এখানে কি করছে?' পড়ে থাকা জুতোটার ওপর আলো পড়তে আরও অবাক হলো, 'এটা কি?'

এই অযাচিত বাধায় রেগে গেল কিশোর। বলল, 'দেখতে তো জুতোর মতই লাগছে।'

'কার জুতো? একটা কেন? আরেকটা কোথায়?'

'আমি কি করে জানব?'

'দেখো, বেশি চালাকি কোরো না,' বলে নিচু হয়ে জুতোটা তুলতে গেল ফগ। কিশোরকে ধরা আঙুলগুলো ঢিল হলো। চোখের পলকে এক ঝাঁকুনিতে তার হাত ছুটিয়ে নিয়ে দৌড় মারল কিশোর। পেছনে হই-হই করে উঠল ফগ।

থামল না কিশোর। ফিরেও তাকাল না। ছুটতে ছুটতে চলে এল মুসাদের বাড়ির কাছে। ফোর্ডের বাড়ির মত উঁচু না এই বাড়ির দেয়াল। টপকাতে অসুবিধে হলো না তার। লাফ দিয়ে পড়ল অন্যপাশে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে।

বসে বসে জিরিয়ে নিল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে হাত জড় করে পেঁচার ডাক ডেকে উঠল, 'হু-উ-উ-উ! হু-উ-উ-উ!'

চোদ্দ

আবার চমকাতে হলো কিশোরকে। অন্ধকারে কাঁধ খামচে ধরল কেউ। পা টিপে টিপে পেছন থেকে এসে চেপে ধরেছে। কানের কাছে ফিসফিস করে প্রশ্ন, 'কি হয়েছে?'

'ও, মুসা।' মনে মনে নিজের কানকে গাল দিল কিশোর। ওগুলোর ক্ষমতা যেন বড়ই কম, কিছু শুনতে পায় না, মুসার আগমনও জানতে পারেনি।

'এখানে কেন?'

'ওখানেই গিয়েছিলাম। ঝামেলা পেছন থেকে এসে চেপে ধরল। কেড়ে নিল জুতোটা।'

'এহ্হে, তুমি একটা গাধা! সবচেয়ে দামী সূত্রটা খোয়ালে!'

'আমি গাধাও নই, সূত্রও হারাইনি। ওটা কোন সূত্রই না। অতি সাধারণ একটা জুতো। পেছন থেকে চেপে ধরল, কি করব? হাত ছাড়িয়ে যে পালাতে পেরেছি এই যথেষ্ট।'

'হুঁ,' এক মুহূর্ত চিন্তা করল মুসা। 'কি করা এখন? যাব আবার? ঝামেলাটা আর কোন ঝামেলা করবে না তো?'

'একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এবার দেখেশুনে তবেই কাছে যাব।'

আবার প্রফেসরের বাড়ির কাছে এল দু-জনে। এবার পেছন দিক দিয়ে। দু-পাশ থেকে দু-জনে এগোল গেটের দিকে, ঘুরে এসে একটা জায়গায় মিলিত হবে। চোখে অনেকটা সয়ে এসেছে অন্ধকার। কোনও ছায়ায় কোনও মানুষকে লুকিয়ে থাকতে দেখল না। তারমানে ফগ নেই, জুতোটা নিয়ে চলে গেছে।

রান্নাঘরের জানালায় আলো জ্বলছে এখনও। ফিসফিস করে মুসা বলল, 'আমি দেয়াল টপকাচ্ছি। গেট খুলে দিলে ঢুকবে।'

ঢুকতে কোন অসুবিধে হলো না। রান্নাঘর ছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রফেসর। স্টাডিটা কোনদিকে দেখিয়ে দিল কিশোর। মুসা বলল, 'আমি ঢুকছি। তুমি পাহারায় থাকো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে পেঁচার ডাক ডেকে আমাকে হুঁশিয়ার করবে।'

টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল মুসা। স্টাডিতে চলে এল। বই আর কাগজপত্রে বোঝাই। চেয়ার, টেবিল, মেঝে, কোন জায়গা খালি নেই। দেয়ালের বুককেস বইয়ে ঠাসা। ম্যানটেলপিসের ওপরে বই। এই বইয়ের জঙ্গলের মধ্যে জুতোটা যে কোথায় পাওয়া যাবে, বুঝতে পারল না মুসা। খুঁজতে শুরু করল একধার থেকে।

বই সরিয়ে সরিয়ে তাকের পেছনে দেখতে লাগল। পেল না ওখানে। কাগজপত্রের মধ্যে এসে খুঁজতে শুরু করল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কিশোরের মনে

হলো, হলঘরে ঢুকে আলমারিটাতে আরেকবার খুঁজলে মন্দ হয় না। রবিন পায়নি বটে, কিন্তু ভালমত খুঁজলে সে পেয়েও যেতে পারে আসল জুতোটা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। আলমারির পাল্লা খুলে মাথা ঢুকিয়ে দিল।

জুতো খোঁজায় এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সামনের দরজাটা আস্তে করে লাগিয়ে বাইরে থেকে যে ছিটকানি লাগিয়ে দেয়া হলো সেটা টেরই পেল না। ফলে সাবধান করতে পারল না মুসাকে।

স্টাডিতে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন মিস্টার ফোর্ড। মুসাও তখন আরেকটা তাকের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আলো জ্বলার আগে জানতেই পারল না যে কেউ ঢুকেছে।

ঝট করে মাথা বের করে দেখল দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-জনে, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'চোর! চোর! ডাকাত! শয়তান ছেলে, আমি তোমাকে পুলিশে দেব!'

পালানোর পথ নেই। এতটাই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে মুসা, নড়ার চেষ্টাও করল না। দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরলেন প্রফেসর। ওই বুড়ো হাড্ডিতে যে এতটা জোর থাকতে পারে কল্পনাও করেনি সে। বলল, 'ছাড়ুন, প্লীজ, ছাড়ুন আমাকে! আমি চোর নই...'

কিন্তু কোন কথা শুনতে রাজি নন প্রফেসর। রেগে আগুন হয়ে গেছেন। তিনি ভেবেছেন তাঁর *অমূল্য* কাগজপত্রগুলো চুরি করতে এসেছে মুসা। টানতে টানতে তাকে নিয়ে চললেন হলঘরের দিকে। মুসার সর্বনাশ করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন।

হলঘরে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে কিশোর। পাহারায় না থেকে সে নিজেও ঘরে ঢুকে পড়েছে বলে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। তার ভুলের জন্যেই ধরা পড়েছে মুসা।

'শয়তান ছেলে! চোর! ডাকাত!' বকেই চলেছেন প্রফেসর। মুসার কোন কথা কানে তুলছেন না। ঠেলতে ঠেলতে তাকে তুলছেন সিঁড়ি দিয়ে। ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রেখে এলেন।

মাত্র গিয়ে বিছানায় শুয়েছিল মিসেস টপার, চিৎকার শুনে ছুটে এল হলঘরে। সেখানে প্রফেসরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

'ডাকাত পড়েছে, আর কি হবে!' চিৎকার করে বললেন প্রফেসর। 'চোর! আমার সমস্ত কাগজ চুরি করতে এসেছিল!'

এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি, মিসেস টপার মনে করল, চোর অন্তত দু-তিনজন। অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় ওরা?'

'ধরে ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রেখেছি! শয়তান, আমার সঙ্গে চালাকি!'

আরও অবাক হয়ে গেল মিসেস টপার। দু-তিনটে চোরকে একা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলেছেন মিস্টার ফোর্ড, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন প্রফেসর। কাছে এসে তাঁর হাত ধরে

একটা সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি শান্ত হোন। চোরগুলোকে তো আটকেই ফেলেছেন, পুলিশকে একটু পরে ফোন করলেও চলবে। কোকটোক কিছু এনে দিচ্ছি, খেয়ে ঠাণ্ডা হোন।'

সোফায় এলিয়ে পড়লেন প্রফেসর। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার চোখকে ফাঁকি দেবে, হ্যাহ্! ডাকাতি করতে আসা বের করে দেব না!'

রান্নাঘরে দৌড়ে গেল মিসেস টপার। আলমারিতে লুকিয়ে থেকে সবই শুনছে কিশোর। সে ভাবল, স্টাডিতে চলে গেছেন প্রফেসর। সোফায় যে বসে আছেন, ভাবেনি। ভাবল, এই সুযোগে মুসাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবে। আলমারির দরজা খুলে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন প্রফেসর। দেখে ফেললেন কিশোরকে। চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেলেন।

স্থির হয়ে গেল কিশোর। আরেকটা ভুল করে বসেছে। তাকেও ধরে ফেললেন প্রফেসর।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল কিশোর। কিন্তু আজ যেন চোর ধরার নেশায় পেয়েছে প্রফেসরকে। অসুরের শক্তি ভর করেছে গায়ে। কিছুতেই তাঁর হাত ছাড়াতে পারল না কিশোর। হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল দু-জনেই। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে।

কিশোরের কপাল খারাপ, মেঝেতে এসে নিচে রইল সে। তার ওপর চেপে বসলেন প্রফেসর। চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার হাত থেকে পালাবে, এতই সহজ!'

নিচ থেকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'সরুন, সরুন, দম বন্ধ করে দিলেন তো আমার! শ্বাস নিতে পারছি না!'

দরজায় এসে ভেতরের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল মিসেস টপার। হাত থেকে ছেড়ে দিল দুধের গেলাস। হচ্ছেটা কি? পুরো বাড়িটাই কি ডাকাতে ছেয়ে গেল! চোখ বড় বড় করে দেখল, প্রফেসরের নিচ থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে সরে যাচ্ছে একটা ছেলে।

চিৎকার করে ধমক দিল মিসেস টপার, 'তুমি সেই ছেলেটা না, সকালে এসেছিলে! এত রাতে ঘরে কি করছ?'

অভিনয় শুরু করে দিল কিশোর। বিকট চিৎকার করে উঠল, 'মা গো, মরে গেলাম গো!' ওপর থেকে তার চিৎকার শুনে অবাক হয়ে গেল মুসা, ভাবল, পিটুনি লাগানো হয়েছে তাকে! বন্ধ দরজায় কিল মেরে চেঁচাতে লাগল সে। 'খোলো, খোলো, খুলে দাও!'

এত চেঁচামেচিতে থতমত খেয়ে গেল মিসেস টপার, কি যে করবে বুঝতে পারছে না।

যেন প্রায় মরেই গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করে মূর্ছা যাওয়া রোগীর মত গোঙাতে লাগল কিশোর। চোখ উল্টে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বসল মিসেস টপার। 'হয়েছে কি? বলো না

হয়েছে কি?'

'আমার বন্ধুকে ওপরতলায় রেখে এসেছে,' গোঙাতে গোঙাতে বলল কিশোর। 'তাকে নামিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম, এই সময় আমাকে এসে ঝাপটে ধরলেন মিস্টার ফোর্ড। সিঁড়ি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ও মা গো, আমার শরীরে কি ব্যথা গো! হাড্ডি-গুড্ডি সব ভেঙে গেছে…জখম…আমি আর বাঁচব না গো…আমি মরে যাচ্ছি! আমার এই অবস্থা দেখলে আমার মা যে কি করবে আল্লাহ্ই জানে! মিস্টার ফোর্ডকে ছাড়বে না, কেস করে দেবে তাঁর নামে। পুলিশে খবর দেবে।'

'কি এমন জখম করল! ওর মত একজন বুড়ো মানুষ তোমাকে সিঁড়ি থেকে ছুঁড়েই বা ফেলল কি করে? মিথ্যে কথা বলছ!'

'মিথ্যে বলছি, না?' শার্ট খুলতে গিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল আবার কিশোর। 'এই দেখুন না, কি করেছে! আরও দেখবেন, প্যান্ট খুলব?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল মহিলা।

'তাহলে জলদি ডাক্তার ডাকুন, আমি মরে গেলাম!'

তাজ্জব হয়ে কিশোরের জখমগুলো দেখল মিসেস টপার। প্রফেসরও ঘাবড়ে গেছেন। বিচিত্র সব জখম, রঙগুলো আরও অদ্ভুত—লাল, সবুজ, হলুদ। কোন জখমের রঙ যে এমন হতে পারে, জানতেন না। হাঁ করে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-জনে।

মিসেস টপার বলল, 'কাজটা আপনি ভাল করেননি, মিস্টার ফোর্ড। একটা ছেলেকে এ ভাবে মেরেছেন…কি জবাব দেবেন এখন ওর মাকে?'

প্রফেসরও বোকা হয়ে গেছেন। জোরে জোরে ঢোক গিললেন দু-বার। মিনমিন করে কোনমতে বললেন, 'দেখো, কোন মলম-টলম আছে কিনা। লাগিয়ে দাও।'

'আনছি। আপনি পুলিশকে ফোন করুন।' ওপরতলায় আটকে রাখা ডাকাতদের কথা মনে করে বলল মিসেস টপার।

কিন্তু ফোন করার আর কোন আগ্রহ দেখা গেল না মিস্টার ফোর্ডের। 'পরে করা যাবে। আগে ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করো, এই অদ্ভুত আচরণের মানে কি? রাত দুপুরে অন্যের ঘরে ঢুকতে এল কেন?'

'আগে আমার বন্ধুকে বের করে আনুন,' বলল কিশোর। 'ডাকাতি করতে আসিনি আমরা। একটু মজা করছিলাম। ঠিক আছে, সব ভুলে যেতে রাজি আছি আমরা। আপনিও পুলিশকে ফোন করবেন না, আমিও আমার মাকে কিছু বলব না। জখমগুলোও দেখাব না।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন প্রফেসর।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মিসেস টপার বললেন, 'ডাকাত মানে তাহলে দুটো ছেলে! আর আপনি এমন ভঙ্গি করছেন যেন ভয়ঙ্কর সব ডাকাতে ভরে গেছে সারা বাড়ি। এত কিছু না করে আমাকে ডাকলেই পারতেন। চেঁচামেচি হুড়াহুড়িও হত না, ছেলেটাও ব্যথা পেত না এ ভাবে। আপনাকে নিয়ে যে আমি কি করি!'

'আমি ওকে সিঁড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলিনি!' উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মুসাকে আনতে রওনা হলেন।

একটু পরেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মুসা।

মিসেস টপারও ঢুকল, মলম নিয়ে এসেছে। কিশোরের জখমে লাগাতে শুরু করল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা, কিন্তু কিছু বলল না।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে মিসেস টপার, 'জখমের এমন রঙ হতে তো জীবনে দেখিনি!'

গর্বের সঙ্গে বলল কিশোর, 'জখমের ব্যাপারে আমি একটা বিস্ময়। একবার গোলপোস্টের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছিলাম, জখমটা হয়ে গিয়েছিল গির্জার ঘন্টার মত।'

'এত রাতে আমার বাড়িতে কি করছ তোমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ফোর্ড। জখমের কাহিনী শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। জবাব দিতে পারল না। মুসাও চুপ।

'বলো না কি করছিলে?' মিসেস টপার বলল, 'চুরি করে ঢুকেছ, তার মানে ভাল কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে দাও তো সব।'

তবু চুপ করে রইল ছেলেরা।

ধৈর্য হারালেন প্রফেসর, গেল মেজাজ খারাপ হয়ে। ধমকে উঠলেন, 'হয় বলো, নয়তো পুলিশকে ফোন করব!'

'করুন। ওরা এসে দেখুক আমার জখমগুলো…'

'ওগুলো আজকে হয়নি,' মগজ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে প্রফেসরের, বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে আসছে। 'জখম কেন সবুজ আর হলুদ হয়, জানি আমি, মিসেস টপার হয়তো জানে না।'

চুপ করে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে, ভাঁওতাবাজিতে আর কাজ হবে না।

কলম বের করলেন প্রফেসর, 'নাম ঠিকানা বলো।' ওদেরকে কথা বলতে না দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'জলদি বলো! পুলিশকে তো খবর দেবই, তোমাদের বাবা-মাকেও দেব!'

ভয় পেলেও চুপ করে রইল কিশোর। সহজে পরাস্ত হতে চাইল না। কিন্তু বাবা-মার কথা শুনেই কাবু হয়ে গেল মুসা, আত্মসমর্পণ করল। বলল, 'আজ সকালে নিয়ে যাওয়া একটা জুতো রাখতে এসেছিলাম আপনার আলমারিতে।'

এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস টপার, যেন পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা।

'জুতো?' জানতে চাইলেন প্রফেসর, 'কিসের জুতো? একটা কেন? কি বলছ তুমি?'

'এমন একটা জুতো খুঁজছি আমরা যেটার সঙ্গে একটা ছাপ মিলে যায়।'

শ্রোতাদের জন্যে এটা আরও বিস্ময়কর। ডেস্কে কলম ঠুকতে লাগলেন

প্রফেসর। 'খুলে বলো সব। কিছু বুঝতে পারছি না। এক মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে না বললে পুলিশ এবং তোমার বাবাকে ফোন করব।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

কিন্তু কোন সাহায্য তাকে করতে পারল না কিশোর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'লাভ নেই। বলতেই হবে। তাতে যদি সাবধানও হয়ে যান, কিছু করার নেই।'

'তোমাদের কথার মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' একটা করে কথা বলে ওরা, আর আরও বেশি করে অবাক হয় মিসেস টপার।

'সাবধান হয়ে যাব মানে?' প্রফেসর জানতে চাইলেন, 'এ সব কথার অর্থ কি? এখন তো মনে হচ্ছে দু-জনেরই মাথা তোমাদের পুরোপুরি খারাপ!'

'না, খারাপ না,' শুকনো গলায় বলল মুসা। 'মিস্টার ফোর্ড, আমরা জানি আপনি আগুন লাগার দিন সন্ধ্যায় মিস্টার আরগফের বাড়িতে ঢুকেছিলেন।'

কথাটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল প্রফেসরকে। হাত থেকে কলম খসে পড়ল। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নাক থেকে খুলে বুকের ওপর ঝুলে পড়ল চেনে বাঁধা চশমা। কেঁপে উঠল দাড়ি। মিসেস টপারকে দেখে মনে হলো, দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবে না আর।

'আপনি গিয়েছিলেন যে অস্বীকার করতে পারবেন?' নিজেই জবাব দিল মুসা, 'পারবেন না। কারণ একজন আপনাকে দেখে ফেলেছে। বলেছে আমাদেরকে।'

'কে···কে বলেছে!' ঠিকমত কথা বেরোচ্ছে না প্রফেসরের।

'টরিস দেখেছে, আরগফের খানসামা। বিকেল বেলা তার ফেলে যাওয়া জিনিস নিতে ও বাড়িতে গিয়েছিল, দোতলার জানালা থেকে দেখেছে আপনাকে। পুলিশ যে ডাকতে চান, কি জবাব দেবেন তাদের কাছে?'

'মিস্টার ফোর্ড, আপনি এমন কাজ করতে পারলেন!' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মিসেস টপার।

প্রফেসরও বসলেন আবার। নাকের ওপর তুলে দিলেন চশমাটা। মিসেস টপারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? ভাবছ আমি আগুন লাগিয়েছি? এত বছর কাজ করছ আমার কাছে, আমাকে চেনো না? কি করে ভাবতে পারলে এ রকম একটা জঘন্য কাজ আমি করতে পারি? তুমি জানো, একটা মাছি মারার ক্ষমতা নেই আমার।'

'সেটাই জানতাম। তাহলে বলুন, ও বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন? সত্যি কথাটা বলুন, আমি আপনার সঙ্গে আছি। যা-ই ঘটুক, আমি সব সামলাব।'

'সামলানোর কিছু নেই, কারণ আমি কিছু করিইনি। গিয়েছিলাম আমার কাগজগুলো আনতে, সকালে যেগুলো ফেলেই পালিয়ে এসেছিলাম। ও বাড়িতে ঢুকেছি ঠিক, কিন্তু কটেজের ধারেকাছেও যাইনি। এই যে এই কাগজগুলো আনতে গিয়েছিলাম,' টেবিলের ড্রয়ার খুলে একগোছা কাগজ বের করে ঠেলে দিলেন সামনে।

পনেরো

প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে তিনজোড়া চোখ। বুঝতে পারছে, সত্যি কথাই বলছেন তিনি।

'হুঁ,' অবশেষে মাথা দোলাল কিশোর, 'তাহলে এ জন্যেই গিয়েছিলেন। খাদে তাহলে আপনি নামেননি?'

'আমি খাদে নামতে যাব কেন? ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে গিয়ে দেখি বাগানের দিকের দরজাটা খোলা। ঢুকে পড়লাম। সকালে টেবিলে যেখানে ফেলে এসেছিলাম কাগজগুলো, দেখি সেখানেই আছে। সেগুলো তুলে নিয়ে সোজা চলে এলাম। ঢোকার আগে গেটের কাছে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম অবশ্য, কেউ আছে কিনা শিওর হওয়ার জন্যে।'

অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কিশোর, মুসা দু-জনেই, মিস্টার ফোর্ড সত্যি কথা বলছেন বলেই মনে হচ্ছে। আর তা হয়ে থাকলে সন্দেহের তালিকায় তো কেউ থাকল না। আগুনটা লাগাল তাহলে কে?

'আমার কথা তো আমি বললাম,' প্রফেসর বললেন, 'এখন তোমরা বলো, আমার জুতো নিয়েছিলে কেন?'

জানাল তাঁকে গোয়েন্দারা। জুতোটা এখন কার কাছে তা-ও বলল।

খেপে উঠলেন প্রফেসর, 'ওই নাক গলানো স্বভাবের পুলিশটা! ও, এ জন্যেই, কয়েকবার আজ সামনের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি তাকে। বার বার এ দিকে তাকাচ্ছিল। তারমানে সে-ও আমাকে সন্দেহ করেছে। জুতোটা দিয়ে দিয়েছ তাকে, এখন সন্দেহ আরও বাড়বে। তোমাদের যে কি করব, ধরে চাবকানো উচিত!'

'আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'একজন অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করছি।' এ ক'দিনে যা যা করেছে ওরা, প্রফেসরকে জানাল সে।

শুনতে শুনতে চোখ কপালে উঠে গেল মিসেস টপারের। তার মনিবকে সন্দেহ করে এ বাড়িতে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে ঢুকেছে ওরা, এই ব্যাপারটাই বেশি বিস্মিত করল তাঁকে। কারণ মিস্টার ফোর্ডকে ভাল করেই চেনে সে।

'হুঁ, বুঝলাম,' সব শুনেটুনে বললেন মিস্টার ফোর্ড, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার তোমরা বাড়ি যাও। আমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাও, আগুন আমি লাগাইনি। কে লাগিয়েছে তা-ও জানি না। তবে টরিস লাগিয়ে থাকতে পারে। বয়েস অল্প তো, রক্ত গরম, রেগে গিয়ে দিয়েছে হয়তো লাগিয়ে। ভবঘুরেটার কাজও হতে পারে। যাকগে, ও ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। পুলিশের কাজ, পুলিশ যা পারে করুক। তোমাদের মত কয়েকটা বাচ্চা ছেলের কাজ নয় এ সব। আর কিছু করতে যেয়ো না, অহেতুক বিপদে পড়বে।'

উঠে দাঁড়াল ছেলেরা। কিশোর বলল, 'আপনার জুতোটা চুরি করেছিলাম বলে দুঃখিত, স্যার।'

'দুঃখ আমারও লাগছে,' শুকনো গলায় বললেন প্রফেসর, 'কারণ জুতোটার ভেতর দিকে আমার নাম লেখা রয়েছে। বার বার হারিয়ে ফেলি তো, কোথাও খুলে রাখলে আর পরতে মনে থাকে না; পরে যাতে পাওয়া যায় সে জন্যে মিসেস টপার লিখে দিয়েছে। খুব সাবধানী মহিলা। বুঝতে পারছি, সকাল হলেই এখানে পায়ের ধুলো দেবে ফগর‍্যাম্পারকট। ঠিক আছে, যাও। আর আমাকে কোন ব্যাপারে সন্দেহ কোরো না। আগুন লাগানো, চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম এ সব আমার কাজ নয়। পুরানো দলিলপত্র, বই, এ সব ছাড়া আর কোন কিছুতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

ভাবতে ভাবতে প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। তিনি কটেজে আগুন লাগিয়েছেন, এ কথাটা আর বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। তাহলে কে করল কাজটা? টরিসেরই কাজ? জেনেশুনে তাকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলেছে পলি? আচ্ছা, আরগফের শোফার রোজার নয় তো? কিন্তু তাকে সন্দেহ করা যাচ্ছে না, কোন মোটিভ নেই তার। আর তার কথা একটিবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি কেউ: মিসেস ডারবি থেকে শুরু করে পলি, ভবঘুরে বুড়ো, কেউ না।

'তোমার জখমগুলো খুব কাজে লাগল, কিশোর,' হেসে বলল মুসা। 'ওগুলো না থাকলে এত সহজে ছাড়া পেতাম বলে মনে হয় না।'

'লাগাতে জানলে সব কিছুকেই কাজে লাগানো যায়,' অন্যমনস্ক হয়ে বলল কিশোর। 'আচ্ছা, চলি।'

'কাল সকালে চলে এসো। ছাউনিতে থাকব আমরা।'

পরদিন সকালে মুসাদের বাগানের ছাউনিতে মিলিত হলো সব কজন গোয়েন্দা। রাতের অভিযানের কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল রবিন ও ফারিহা। হাসির পালা চুকলে আলোচনায় বসল, কে আগুন লাগিয়েছে কটেজে সেটা নিয়ে। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারল না। শেষে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয়, আবার একবার আরগফের বাড়িতে যাওয়া উচিত, সূত্র খোঁজার জন্যে। হয়তো জরুরী কোন কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে আমাদের।'

'কি এড়াবে?' মুসার প্রশ্ন।

'তা জানি না।'

'এতদিন পর পাওয়া যাবে?'

'তা-ও জানি না। যেতেও পারে। পেলাম বা না পেলাম, গিয়ে দেখতে তো আর দোষ নেই।'

বাড়িতে ঢুকে পলিকে কাপড় শুকাতে দিতে দেখল ওরা।

শিস দিয়ে তাকে ডাকল মুসা। পলি ফিরে তাকাতেই হাতের ইশারায় ডাকল। মিসেস ডারবি বাড়ি নেই, কাজেই ভয় নেই পলির, দৌড়ে এল।

'কী?'

কিশোর বলল, 'কোন ঝোপটাতে লুকিয়েছিলেন আপনারা, দেখান তো।'

হাত তুলে পথের পাশেরই একটা ঘন ঝোপ দেখাল পলি।

'খাদের কাছে একবারও যাননি?'

'না। ওখানে যাব কি করতে?'

'আচ্ছা, এ জন্যেই ডাকলাম। আপনি যান।'

সবাইকে নিয়ে আবার এসে খাদে নামল কিশোর। নুয়ে পড়া বিছুটিগুলো আবার সোজা হয়েছে। তবে এখনও বোঝা যায়, কোনগুলো নুয়ে গিয়েছিল। বেড়ার ফোকর দিয়ে অন্যপাশে গিয়ে পায়ের ছাপগুলো আবার দেখল। আছে, তবে অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নতুন আর কিছু পাওয়া গেল না।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ,' কিশোর বলল হঠাৎ, 'ছাপগুলো একটা দিকেই গেছে, বাড়ির দিকে, ফেরার কোন চিহ্ন কিন্তু নেই। খাদে নেমেছে যে লোকটা, সে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে বেড়ার ফোকর দিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু এ পথে আর বেরোয়নি।'

'তাতে কি বোঝা যায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

'দূর!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, 'আমার আর ভাল্লাগছে না এ সব গোয়েন্দাগিরি! যত্তসব অকাজ! তার চেয়ে মাথা থেকে এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলো সাগরের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'সে তো অনেক দূর!' রবিন বলল।

'তাতে কি? সাইকেল চালাতে চালাতে চলে যাব।'

'আমিও যাব,' আবদার ধরল ফারিহা।

'না, এত দূরে তুমি যেতে পারবে না। তুমি টিটুকে নিয়ে খেলো।'

মুখচোখ করুণ করে ফেলল ফারিহা। তার এই অবস্থা দেখে মায়া লাগল কিশোরের। বলল, 'তোমার জন্যে অনেক ফুল নিয়ে আসব।'

রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল ফারিহা। ভাবতে লাগল, কবে যে সে ওদের মত বড় হবে আর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে...

সাইকেলের পেছন পেছন কিছুদূর দৌড়ে গেল টিটু। খাউ খাউ করে চেঁচাল। কিন্তু ধরতে পারবে না বুঝে নিরাশ হয়ে ফিরে এল। লেজ নাড়তে লাগল ফারিহার দিকে তাকিয়ে।

ফারিহা বলল, 'চল, আজও আমরা নদীর ধার থেকেই বেড়িয়ে আসি।'

আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। নরম হয়ে আছে মাটি, কাদাপানি জমে আছে গর্ত আর নিচু জায়গাগুলোতে। হাঁটতে গিয়ে ফারিহার মনে হলো, রবারের জুতো পরে এলে ভাল হত। কিন্তু এখন আর বাড়ি ফিরে গিয়ে পরে আসতে ইচ্ছে হলো না। যা পায়ে আছে তাই নিয়ে টিটুকে সহ এগিয়ে চলল।

কিছুদূর এসে বড়রাস্তা থেকে পাশের একটা গলিতে নেমে পড়ল সে। এই রাস্তাটা একজায়গায় এসে মোড় নিয়ে নদীর ধার দিয়ে এগিয়েছে। নদীর ধার ধরে কিছুক্ষণ চলার পর একপাশের একটা মাঠে নামল দু-জনে। কয়েক দিন আগে এখান দিয়ে যাওয়ার সময়ই ভবঘুরের দেখা পেয়েছিল ওরা। কেন যেন ফারিহার মনে হতে লাগল, আজও একটা সূত্র পেয়ে যাবে।

এবং পেয়েও গেল সত্যি, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই জানান দিয়েছে। একটা সরু কাঁচা রাস্তায় এসে দেখতে পেল জুতোর দাগ। এই ছাপ দেখে দেখে মনে গেঁথে গেছে তার। দেখামাত্র চিনে ফেলল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই ছাপওয়ালা জুতো খুঁজতে খুঁজতেই তো অস্থির হয়ে পড়েছে ওরা। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছে, তারমানে তার পর, অর্থাৎ সকালের দিকে হেঁটে গেছে কেউ এ পথে। হয়তো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল।

উত্তেজিত হয়ে কুকুরটাকে বলল, 'দেখ টিটু, দেখ, কি কাণ্ড!'

বুঝতে পারল বুদ্ধিমান কুকুরটা। ছাপগুলো শুঁকতে লাগল। তাকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল ফারিহা।

কাদামাটিতে গভীর হয়ে বসেছে ছাপ। অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। তবে একজায়গায় এসে কঠিন হয়ে পড়ল কাজটা। পথের ধার থেকে মাঠে নেমে পড়েছিল লোকটা। ঘাসের মধ্যে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেল না ফারিহা। টিটুকে বলল, 'দেখ তো টিটু, তোর তো নাকের অনেক শক্তি, গন্ধ পাস কিনা?'

নাক নিচু করে ঘাসের মধ্যে শুঁকতে শুঁকতে চলল কুকুরটা। মাঠ পেরিয়ে এল। আরেকটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে অন্যপাশ থেকে। সেদিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'ওহ্, টিটু, তোর সাংঘাতিক বুদ্ধি! ঠিক পথে এসেছিস!'

রাস্তাটায় আবার পায়ের ছাপ বসে গেছে।

আসতে আসতে মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে চলে এল দু-জনে। বাগানের একদিকের একটা ছোট গেটের ভেতরে ঢুকেছে রাস্তাটা। সেটা খুলে ঢুকে পড়ল ফারিহা। দেখল, পায়ের ছাপ পড়েনি এখানকার শক্ত মাটিতে, তবে কাদামাটি পড়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে। টুকরোগুলো বেশির ভাগই চারকোণা। পরিষ্কার বোঝা যায়, জুতোর তলায় লেগে গিয়েছিল আঠাল মাটি, এখানে এসে হাঁটার সময় খসে খসে পড়েছে।

লোকটার সাহস তো কম না!—অবাক হয়ে ভাবল ফারিহা, আগুন লাগিয়েছে তো লাগিয়েছে, আজ আবার এই বাড়িতেই ঢুকেছে!

হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

চোখ তুলে তাকিয়ে ফারিহা দেখল, ঘরের পেছনের একটা দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার আরগফ। কটমট করে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। ধমকে উঠলেন, 'এই মেয়ে, কে তুমি? কুত্তা নিয়ে ঢুকেছ কেন?'

ভয় পেলেও পিছাল না ফারিহা, এগিয়ে গেল। বলল, 'একটা পায়ের ছাপ ধরে এসেছি, মিস্টার আরগফ। কেউ ঢুকেছে আজ আপনার বাড়িতে?'

অবাক মনে হলো আরগফকে। ভ্রূকুটি করলেন। 'বুঝলাম না কি বলছ?'

'বুঝলেন না? এই ছাপগুলো কার সেটা জানলেই আমরা জেনে যাব কে আপনার কটেজে আগুন দিয়েছে।'

স্থির হয়ে গেলেন আরগফ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ফারিহার দিকে। হাত নেড়ে ডাকলেন, 'ভেতরে এসো।...না না, কুত্তাটাকে আনার দরকার নেই। ওটা বাইরেই থাক।'

'কিন্তু ও থাকতে চাইবে না। যতক্ষণ না ঢুকতে দেবেন, আপনার দরজা আঁচড়াবে।'

'বেশ, তাহলে নিয়েই এসো।'

ওদেরকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন আরগফ। বসতে দিলেন ফারিহাকে। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো কি বলতে চাও। বুঝতে পারছি, আমাকে সাহায্য করতে চাইছ।'

একজন বড় মানুষ তার প্রতি এতটা মনোযোগ দিয়েছে দেখে গলে গেল একেবারে ফারিহা। কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল। হড়হড় করে বলে দিতে লাগল গত কদিন ধরে কি কি করেছে ওরা।

তবে বড় বিরক্ত করছে টিটু। খালি ছোঁক ছোঁক করছে, আর গিয়ে ঘুরছে আরগফের পায়ের চারপাশে, ফগকে দেখলে তার পায়ের চারপাশে যেমন ঘুরতে থাকে। ধমক দিলেন আরগফ, পা দিয়ে ঠেলে সরাতে যেতেই পায়ে কামড়ে দিতে চাইল টিটু। তারমানে তাঁকে পছন্দ হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে তুলে এনে কোলে বসিয়ে আটকে রাখল ফারিহা। আবার বলে গেল তার কাহিনী। শেষ করার পর বলল, 'সে জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ আপনার বাড়িতে কে এসেছিল।'

'দু-জন এসেছিল,' আরগফ বললেন। 'মিস্টার ফোর্ড আর টরিস। ফোর্ড এসেছিল সব মিটমাট করে নিতে। আমিও দেখলাম ঝগড়া বাধিয়ে রেখে লাভ নেই। মিটমাট করে ফেললাম। আমার একটা বই পড়ার জন্যে নিয়ে চলে গেছে। টরিস এসেছিল রেফারেন্সের জন্যে, আমার কাছে কাজ করেছে যে সেটা লিখে নিতে।'

'টরিসের পায়ে রবার সোলের জুতো দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল ফারিহা। 'আমার বন্ধুরা এলেই তাদের খবরটা দিতে হবে। আমি যে আপনাকে এত কথা বলে গেলাম, কাউকে বলবেন না কিন্তু, প্লীজ। কথা দিন।'

'আচ্ছা, বলব না।'

কুকুরটাকে কোল থেকে নামাতেই আবার আরগফের পায়ের কাছে গিয়ে ঘুরতে লাগল ওটা। আর সহ্য করতে পারলেন না তিনি, এতক্ষণ যে করেছেন এই বেশি, দিলেন কষে এক লাথি। কেঁউ কেঁউ করতে করতে ফারিহার কাছে ফিরে এল বেচারা টিটু।

আরগফের এই ব্যবহার ভাল লাগল না ফারিহার। বলল, 'ওর মত একটা ভাল কুকুরকে লাথি মারাটা ঠিক হয়নি আপনার, মিস্টার আরগফ। সে-ও তো

গোয়েন্দাদেরই একজন। আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আরগফের। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাহায্য করা লাগবে না আমার। যাও, বেরোও! খবরদার, ওই পাজি কুত্তাটাকে নিয়ে ঢুকবে না আর আমার বাড়িতে। বড়দের কাজে নাক গলাবে না। তোমার বন্ধুদেরও বলে দিয়ো সে কথা! যা করার পুলিশই করতে পারবে।'

আরগফের এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল ফারিহা। তাড়াতাড়ি টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে এল। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। আবার হাঁটতে বেরোল।

ঘুরে ঘুরে সময় আর কাটে না কাটে না। কত কিছু করল দু-জনে, ঝোপের আড়ালে লুকোচুরি খেলল, প্রজাপতি আর ফড়িঙ তাড়া করে বেড়াল, এমন কি টিটু যখন খরগোশকে তাড়া করল তখনও বাধা দিল না ফারিহা। বরং তাকে সাহায্য করল। তারপরেও কাটতে চাইল না সময়। সব কথা মুসাদেরকে বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে।

দুপুরের পর ওদেরকে আসতে দেখল সে। দৌড়ে গিয়ে থামাল। জানাল সব খবর।

রেগে উঠল মুসা, 'আরগফকে বলতে গেলে কেন? এখনও তো কেসের কিনারা হয়নি আমাদের।'

'বা-রে, তাঁর বাড়ি পুড়েছে, তাকে বলব না?'

আর কিছু বলল না মুসা। সবাই মিলে বাড়ি ফিরল।

গেটের ভেতরে ঢুকতেই বারান্দায় বেরোলেন মুসার আম্মা। কড়া গলায় ডাকলেন, 'মুসা, এদিকে আয়!'

মায়ের কণ্ঠস্বরেই অনুমান করে ফেলল মুসা, খারাপ খবর আছে। সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল। কিশোররা সবাই গেল তার পেছনে।

ড্রইংরুমের ভেতরে চোখ পড়তেই চমকে উঠল মুসা। সোফায় বসে পা দোলাচ্ছে স্বয়ং ঝামেলা র‍্যাম্পারকট! মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ও এখানে কেন?'

'তোমাদের বিচার নিয়ে এসেছেন!' কঠিন কণ্ঠে বললেন মিসেস আমান।

শীঘ্রি জানা গেল, কেন এসেছে ফগ। মা বললেন, 'গত কদিন ধরে তোমরা নাকি অনেক অকাজ করে বেড়িয়েছ। তাঁর কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি।'

'তা কি কি অকাজ করেছি, শুনি?' বলে ফগের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল মুসা।

'ও রকম অভদ্রের মত মুখ করছ কেন?' ধমক দিলেন মা। 'তোমরা নাকি পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছ। কাল রাতে চুরি করে ঢুকেছিলে মিস্টার ফোর্ডের বাড়িতে। ভাগ্যিস তিনি কোন অভিযোগ করেননি পুলিশের কাছে, তাহলে এখন হাজতে থাকতে হত তোমাদের। আজ সকালে গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়েছে ফারিহা, পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে ঢুকে পড়েছে মিস্টার আরগফের বাড়িতে। ভাল মেয়েটাকে খারাপ বানিয়ে ফেলছ তোমরা।'

'মিস্টার কটকে এ কথা কে বলল?' ফেটে পড়ল ফারিহা। 'তাঁর তো জানার কথা নয়! জানি কেবল আমি আর মিস্টার আরগফ!'

'পাজিগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে তুমিও পাজি হয়ে উঠেছ!' ফারিহাকে বকা দিলেন মিসেস আমান। 'এ ভাবে কথা বলা কোত্থেকে শিখলে?'

ফগ জানাল, 'মিস্টার আরগফই আমাকে ফোন করে সব জানিয়েছেন।'

ফোঁপাতে শুরু করল ফারিহা। 'কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছে কাউকে বলবে না! তাহলে বলল কেন? যে লোক কথা দিয়ে কথা রাখে না সে ভাল লোক নয়! ওই লোকটা খারাপ, খুব খারাপ! আমি ওকে ঘৃণা করি!'

'ফারিহা!' জোরে ধমক দিলেন মিসেস আমান, 'ভদ্রভাবে কথা বলো!'

রাগে চোখ লাল হয়ে গেছে মুসার। ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই জন্যেই পিচ্চিগুলোকে আমি কোন কাজে নিতে চাই না! সব বলে দিয়েছে আরগফকে! বুড়ো শকুনটা পাঠিয়েছে এখন ঝামেলাটাকে…'

'এই, বিড়বিড় করে কি বলছিস?' জিজ্ঞেস করলেন মা, 'ঝামেলা কে?'

'কে আবার, দেখতে পাচ্ছ না তোমার সামনে বসে আছে! কথায় কথায় খালি ঝামেলা ঝামেলা করে!'

ফগও রেগে গেল। উঠে দাঁড়াল লাফ দিয়ে। আঙুল তুলে শাসাল, 'দেখো, তোমাদের অত্যাচার অনেক সহ্য করা হয়েছে। মিসেস আমানের সামনেই বলে যাচ্ছি, আর যদি পুলিশের কাজে বাধা দিতে দেখি, খারাপ হবে। খুব খারাপ। মনে রেখো কথাটা। ঝামেলা!' বলেই তাড়াতাড়ি মিসেস আমানের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে ফেলল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও বেরিয়ে যেতেই ফুঁসে উঠল মুসা, 'ঝামেলাটা এমন করে কেন? ওকে তো সাহায্যই করতে চেয়েছি আমরা!'

'কোন কথা শুনতে চাই না আমি,' শাসিয়ে বললেন মা, 'এ সব বিচার যেন আর না আসে বাড়িতে, বলে দিলাম!' বেরিয়ে গেলেন তিনিও।

ষোলো

মুসার আম্মা চলে যেতেই বেচারি ফারিহার ওপর ঝাল তুলতে শুরু করল মুসা, 'গাধা কোথাকার! দরদে একেবারে উথলে উঠেছেন! কে বলতে বলেছিল আরগফকে সব কথা?'

'সব নষ্ট করে দিলে তুমি, ফারিহা,' রবিন বলল।

'গোয়েন্দাগিরির এখানেই ইতি!' গজগজ করতে লাগল মুসা, 'পোলাপানকে দলে নিলে এই হয়!'

কেবল কিশোর ফারিহার পক্ষে কথা বলল, 'ও কি আর জানত, আরগফ এত্তবড় বেঈমান, কথা দিয়েও কথা রাখবে না?'

'না জেনে বলতে গেল কেন? না বললেই তো আর এ সব হত না!'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ফারিহা।

চেঁচামেচি শুনে আবার ঘরে ঢুকলেন মুসার আম্মা। 'কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছিস কেন?' ফারিহার দিকে চোখ পড়তে বললেন, 'কেঁদে আর কি হবে? চোখ মোছো। লজ্জা-টজ্জা কিছু হয়েছে তো, না কি? এখনই যাও মিস্টার আরগফের বাড়িতে। মাপ চেয়ে এসো। রোজ রোজ তাঁর বাড়িতে গিয়েছ তোমরা, নিশ্চয় তিনি মাইন্ড করেছেন।'

'কি বলছ তুমি, মা! আমরা তো কোন অন্যায় করিনি!' প্রতিবাদ করল মুসা।

'অন্যের বাড়িতে না বলে ঢোকাটাই অন্যায়। যাও। যা বলছি, করো।'

কি আর করবে। আরগফের বাড়ি রওনা হলো সবাই। ও রকম একটা মানুষের কাছে শুধু শুধু মাপ চাইতে যেতে রাগই লাগছে ওদের।

'ওটা একটা ধাড়ি শকুন,' প্রচণ্ড ক্ষোভ সামলাতে না পেরে বলল মুসা, 'ঠিকই বলেছে ভবঘুরে বুড়ো! শয়তান লোক!'

সবাই একমত হলো এ ব্যাপারে।

'এখন তো আমারও তার ঘরে আগুন লাগাতে ইচ্ছে করছে!' রাগ করে বলল কিশোর।

'আমার করছে তার গাঁয়ে লাগাতে!'

'ওর কটেজ পুড়েছে, ভাল হয়েছে!' রবিনের মত নিরীহ ছেলেও রেগে গেছে। 'এখন আর জানলেও বলব না কে পুড়িয়েছে!'

টিটু কেবল খউ খউ করল। অন্যদের মত আরগফকেই বকল কিনা, বোঝা গেল না।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। পথে পড়ে থাকা মাটির টুকরোগুলো দেখাল ফারিহা। শুকিয়ে গেছে।

ঘন্টা বাজাতে দরজা খুলে দিল মিসেস ডারবি। দলটাকে দেখে অবাক। টিটুকে দেখেই লেজ তুলে দৌড় দিল কিটি।

কিশোর বলল, 'মিস্টার আরগফকে বলবেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, প্লীজ?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মিসেস ডারবি, এই সময় স্টাডি থেকে ডাক শোনা গেল, 'মিসেস ডারবি, কে কথা বলে?'

'চারটে ছেলেমেয়ে আর একটা কুকুর। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর শোনা গেল, 'নিয়ে এসো।'

ওদেরকে স্টাডির দরজা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এল মিসেস ডারবি।

একটা বড় চেয়ারে বসে আছেন আরগফ। কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন এসেছ?'

'মা বলল, আমাদের সবাইকে এসে আপনার কাছে মাপ চাইতে,' মুসা বলল। বাকি সবাই গুঞ্জন তুলে সমর্থন করল তার কথা। 'না বলে আপনার বাগানে ঢুকেছিলাম, মিস্টার আরগফ, আমরা দুঃখিত।'

অনেকটা কোমল হলো তাঁর দৃষ্টি। 'হুম্। ঠিক আছে, মাপ করে দিলাম.

আর কক্ষণো এমন কোরো না।'

ফারিহা না বলে পারল না, 'মিস্টার আরগফ, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, যা বলেছি কাউকে বলবেন না।'

একটা ছোট্ট মেয়েকে কি কথা দিয়েছেন, সেটা রাখার কোন প্রয়োজন মনে করেননি আরগফ, কাজেই ফারিহার কথায় লজ্জা পাওয়ার কোন চিহ্ন দেখা গেল না তাঁর চেহারায়। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভয়াবহ শব্দ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক জেট বিমান। ঝনঝন করে উঠল জানালার কাঁচ, চমকে দিল সবাইকে, ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

জানালার কাছে দৌড়ে গেল রবিন। ওখান থেকে চিৎকার করে বলল, 'সেই প্লেনগুলোই! সেদিন বিকেলে যেগুলো গিয়েছিল। মহড়া দিচ্ছে।'

'ঘোড়ার ডিম করতে এসেছে এখানে, আর কাজ পেল না!' খেঁকিয়ে উঠলেন আরগফ। 'এসেছে মানুষকে জ্বালাতে! সেদিনও এমনি করেই চমকে দিয়েছিল। একটার শব্দেই কান ফেটে যেতে চায়! সাত-সাতটা প্লেন, সোজা কথা!'

ফারিহা আর মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে রবিনের পাশে। আজও সাতটা বিমানই মহড়া দিচ্ছে। তিনজনেই তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে। কিন্তু বিমানের দিকে কোন খেয়াল নেই কিশোরের। সে তাকিয়ে আছে আরগফের দিকে। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল। ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার।

কিছুদূর গিয়ে ঘুরে, বিশাল চক্কর নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল জেটগুলো।

'চলো, বাগানে গিয়ে দেখি,' মুসা ডাকল সবাইকে। 'ওখান থেকে ভাল দেখা যাবে। চলি, মিস্টার আরগফ। গুড-বাই।'

'গুড-বাই। আর কোন শয়তানিতে জড়াবে না। আমার বিশ্বাস, কটেজে আগুন দিয়েছে টরিস। ফগকে আমি বলে দিয়েছি সে কথা। আজ সকালে রবার সোলের জুতো পরে এসেছিল সে-ই, সেটাও বলেছি পুলিশকে। ওর বিরুদ্ধে শীঘ্রি কেস খাড়া করবে পুলিশ।'

কেউ কিছু বলল না। বেচারা টরিসের জন্যে খারাপ লাগল সবারই। বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। বিমান দেখতে লাগল সবাই, কেবল কিশোর বাদে। সে-ও তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে, তবে দেখায় মন নেই, সে ভাবছে অন্য কথা।

কানে আঙুল দিল সবাই। বিকট গর্জন করতে করতে নিচু দিয়ে উড়ে গেল ওগুলো।

'সাংঘাতিক শব্দ!' কান থেকে আঙুল সরিয়ে বলল মুসা, 'চলো, বাড়ি যাই। মাপ তো চাওয়া হলো…' কিশোরকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?'

নীরবে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রবিন, 'তোমার জখমগুলো ব্যথা করছে

নাকি?'

'না, এক্কেবার ভুলে গেছি ওগুলোর কথা,' আকাশের দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই প্লেনগুলোর কথা ভাবছি।'

'ওগুলো নিয়ে আবার ভাবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আজ নিয়ে এদিকে দু-বার এসেছে ওগুলো। একবার আজকে, আরেকবার কটেজে আগুন লাগার দিন সন্ধ্যায়।'

'তাতে কি?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। 'এতে মুখ অমন গোমড়া করে ফেলার কি হলো?'

'বোঝোনি কিছু, না?'

'না, কি বুঝব?'

ঘুরে সবার মুখোমুখি তাকাল কিশোর। থেমে গেল তিনজনেই। 'শোনো, আরগফ কি বলেছেন, ভাবো। বলেছেন, এসেছে মানুষকে জ্বালাতে। সাত-সাতটা প্লেন!'

'কি বলতে চাইছ, বাবা, একটু সহজ করে বলো না!'

'আগুন লাগার দিন সন্ধ্যায় আরগফ কোথায় ছিলেন?'

'হলিউডে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে হয়তো ট্রেনে ছিলেন তখন।'

'তাহলে জানলেন কি করে সেদিনও প্লেন এসেছিল এখানে? সাতটা? ওই সময় হলিউডে থাকলে তো নয়ই, ট্রেনে থাকলেও তাঁর জানার কথা নয় এটা।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ…' বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

'হ্যাঁ, আরও একজন যোগ হলো আমাদের সন্দেহের তালিকায়। আরগফ নিজে।'

'কিন্তু নিজেই নিজের বাড়ি পোড়াতে যাবেন কেন?'

'ইন্স্যুরেন্সের টাকার জন্যে। লোকে অনেক সময় লোভে পড়ে করে বসে এই কাজ। কাগজগুলো আগেই কারও কাছে বেচে দিয়েছেন গোপনে। তারপর আরও টাকা পাওয়ার জন্যে কটেজে আগুন ধরিয়েছেন। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে জানিয়েছেন, বীমা করা কাগজগুলো ঘরের মধ্যেই ছিল, সেগুলোও পুড়েছে। অসম্ভব মনে হচ্ছে এখন?'

'এ কথা কাউকে বলতে পারব না আমরা!' গলা কাঁপছে রবিনের। 'কেউ বিশ্বাস করবে না!'

'প্রমাণ পেলে করত,' মুসা বলল। 'কিন্তু সেটা পাব কোথায়? জুতো, কিংবা কোট…'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না কিশোর, 'আমাদের জানতে হবে, আগুন লাগিয়ে গিয়ে সেদিন হলিউডের ট্রেনে উঠলেন কি করে আরগফ…'

'আমি বুঝে ফেলেছি!' আরও উত্তেজিত হয়ে বলল রবিন।

'কি বুঝেছ!' একযোগে প্রশ্ন করল অন্য তিনজন।

'মুসা, স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে একজায়গায় লাইন খারাপ হয়ে গেছে, দেখোনি? গাড়ি ওখানে খুব আস্তে চলে। ইচ্ছে করলে যে কেউ তখন হ্যান্ডেল

ধরে লাফিয়ে উঠে পড়তে পারে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো হয়েই গেল!' দু-আঙুলে চুটকি বাজাল কিশোর। 'সিজন টিকেট থাকলে উঠতে আর কোন অসুবিধেই নেই। ভাঙা জায়গাটা থেকে উঠে গ্রীনহিলসে এসে নেমে পড়বে। চেকার জানতেই পারবে না কোনখান থেকে উঠেছে। ভাববে, বুঝি হলিউড থেকেই।' সবার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিল সে। 'পুরো চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখন। হলিউডে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেদিন আরগফ। শোফার তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। তিনিও ট্রেনে উঠে চলে গেছেন। কিন্তু পরের স্টেশনেই নেমে হেঁটে চলে এসেছেন বাড়িতে। রাস্তা দিয়ে আসেননি, কারও চোখে পড়ার ভয়ে। মাঠ পেরিয়ে এসে বেড়া ফাঁক করে ভেতরে ঢুকেছেন, লুকিয়ে থেকেছেন খাদের মধ্যে। অন্ধকার হলে উঠে এসে কটেজে ঢুকেছেন, ভেতর থেকে আগুনটা লাগার ব্যবস্থা করেছেন। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সে জন্যেই শুধু তাঁর আসার ছাপ আছে, যাওয়ার নেই। অন্ধকার থাকায় বেরোতে দেখেনি কেউ তাঁকে। হেঁটে চলে গেছেন রেললাইনের খারাপ অংশটার কাছে। ট্রেন এলে উঠে পড়েছেন, নেমেছেন গ্রীনহিলস স্টেশনে। সেখান থেকে তাঁকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে তাঁর শোফার। এসে আর কি, অভিনয় শুরু করেছেন। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে তাঁর। নিজের ঘরে নিজে আগুন দিয়েছেন একজন ভদ্রলোক, কারও মাথাতেই আসেনি সেটা।'

'ভদ্রলোক না ছাই!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল ফারিহা, 'আমি তখনই বলেছি, লোকটা ভাল না। যে লোক কথা দিয়ে কথা রাখে না, সে ভাল হতে পারে না।'

হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। টিটু যে কোন ফাঁকে সরে গেছে ওখান থেকে, খেয়াল করেনি কেউ। খরগোশ তাড়া করে গিয়ে ঢুকেছে ঝোপটায়, ভেবে, তাকে বের করে আনতে গেল কিশোর। অন্যেরা এল তার পেছনে।

ঝোপের ভেতর উঁকি দিয়ে থ হয়ে গেল সবাই। নতুন মাটি চাপা দেয়া একটা ছোট গর্তের আলগা মাটি আঁচড়ে তুলে একটা জুতো ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছে টিটু। আরও একটা আছে মনে হচ্ছে মাটির নিচে।

অবাক কাণ্ড! জানল কি করে কুকুরটা, ওগুলো এখানে আছে? সবাই সন্দেহ করল, গন্ধ হতে পারে। ঝোপের পাশ দিয়ে আসার সময় গন্ধ পেয়েছিল টিটু, চলে গেছে দেখার জন্যে। কোনভাবে ও বুঝে গিয়েছিল, ওই বিশেষ গন্ধটার প্রতি আগ্রহী হয়ে আছে তার বন্ধুরা। তাছাড়া সে নিজেও পছন্দ করে না গন্ধটা, ফলে এই আগ্রহ। যাই হোক, রহস্যটা ভেদ করা গেল না। টিটু কথা বলতে পারলে নাহয় তার কাছে জিজ্ঞেস করে জানা যেত।

কি ভাবে গর্তটা আবিষ্কার করল টিটু, এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। জুতোটা পাওয়া গেছে, এটাই আসল কথা। সোলটা একবার দেখেই নিশ্চিত

হয়ে গেল কিশোর, এই জুতোর ছাপই দেখেছে, এগুলোই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'আর এক মুহূর্তও এখানে নয়!' তাগাদা দিল কিশোর, 'জলদি বেরোও সবাই! আরগফ দেখে ফেলার আগেই!'

গেটের বাইরে বেরিয়েও থামল না ওরা। দৌড়াতে শুরু করল। ভয়, যে কোন মুহূর্তে আরগফ এসে কেড়ে নেবে জুতোগুলো, মূল্যবান প্রমাণ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আরগফের বাড়ি থেকে দূরে এসে থামল ওরা। হাঁপাতে হাঁপাতে কিশোর বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? ফারিহার কাছে জুতোর ছাপের কথা শুনেই সতর্ক হয়ে গেছে আরগফ। সে বেরিয়ে আসার পর তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে ঝোপের ভেতর। তার কপাল খারাপ, টিটু গিয়ে বের করে ফেলেছে।'

'কিন্তু তাতেই বা কি লাভ?' মুসা বলল, 'আমাদের কথা কে শুনবে? মাকে বলে কিছু হবে না, ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবে। বাবা থাকলে হয়তো বোঝাতে পারতাম। কিন্তু শুটিঙে গেছে, আসতে অনেক দেরি হবে।'

'আমার বাবাকে অবশ্য বলে দেখতে পারি,' রবিন বলল।

'চলো, নদীর ধারে গিয়ে বসে কথা বলি,' কিশোর বলল। 'মুসা, জুতাগুলো সঙ্গে নেয়া উচিত হবে না। একদৌড়ে গিয়ে ছাউনিতে লুকিয়ে রেখে এসো।'

সতেরো

নদীর পাড়ে একটা উঁচু জায়গায় এসে বসল ওরা। উঁচু উঁচু ঘাস ওখানে। গরগর করে উঠল টিটু। তবে কোনদিকে গেল না, ওদের কাছেই বসে পড়ল।

'এই টিটু, ও রকম করলি কেন?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'কি দেখেছিস?'

জবাবে আবার গরগর করে উঠল কুকুরটা।

'নিশ্চয় খরগোশ দেখেছে,' মুসা বলল। 'অভাব তো নেই এখানে।'

'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' রবিন বলল। 'আগুন কে লাগিয়েছে, জানি আমরা; কি ভাবে কি করেছে সব জানি, অথচ তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। বাবাকে বিশ্বাস করাতে পারলেও আমাদের লাভ নেই। পুলিশকে হয়তো খবর দেবে। আর পুলিশ মানেই এখানে ঝামেলা র‍্যাম্পারকট। সবটা কৃতিত্ব সে নিজেই নিয়ে নেবে, আমাদের নামও উচ্চারণ করবে না। এত কষ্ট করে লাভটা কি হবে তাহলে আমাদের?'

'সমস্যাটা তো সেখানেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমার চাচাকে বললেও পুলিশকে জানাবে, কিন্তু সে-ও তো ওই ঝামেলা। এত কষ্ট করলাম আমরা, এত বকা শুনলাম, অথচ বাহাদুরিটা সে নিয়ে নেবে, এ তো হতে দিতে পারি না। আবার ওদিকে এতবড় একটা শয়তানি করে পার পেয়ে যাবে

বুড়ো শকুনটা, তা-ও হতে দেয়া যায় না। ওকে ধরিয়ে না দিলে আরেকজন নিরপরাধ লোক বিপদে পড়বে, টরিস, ফাঁসিয়ে দেয়া হবে তাকে। সমস্যায় পড়লাম না?'

'হ্যাঁ,' একবাক্যে স্বীকার করল সবাই।

আলোচনা চলতেই থাকল, কিন্তু কেউ কোন বুদ্ধি বের করতে পারল না। এই সময় আবার গরগর করে উঠল টিটু, বেশ জোরের সঙ্গেই।

এবার আর গুরুত্ব না দিয়ে পারল না কিশোর। 'কি হয়েছে তোর? এমন করছিস কেন?'

উঁচু ঘাসের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একটা গোল বিরাট মুখ। পাড়ের নিচ থেকে উঠে আসছেন ভদ্রলোক। দু-চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ।

অবাক হয়ে, ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। এতক্ষণে বুঝতে পারল, কেন গরগর করেছে টিটু।

'চমকে দিলাম, না?' হেসে বললেন তিনি। 'নিচে মাছ ধরতে বসেছিলাম। তোমাদের সব কথা শুনেছি। কৌতূহল হলো, না এসে থাকতে পারলাম না।'

পাড়ের ওপর উঠে এলেন তিনি। মুখটা যেমন বড়, শরীরটাও বিরাট। পরনে জিনস, পায়ে কেডস। ওদের পাশে এসে বসে পড়লেন। পকেট থেকে চকোলেট বের করে দিলেন সবাইকে।

তাঁকে পছন্দ না করে পারল না ফারিহা। বলল, 'সব তো শুনেই ফেললেন। আর লুকিয়ে কি হবে। আমরা গোয়েন্দা।'

'তাই নাকি?' হাসলেন ভদ্রলোক। পাইপ ধরালেন। তাঁর হাত চেটে দিল টিটু। তিনিও তার মাথা চাপড়ে আদর করলেন।

'আপনি এখানে নতুন?' জানতে চাইল মুসা। 'আগে কিন্তু দেখিনি আর।'

'নতুন না, তবে এ গাঁয়ে থাকি না। ছুটির দিনে মাছ ধরতে আসি প্রায়ই। তোমাদের মত গোয়েন্দাগিরির শখ আমারও ছিল ছোটবেলায়।'

'বাহ্, তাহলে তো খুব ভাল কথা। আমাদের সমস্যাটা নিশ্চয় বুঝবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। পাইপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রেখে বললেন, 'বুঝলাম, তোমরা একটা রহস্যের সমাধান করেছ, এবং সেটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছ।'

'হ্যাঁ। এখানকার পুলিশম্যান ফগর্যাম্পারকট আমাদের দেখতে পারে না। আমাদের নামে বিচার দিয়ে এসেছে আমার মা'র কাছে। অথচ অন্যায় কিছু করিনি আমরা। একটা কটেজ পোড়ানো হয়েছে, কে পুড়িয়েছে বের করার চেষ্টা করেছি।'

'এবং সেটা বের করেও ফেলেছ, তাই না? কিন্তু জানাতে পারছ না কাউকে। রাগ লাগাটা স্বাভাবিক তোমাদের, আমার হলেও লাগত। সব কথা খুলে বলো আমাকে, হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারব।'

সবার মুখের দিকে তাকাল মুসা। নীরব সম্মতি সবার চোখে—এই লোককে বিশ্বাস করা যায়। সুতরাং শুরু থেকে সব কথা তাঁকে খুলে বলল মুসা। মাঝে মাঝে কথা ধরিয়ে দিল রবিন, কিশোর আর ফারিহা।

চুপচাপ শুনলেন ভদ্রলোক। তারপর মাথা দুলিয়ে বললেন, 'খুব ভাল গোয়েন্দা তোমরা। চমৎকার কাজ দেখিয়েছ। তোমাদের আমি সাহায্য করব।'

'কি ভাবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'প্রথমে ওই ভবঘুরেকে ধরে আনতে হবে। তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি, সে-রাতে আরগফকে খাদে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিল সে, হয়তো আগুন লাগাতেও দেখেছে। ভয়ে বলেনি, কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না তার কথা, উল্টো আরও ফাঁসিয়ে দিতে পারে। অহেতুক পুলিশী ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। তার মুখ থেকে সব শুনতে পারলে সুবিধে হবে পুলিশের। একজন সাক্ষিও পাওয়া যাবে।'

পুলিশ মানেই তো ফগ, দমে গেল আবার ওরা। রবিন বলল, 'কিন্তু ওই ভবঘুরেকে কোথায় পাব? কোথায় চলে গেছে কে জানে?'

'তোমাদের হয়ে আমি তাকে খুঁজে আনার ব্যবস্থা করব,' কথা দিলেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু ফগর‍্যাম্পারকটকে তো কিছু বোঝাতে পারবেন না,' কিশোর বলল। 'ওই লোকটা আমাদের ঝামেলা ঝামেলা বলে, আসলে ও নিজেই একটা মস্ত ঝামেলা। মাথায় ঘিলু বড় কম।'

'সহজে যাতে বুঝতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করা হবে,' বললেন রহস্যময় মানুষটা। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা এক কাজ কোরো, তোমাদের কাছে যা যা প্রমাণ আছে, নিয়ে কাল সকাল দশটায় গ্রীনহিলস পুলিশ ফাঁড়িতে চলে এসো। আমি সেখানে থাকব। যা যা করার করব।'

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। পাড়ের নিচে নেমে ছিপটা কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। উঁকি দিয়ে সবই দেখতে পেল গোয়েন্দারা। দেখল, ঘনিয়ে আসা সাঁঝের অন্ধকারে ধীরে ধীরে নদীর বাঁকে হারিয়ে গেল বিশাল ছায়ামূর্তিটা।

আঠারো

উত্তেজনায় সে রাতে ভাল ঘুম হলো না গোয়েন্দাদের কারোরই। খুব ভোরে উঠে পড়ল। তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরে মুসাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল রবিন, কিশোর ও টিটু। এসে দেখল ছাউনিতে বসে আছে মুসা ও ফারিহা।

দশটা বাজার অপেক্ষায় বসে রইল ওরা। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে, এখনও অনেক দেরি।

তবে যাওয়ার সময় হলো একসময়। ওদের কাছে যা যা প্রমাণ আছে, নিয়ে থানায় রওনা হলো।

থানার সামনে এসে জানালা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল ওরা। ফগ বসে আছে, ক্যাপটা মাথায় নেই, টেবিলে রাখা। তার পাশে বসে আছে আরেকজন পুলিশম্যান।

গোয়েন্দাদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ফগ। ওরা আশা করেছিল, 'যাও, ভাগো, ঝামেলা!' বলে খেঁকিয়ে উঠবে; কিন্তু ওদের অবাক করে দিয়ে তেমন কিচ্ছু বলল না সে। মোলায়েম কণ্ঠে ভেতরে যাওয়ার জন্যে ডাকল।

ভেতরে ঢুকল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তার পা ঘিরে ঘুরতে আরম্ভ করল টিটু। কিন্তু তাকেও কিছু করল না ফগ। লাথি মারার চেষ্টা করল না।

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা এখানে,' কিশোর বলল।

'চলে আসবেন এখুনি,' ফগ বলল।

একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল আঙিনায়। গোয়েন্দারা আশা করেছিল, রহস্যময় ভদ্রলোককে দেখবে; কিন্তু তাঁর বদলে নামল অন্য আরেকজন, একেও চেনে ওরা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ভবঘুরে বুড়োর দিকে।

সাদা পোশাক পরা একজন পুলিশম্যান নামল গাড়ি থেকে। বুড়োকে নিয়ে এগিয়ে এল।

ভীষণ ভয় পেয়েছে বুড়ো, তার মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। বিড়বিড় করতে করতে থানায় ঢুকল। বলতে লাগল, 'আমি কিছু করিনি। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই বলবে আমি কারও কোন ক্ষতি করি না। কোন গোলমালে জড়াই না।'

এই সময় আরেকটা গাড়ি এসে থামল প্রথম গাড়িটার পাশে। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার নেমে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরল। নামলেন ইউনিফর্ম পরা আরেকজন বিশালদেহী লোক।

'আরি!' বলে উঠল ফারিহা। 'এ তো তিনি, সেই ভদ্রলোক! তারমানে উনিও পুলিশ!'

গোয়েন্দাদের দেখে হেসে বললেন তিনি, 'হাল্লো, এসে গেছ।'

'বুড়োটাকে ধরে এনেছি, ক্যাপ্টেন,' বলল সাদা পোশাক পরা পুলিশম্যান।

'ফগের বাপ এসেছেন!' ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল মুসা। 'দেখছ, কেমন থরথর করে কাঁপছে ফগ?'

মুসা অনেক বাড়িয়ে বলেছে, কাঁপছে না ফগ, তবে ভয় যে পেয়েছে এটা ঠিক। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কল্পনাই করতে পারেনি এখানে এসে হাজির হবেন তাঁর ওপরওলা ক্যাপ্টেন রবার্টসন।

'তুমি খুব লাকি, ফগ,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমার এলাকায় এত বুদ্ধিমান কয়েকটা ছেলেমেয়ে রয়েছে।'

কিন্তু নিজেকে একটুও 'লাকি' ভাবতে পারল না ফগ। বরং ছেলেমেয়েগুলো তার চেয়ে বোকা হলেই খুশি হত। পারলে এখনও কানটি

চেপে ধরে বের করে দেয়। কিন্তু সেটা এখন তার পক্ষে অসম্ভব। জোর করে মুখে হাসি এনে বলতেই হলো, 'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

ভবঘুরেকে ক্যাপ্টেনের সামনে আনা হলো। একবার জিজ্ঞেস করতেই হড়হড় করে পেটের কথা উগড়ে দিতে লাগল সে, 'আমি কারও কোন ক্ষতি করি না। সেদিনও করিনি। একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি সেই লোকটার গলা, সকাল বেলা যাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। টরিস। তার সঙ্গে আরেকজন ছিল ঝোপের মধ্যে, মেয়েমানুষ, গলা শুনেছি কিন্তু দেখিনি। একটু পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল টরিস।'

'তারপর?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'তারপর দেখি এক বুড়োকে। সকাল বেলা আরগফের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। নামটা বোধহয় ফোর্ড, কিংবা ও রকম কিছু। গেট দিয়ে ঢুকে সোজা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল, ঠিক এই সময় জানালা দিয়ে আবার বেরিয়ে এল টরিস।'

'বলে যান। আর কাউকে দেখেছেন?'

'দেখেছি। বাড়ির মালিক আরগফকে।'

'কি করছিল?'

প্রায় দম বন্ধ করে শুনতে লাগল গোয়েন্দারা। বুড়ো বলল, 'ঝোপের ভেতর শুয়ে থেকেই একটা শব্দ শুনলাম। দেখি, পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে ঢুকছে একজন লোক। ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলাম। আরগফ! এ ভাবে চোরের মত নিজের বাড়িতে ঢোকার কি মানে বুঝতে পারলাম না। একটা খাদের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। যখন সন্ধ্যা হলো, অন্ধকার হয়ে এল, তখন খাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর থেকে একটা টিন বের করে আনল।'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। ঠিক এ রকমই কল্পনা করেছিল সে। মিলে যাচ্ছে বুড়োর কথার সঙ্গে।

বুড়ো বলতে লাগল, 'টিনটা হাতে নিয়ে কটেজে ঢুকে গেল আরগফ। বেরিয়ে এল কয়েক মিনিট পর। দরজায় তালা লাগিয়ে আবার গিয়ে লুকিয়ে রইল খাদের মধ্যে। আমি বেরোলাম না। আরও যখন অন্ধকার হলো, খাদ থেকে উঠে এসে গেট খুলে বেরিয়ে গেল সে। খানিক পরেই আগুন দেখতে পেলাম কটেজের ভেতর। চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ল আগুনটা। আর থাকলাম না ঝোপের ভেতর। বেরিয়েই দিলাম দৌড়। ধরা পড়লে দোষটা ঠিক আমার ঘাড়ে চাপত।'

'থ্যাংক ইউ,' তাকে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আর কাউকে দেখেছেন ও বাড়িতে?'

'না।'

'চমৎকার প্লট। টাকার প্রয়োজন হয়েছিল আরগফের। ভেবেচিন্তে বুদ্ধিটা ভালই বের করেছিল। একই দিনে কয়েকজনের সঙ্গে ইচ্ছে করে ঝগড়া

বাধাল, যাতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আর পুলিশের নজর তাদের ওপর পড়ে, তাদেরকে সন্দেহ করে; ভাবে, কেউ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওই কাজ করেছে।'

'ক্যাপ্টেন, এখন তাহলে কি করব?' জানতে চাইল সাদা পোশাক পরা অফিসার। 'আরগফকে তো ধরা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'কি হয় জানাব তোমাদেরকে। পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছ তোমরা, অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের কাছে পুলিশ কৃতজ্ঞ। কি বলো, ফগর‍্যাম্পারকট?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ!' আবার জোর করে হাসল ফগ। মনে মনে যে 'বিচ্ছুগুলোকে' গাল দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছে সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিশোরের। ওরা তার চেয়ে বেশি চালাক ভাবতেই পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে নিশ্চয় তার।

থানা থেকে বেরিয়ে এল ছেলেমেয়েরা। ক্যাপ্টেনও বেরোলেন। বললেন, 'আমি তোমাদের ওদিকেই যাব, আরগফের বাড়িতে। চাইলে তোমাদেরকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে পারি।'

খুশি হয়েই তাঁর গাড়িতে উঠল ছেলেমেয়েরা। মুসা বলল, 'ক্যাপ্টেন, আপনি যদি আমার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে পারতেন, আমাদের কথা সব বুঝিয়ে বলতেন, খুব ভাল হত। মা অহেতুক রেগে আছে আমাদের ওপর।'

'বেশ,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'যাওয়ার পথে দেখা করে যাব।'

কথা রাখলেন তিনি। যাওয়ার পথে ঢুকলেন মুসাদের বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করে স্তম্ভিত করে দিলেন মুসার আম্মাকে।

ড্রইংরুমে বসেছেন ক্যাপ্টেন। ছেলেমেয়েরাও ওখানেই ভিড় করছে। মুসা জানতে চাইল, 'আরগফের কি খবর?'

'আমি নিজে তাকে প্রশ্ন করেছি। প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু প্লেনগুলোর কথা কি করে জানল, জিজ্ঞেস করতেই চুপ হয়ে গেল, আর জবাব দিতে পারল না। দোষ স্বীকার করেছে। থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। যতদিন না ফেরে বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়েছে মিসেস ডারবিকে।'

'তাহলে তো খুব খারাপ হলো,' রবিন বলল। 'বাড়ির কর্তৃই হয়ে গেছে এখন ধরতে গেলে। বেচারি পলির ওপর অত্যাচার আরও বাড়বে।'

'তা পারবে না। মিসেস ডারবির সামনে পলিকে বলে এসেছি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে যাতে পুলিশকে খবর দেয়। আর অত্যাচার করার সাহস পাবে না মিসেস ডারবি।'

হুঁ, খুব ভাল। খুশি হলো গোয়েন্দারা।

কিশোর বলল, 'সব প্রশ্নেরই তো জবাব পাওয়া গেল, কেবল একটা বাদে।'

'কী?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'ওই বাদামী কাপড়ের টুকরোটা। কার কোট থেকে যে এল! মিস্টার আরগফের?'

'না,' হাসলেন ক্যাপ্টেন। তাকিয়ে রয়েছেন মুসার দিকে। বললেন, 'এই রহস্যটার সমাধান আমি করে দিতে পারি।'

'পারেন!' চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা। 'করুন তো?'

'কাপড়টা মুসার কোটের। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময় খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যে রয়ে গিয়েছিল, কেউই খেয়াল করোনি তোমরা। হয় এ রকম, সবচেয়ে কাছের সূত্রটাই চোখ এড়িয়ে যায় বড় বড় গোয়েন্দাদেরও। এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।' হাসলেন তিনি, 'ভাগ্যিস, মুসার কোট থেকে ছিঁড়েছে যে বুঝতে পারোনি। তাহলে তো তাকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলে দিতে।'

ক্যাপ্টেনের রসিকতায় হেসে উঠল সবাই।

মুচকি হেসে উঠে গেলেন মুসার আম্মা, মেহমানকে চা-নাস্তা দেয়ার জন্যে।
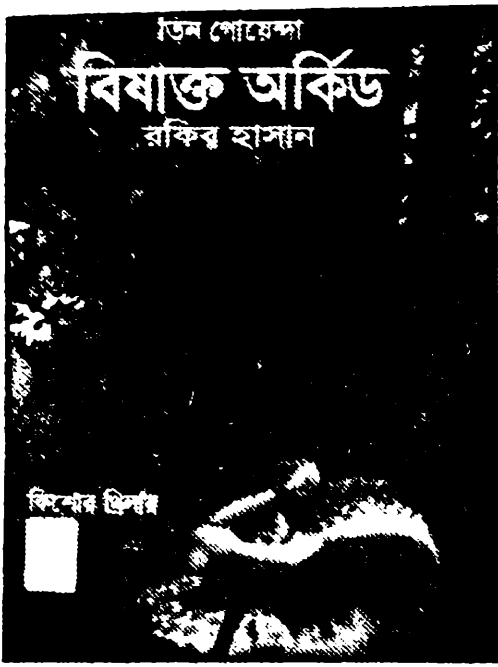
বিষাক্ত অর্কিড

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৭

ভারী মেঘের ভেতর থেকে বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে অবিরাম বৃষ্টি। রিও হুরারা নদীর কালো পানিতে আওয়াজ তুলছে ঝমঝম ঝমঝম। হাজার হাজার নালা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে নদীটাকে।

একরত্তি বাতাস নেই। দুতীরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বনের গাছগুলোকে মনে হচ্ছে কালো পাথরের পাহাড়।

নদীতে ভাসছে একটা উভচর বিমান। বাতাস নেই, তাই ঢেউও নেই, তবে স্রোত আছে; আর তাতেই মৃদু দুলছে বিমানটা।

ফুলতে থাকা পানির দিকে অস্বস্তিভরা চোখে তাকিয়ে আছে ওমর। তার পাশে আর পেছনে বসা তিন গোয়েন্দারও কারও চোখে অস্বস্তি, কারও শঙ্কা। উজান থেকে ভেসে আসছে আবর্জনা, উপড়ানো শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের দঙ্গল, মরা গাছ। ওরকম একটা গাছের ডালে আটকা পড়েছে একটা বানর। মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে আর চিৎকারে গলা ফাটাচ্ছে।

পাশ দিয়ে ভেসে গেল একটা ক্যানূ। আগাগোড়া পলিথিন মুড়ি দিয়ে গলুইয়ে ঝুঁকে বসে দাঁড় বাইছে একজন লোক।

স্রোতের মত পানি গড়াচ্ছে বিমানের গায়ে। তালপাতার বেড়া দেয়া বড় একটা ঘর চোখে পড়তে আরও ভাল করে দেখার জন্যে একপাশের জানালা সামান্য ফাঁক করল ওমর। কয়লা-কালো ছোট্ট এক টুকরো চরামত জায়গার ওপারে উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে আছে কুঁড়েটা।

'এটাই হবে,' অনুমান করল সে। 'হলে বাঁচতাম। এ অবস্থায় বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। এত বৃষ্টিতে ওড়া যাবে না। নদী দিয়ে চালিয়ে গেলেও মরা গাছে গুঁতো লেগে তলা ফুটো হয়ে যাবার ভয়।'

জানালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখল মুসা, 'এর নাম ভিলা? ফুহ্!'

'তুমি কি মার্বেল পাথরের পিলার আর সিংদরজা আশা করেছিলে নাকি?' পেছন থেকে টিটকারি দিল রবিন।

'অতটা খারাপ অবশ্য আশা করিনি। ভিলা নাম রাখা হয়েছে যার, সেটা এত সাধারণ একটা কুঁড়ে, কল্পনাই করা যায় না। আর বৃষ্টিও যা শুরু হলো, বাপরে বাপ!'

'নতুন দেখছ নাকি?' কিশোর বলল, 'এমন ভঙ্গিতে কথা বলছ যেন আমাজন এলাকায় আর আসোনি। সেবার না কতদিন থেকে কত জন্তু-জানোয়ার ধরে নিয়ে গেলাম?'

'কিন্তু এখানটাতে তো আর আসিনি।'
'তাতে কি? এটাও আমাজন। গ্রীষ্মমণ্ডল। বৃষ্টি হবেই।'
'তাই তো দেখছি। তা থামবে কখন?'
'আমি কি জানি?'

'এখানে বসে বকবক করে লাভ নেই,' মুসার দিকে তাকাল ওমর, 'স্টিকটা ধরো তো। আমি নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি এটাই বুমারের বাড়ি কিনা।'

তথ্য যা পেয়েছে ওরা, তাতে জানা গেছে ক্রুজোয়াড়ো শহরের মাইল চারেক ভাটিতে নদীর কিনারে একটা খাঁড়ির ধারে সেজউইক বুমারের ভিলা। সেটাই খুঁজছে এখন।

জায়গা ছেড়ে দিল ওমর। সরে এসে তার সীটে বসল মুসা।

'সাবধান,' ওমর বলল, 'পানির নিচে চোরাপাথর থাকতে পারে। খোঁচা লাগিয়ে পেট চিরে ফেলো না।'

বিমানের নাক ঘুরিয়ে দিল মুসা। কোন রকম বিপত্তি না ঘটিয়ে নিরাপদে এনে তীরে ঠেকাল। মসৃণ বালিতে ঘষা খেল বিমানের পেট।

মাটিতে লাফিয়ে নামল ওমর। কয়েক ইঞ্চি কাদায় পা দেবে গেল। বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোল ভসভস করে। হাঁটতে গিয়ে দেখে পা তোলা কঠিন, এতই আঠাল। কয়েক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাড়ির কাছে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে এল ওরা, বেশির ভাগই ইনডিয়ান।

বারান্দায় বসে থাকা একজন উঠে এল, চেহারা দেখেই বোঝা যায় ফিরিঙ্গি। মিশ্র রক্ত আছে শরীরে। অবিশ্বাস্য নোংরা। দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ। মাথায় দোমড়ানো স্লাউচ হ্যাট, শার্টের কোমর চিরে ফালা ফালা, ঢোলা একটা ক্যানভাসের প্যান্ট পরনে। কোমরে চামড়ার বেল্টে গোঁজা ইয়াবড় এক ছুরি। অতিমাত্রায় বুনো, তবে ওমরের হাসির জবাব হাসি দিয়েই দিল।

'বুয়েনস দিয়াস, সেনর,' নতুন কারও সঙ্গে দেখা হলে এ কথা দিয়েই শুরু করে ওখানকার লোকেরা। এর মানে হলো—গুড ডে বা শুভদিন। তারপর আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে বলল ওমর, 'কুই মাল তিয়েম্পো।' অর্থাৎ 'কি সাংঘাতিক খারাপ আবহাওয়া।'

'এল তিয়েম্পো এসতা মুই ইনসেকুয়েরো,' জবাব দিল লোকটা। অর্থাৎ, 'হ্যাঁ, আবহাওয়া সত্যি বড় খারাপ।'

মত বিনিময় শেষ করে লোকটার পিছু পিছু এসে তার ঘরে ঢুকল ওমর। বড় বড় কয়েকটা রবারের তাল পড়ে আছে। লোকটার কাজ কি এখানে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। রবার ব্যবসায়ী। কথায় কথায় জানা গেল, ওর নাম পুকিতো কাসলার। বাবা ইংরেজ, মা এ দেশী ইনডিয়ান। ভাল ইংরেজি বলতে পারে। কথা বলতে সুবিধে হলো ওমরের।

না, এটা সেজউইক বুমারের অর্কিড ভিলা নয়। তিনি থাকেন আরও মাইলখানেক উজানে। ভাল করেই চেনে তাঁকে পুকিতো। অর্কিডের ব্যবসা করেন। তার লোকেরা জঙ্গলে রবার জোগাড় করতে গেলে মাঝে মাঝে দুর্লভ

অর্কিড পেয়ে যায়। নিয়ে আসে। ভাল দামে বুমারের কাছে সেসব ফুল বিক্রি করে পুকিতো।

অর্কিড ভিলা খুঁজে পাওয়া মোটেও কঠিন কিছু নয়। নদীর কিনার ধরে উজানের দিকে এগোলেই আরেকটা বড় খাঁড়ি পাওয়া যাবে, তার ধারে বুমারের বাড়ি। দেখলেই চেনা যাবে।

বিমানে ফিরে এসে সঙ্গীদের জানাল ওমর, 'আরও মাইলখানেক যেতে হবে। ঠিক পথেই এগোচ্ছি।' মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'পারবে তুমি?'

'উড়তে হবে?'

'না, এই অল্প পথ ওড়ার আর দরকার নেই। গাছের জন্যে বাড়িটা নাও দেখা যেতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে হয়তো ওপর দিয়েই চলে যাব, কিন্তু দেখতে পাব না। তার চেয়ে নিচেই থাকি। ধীরে ধীরে এগোও। আমরা সবাই চোখ রাখছি।'

বেশি পানিতে বিমান সরিয়ে আনল মুসা। ট্যাক্সিইং করে এগোল। জানালা খুলে তীরের দিকে তাকিয়ে রইল ওমর, রবিন আর কিশোর।

ঠিকই বলেছে পুকিতো। খুঁজে পাওয়া মোটেও কঠিন হলো না। দেখেই চেনা গেল। সরু একটা খাল ঢুকে গেছে ভেতরে। তীরে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি। পুকিতোর কুঁড়ের চেয়ে ভাল, কিন্তু ভিলা ভাবতে হাসি পায়। কাঠ আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি লম্বা একটা পায়ার নেমে এসেছে বাড়ির কাছ থেকে পানিতে। মাথায় বাঁধা রয়েছে বড় বড় দুটো ক্যানূ আর একটা বালসা কাঠের ভেলা। স্থানীয় নাম ক্যালাপো।

পায়ারে কাজ করছে কয়েকজন ইনডিয়ান। বিমানের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

'এ রকম জায়গায় থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা একজন আমেরিকান,' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'আশ্চর্য!'

'এর চেয়ে খারাপ জায়গায়ও অনেক আমেরিকানের দেখা পাবে তুমি,' কিশোর বলল। 'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'ঘরে নিশ্চয় পোকামাকড়ের আড্ডা!'

'না থাকলেই বরং অবাক হব। শুধু কি পোকামাকড়, আমার তো ধারণা বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুরও অভাব হবে না।'

'হোটেল বোধহয় এতটা খারাপ নয়,' আশা করল ওমর। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'জঙ্গলের মধ্যে হলেও শহর তো। তা ছাড়া টুরিস্ট আসে শুনেছি। অতটা খারাপ কি আর বানাবে?'

রবিন বলল, 'সোজা শহরে চলে গেলেই পারি?'

'প্লেন নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। দেখলেই লোকে তাকাবে। নজরে যতটা কম পড়া যায় ততই ভাল। রাখারও একটা সমস্যা আছে। হোটেলের কাছাকাছি যদি জায়গা না পাই?'

'এখানে অবশ্য প্রচুর জায়গা,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'প্লেন তো রাখা যাবেই, পাহারা দেয়ার লোকেরও অভাব হবে না। বুমার এখন রাখতে

দিলেই হয়।'

'না দেয়ার তো কোন কারণ দেখি না। প্লেনটা শুধু রাখব, আমরা থাকব না। শহরে চলে যাব।'

'যাব কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।

'হাঁটা ছাড়া গতি নেই। ভাবছি, এই বৃষ্টির মধ্যে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটা যাবে তো?'

'ধরা যাক গেল না, তখন?'

'বুমারের সাহায্য নিতে হবে। অত চিন্তা করছ কেন? তাঁর সাহায্য নিতে তো বলাই হয়েছে আমাদের।'

পায়ারের খালি দিকটায় বিমান নিয়ে গেল মুসা। লাফ দিয়ে নেমে গেল ওমর। দড়ি দিয়ে পায়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বিমানের ডানা। তারপর লেজ।

এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে মুসাও নেমে গেল। তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এলেন লম্বা, হালকা-পাতলা এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক।

'মিস্টার সেজউইক বুমার?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'হ্যাঁ।'

পুকিতোর মত অতটা না হলেও বুমারও নোংরা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা ভাল না। পরিবেশটাই বোধহয় নোংরা থাকার, কিংবা পরিষ্কার থেকে লাভ নেই জেনে অহেতুক কষ্ট করতে চায় না এখানে যারা বাস করে। বুমারের বয়স অনুমান করা কঠিন। অনেক হিসেব-নিকেশ করে ওমরের মনে হলো, চল্লিশ হতে পারে। এতটাই রোগাটে, দেখে মনে হয় সদ্য জণ্ডিস কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছেন। গায়ে মাংস বলতে গেলে নেই, হাড়ের ওপর চামড়াটা কোনমতে লেগে আছে। লম্বাটে মুখ। ঠেলে বেরোনো চোয়াল। বিশাল কপাল। নীল চোখ। লালচে অগোছাল চুল।

কঙ্কালের মত শীর্ণ একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'ওয়েলকাম টু অর্কিড ভিলা। আপনি নিশ্চয় ওমর শরীফ। আর এরা আপনার অ্যাসিসটেন্ট—কিশোর পাশা, মুসা আমান, রবিন মিলফোর্ড। অবাক হচ্ছেন তো, নাম কি ভাবে জানলাম? আপনাদের আসার খবর আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'না,' হেসে জবাব দিল ওমর, 'ম্যানিকোরে পৌঁছেছি খুব সহজেই। ওখান থেকে লোকাল এয়ার সার্ভিসের রুট ব্যবহার করে পোর্ট ভেলহোতে পৌঁছলাম। আপনাদের অঞ্চলে ঢুকে নদীর প্যাঁচ দেখে অবশ্য মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। একটার সঙ্গে আরেকটা যে ভাবে পেঁচিয়েছে! কোনটা যে আসল আর কোনটা তার শাখা মাঝে মাঝেই গুলিয়ে ফেলছিলাম। তবে আপনার বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। বার দুয়েক নেমে জিজ্ঞেস করেই পেয়ে গেছি।'

'গুড। পেয়েছেন যে সেটাই হলো আসল কথা। নিশ্চয় গোসল আর কাপড়-চোপড় বদলানো দরকার। চলে আসুন। মালপত্র আনার লোক আছে।'

'প্লেনটা এখানেই থাকবে?'

'থাকুক না। কোন অসুবিধে নেই। পাহারা দিতে বলে দেব।'

দুই

বুমারের পিছু পিছু বাড়ির দিকে এগোল সবাই। কাছে যেতে বাড়ির সামনে কাঠের বেড়ায় পেরেক দিয়ে গাঁথা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল:

অর্কিড ভিলা

সেঁজউইক বুমার

মলিন হয়ে এসেছে লেখাগুলো। এটা যে অর্কিড ভিলা, সেটা বোঝানোর জন্যে যেন বোর্ডের ঠিক নিচে দড়ি দিয়ে একটা বিরাট টব ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে একটা গাছ। অপূর্ব সুন্দর একটা নীল ফুল ফুটে আছে।

ওমরকে সেদিকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন বুমার, 'জানেন ওটা কি ফুল?'

'নিশ্চয় অর্কিড।'

'অর্কিড তো বটেই। তবে বনেবাদাড়ে পাবেন না। আপনাআপনি জন্মায় না। মিশ্র প্রজাতি। বীজ থেকে আমি জন্মিয়েছি। আমার জন্মানো ওরকম আরও কয়েকটা প্রজাতি দেখতে পাবেন এখানে।'

একটা আঙিনা ধরে চলেছে ওরা এখন। বাতাসে রাসায়নিক পদার্থের কড়া গন্ধ। কয়েকজন ইনডিয়ান, নিগ্রো আর মিশ্র রক্তের লোক কাজ করছে। অর্কিডের বাল্ব ছিঁড়ে নিয়ে নিয়ে ফেলছে একটা বিশাল চৌবাচ্চার পানিতে। সুন্দর ফুলগুলো ছুঁড়ে ফেলছে কাদায়। রপ্তানীর জন্যে বাল্বটা শুধু দরকার, ফুল নয়, ওগুলো বাতিল। গোটা ব্যাপার তদারকি করছে একজন নিগ্রো।

'সরি, এই আবর্জনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে হলো,' বুমার বললেন, 'গন্ধ অসহ্য লাগছে?'

প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'বন থেকে ফুল তুলে আনেন না আপনি?'

'আগে আনতাম। এখন যাই না। তবে যদি খবর পাই এমন কোন গাছের দেখা পাওয়া গেছে যেটা তুলে আনতে পাকা হাত দরকার, তাহলে যেতে হয়। বয়েস হয়েছে তো, আগের মত আর বনে বনে ঘুরতে পারি না। গাছের মগডাল থেকে অর্কিড পেড়ে আনতে টারজান হওয়া দরকার। অর্কিডের দাম বাড়ে তার দুষ্প্রাপ্যতার ওপর। তাই নিজে জন্মাই, যেটা আরও দুর্লভ। বন থেকে তুলে আনার চেয়ে কাজটা কম কঠিন ভেব না। অর্কিডের পেছনে খাটনি আছে, বন থেকে তুলে আনা হলেও। আনার কষ্ট তো আছেই,

তারপরেও প্রচুর ঝামেলা। হাজার রকমের পোকামাকড় ঢুকে বসে থাকে এর মধ্যে, মারাত্মক বিষাক্ত সাপ আর টারানটুলার মত ভয়াবহ মাকড়সা বাসা বাঁধে। রপ্তানী করার আগে কেমিক্যাল আর বিষ দিয়ে সেগুলোকে মেরে সাফ করতে হয়। মারাত্মক পেস্ট ছড়ানোর ভয়ে অর্কিড আমদানীই নিষিদ্ধ অনেক দেশে।'

'চৌবাচ্চার পানিতে ফেলে কি পোকামাকড় পরিষ্কার করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বিষ মেশানো আছে পানিতে।'

'তাতে বাল্ব নষ্ট হয় না?'

'না।'

'আচ্ছা, বাল্বই বা রপ্তানী করতে হবে কেন? বীজ নিয়ে গিয়ে হটহাউসে জন্মানো যায় না?'

'যায়, তবে ভাল হয় না। রঙ নষ্ট হয়, সুগন্ধ কমে যায় কিংবা একেবারেই থাকে না। এই দুটো না থাকলে আর অর্কিডের কি দরকার? কদরই তো হলো এর সৌন্দর্যের। সেজন্যে বন থেকে তুলে আনা বাল্বের চাহিদা অনেক বেশি।'

'এই অস্বাভাবিক ব্যবসায় এলেন কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

হাসলেন বুমার। 'মানুষের কত রকম হবি থাকে। কেউ জমায় ডাকটিকেট, কেউ জীবাশ্ম, কেউ বা আবার দেশলাইয়ের কাঠির মত অতি সাধারণ জিনিস। আমি জমাই অর্কিড। আর সেটা জমাতে হলে অর্কিডের জন্মস্থানের চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় আছে, বলো? অর্কিড আমার নেশা। দেশে থেকে এই হবি পূরণ করতে গেলে অনেক খরচ, আমার মত লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবই হত না। এখানে আসাতে হবিও পূরণ হচ্ছে, ব্যবসাও করতে পারছি—নিজেকে তো ভাগ্যবান মনে করি আমি। বহুবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া যখন শেষ করলাম, দুনিয়া ঘুরে দেখার জন্যে বাবা কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তখনকার বার্মা, আজকের মিয়ানমারে গিয়ে প্রথম অর্কিড দেখলাম আমি। মনেপ্রাণে আমি একজন নেচারালিস্ট। ওই নীল ফুলটা দেখে মনে হলো এত সুন্দর জিনিস আর জীবনে দেখিনি। যাই হোক, পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে আমি বাড়ি ফেরার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। ততদিনে অর্কিড জন্মানোর নেশায় পেয়ে বসেছে আমাকে। আবিষ্কার করলাম, হটহাউসে ফুল ভাল হয় না। একদিন এক অ্যাক্সিডেন্টে হটহাউসটা নষ্ট হয়ে গেল। ভাবলাম, মেরামতের পেছনে আর টাকা খরচ না করে বরং আমাজনেই চলে যাই, যেখানে অর্কিড জন্মানোর জন্যে কৃত্রিম উত্তাপের দরকার হবে না।'

লিভিং রুমে ওদের নিয়ে এলেন বুমার। লম্বা একটা ঘর। বাঁশের তৈরি অতি সাধারণ কিন্তু আরামদায়ক আসবাব দিয়ে সাজানো। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা কয়েকটা ধাতব কেবিনেট। কাঁচের সুরক্ষিত বাক্সে ভরে রাখা হয়েছে ঝলমলে রঙের নানা রকম পাখি আর প্রজাপতির স্টাফ করা দেহ।

'কি খেতে চান?' ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন বুমার। 'হুইস্কি? জিন? নাকি

কোমল কিছু?'

'ওই যে টেবিলে লাইম জুস দেখতে পাচ্ছি,' হাত তুলে দেখাল ওমর। 'ওটা হলেই চলবে। গন্ধ কিসের?'

'খারাপ লাগছে? সরি, কিছু করার নেই। ওষুধের গন্ধ। এটা বাদ দিতে হলে পোকামাকড়ের কামড় খেতে হবে। ভারবেন না, খুব তাড়াতাড়িই সহ্য হয়ে যাবে।'

ওমরকে লাইম জুস আর তিন গোয়েন্দাকে আনারসের রস ঢেলে দিলেন বুমার।

'একাই থাকেন নাকি এখানে?' জানতে চাইল ওমর।

'একা কোথায়, চাকর-বাকর আছে। বেশির ভাগই ইনডিয়ান। বাবুর্চিটা ফিরিঙ্গি, বাবা ফরাসী মা ইনডিয়ান। ভাল রান্না করে। বাড়িঘর দেখাশোনা, শ্রমিকদের কাজের তদারকি সব করে একজন নিগ্রো।'

'বাড়ি যেতে কখনও ইচ্ছে করে না আপনার?' জিজ্ঞেস করল রবিন। বুমারের কথা শুনতে ভাল লাগছে তার।

'না। বাড়ি শুধু একটা অতীত স্মৃতি। এখানে এত বেশিদিন আছি আমি, জীবনের ধারাটাই পাল্টে গেছে। তাতে অখুশি নই। এ জীবনই আমার পছন্দ। যেটা পছন্দ সেটা বদলাতেই বা যাব কেন? সভ্য পৃথিবী বলতে যা বোঝায় সেই সব দুর্ভাবনা, ঝামেলা, যন্ত্রণার কোনটাই নেই এখানে, বড় আরামে আছি। কাজকর্ম ঘাড়ের ওপর চেপে থাকে না। আজ যেটা করতে পারলাম না, ঠিক আছে, কাল করব, কাল না পারলে পরশু, না পারলে পরের হপ্তায়, পরের মাসে কিংবা পরের বছর। একেবারে না পারলেও কোন অসুবিধে নেই, মস্ত কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। জঙ্গল মানুষকে হয় খুন করে, নয়তো গোলাম বানায়। আমাকে গোলাম বানিয়েছে। আমি এখন আমাজন ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না।'

হাসল ওমর, 'বুঝলাম। গোলাম হয়ে মনিবের কাছ থেকে পাচ্ছেনও নিশ্চয় অনেক কিছু?'

'সে তো বটেই। নাহলে কি আছি?'

'তা কতবড় আপনার এই মনিবটি?'

'আমাজনের মুখ থেকে শুরু করে পেরুর ইকুইটো পর্যন্ত তিন হাজার মাইল নদীর দুতীরেই গভীর জঙ্গল। আন্দাজ করুন এখন, কত বড়? ভাববেন না বিদেশী শুধু আমিই আছি এখানে। পৃথিবীর অনেক দেশের লোক, এমনকি নাকউঁচু ফরাসী আর ইংরেজও আছে অনেক। জায়গাটা বাস্তুহারা, ভাগ্যান্বেষী আর অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। বুনো জানোয়ারের সঙ্গে মিলে মিশে নিশ্চিন্তে, বেশ আরামেই আছে এরা। টাকা কামানোর ধান্দায় এদের অনেকেই খুঁজে বেড়ায় সোনা-রূপা আর পান্নার খনি। সফল প্রায় কেউই হয় না। কেউ কেউ কিছুই না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে, দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সঙ্গে করে আনা টাকাপয়সা সব তখন শেষ, ভাড়ার টাকাটাও আর জোগাড় করতে পারে না। বাধ্য হয়ে পড়ে থাকতে হয়, দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখে কেবল;

যেতে আর পারে না।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন প্রকৃতি প্রেমিক। 'অনেক বকবক করলাম। এখন বলুন, কি কারণে এই অধমের এখানে আগমন? আমেরিকা থেকে আমার এজেন্ট জানিয়েছে, আপনারা আসছেন; কেন আসছেন, স্পষ্ট করেনি।'

অহেতুক কাশি দিল ওমর, যেন গলা পরিষ্কারের চেষ্টা। 'আমেরিকায় একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছি আমরা এই চারজন—ওকিমুরো করপোরেশন। আমাদের মূল ব্যবসা পুরানো বাতিল বিমান কিনে মেরামত করে বেশি দামে বিক্রি করা। আরও একটা ব্যবসা আছে, জন্তু-জানোয়ার ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় বিক্রি। এ ছাড়া টাকা রোজগারের জন্যে আরও নানা রকম ধান্দা করছি আমরা। এখানে আসাটা সেই ধান্দারই একটা অংশ।'

বুমার বুঝলেন, কাজটা কি সেটা তাঁকে বলতে চাইছে না ওমর। 'তারমানে অর্কিড-সংক্রান্ত নয়?'

'না। যদিও অর্কিড-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশেই আসতে হয়েছে আমাদের। আপনার ওপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে আমাদের তার কারণ এখানে আপনি বহুদিন ধরে আছেন, সম্মানিত লোক, নিশ্চয় স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার জানাশোনা ওঠাবসা আছে। প্রয়োজনে আমাদের সহায়তা করতে পারবেন।'

'খুশি হয়েই করব। কি সহায়তা চান?'

'আমাদের প্রথম কাজ ছিল আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। হয়েছি। এখন যেতে হবে ক্রুজোয়াড়োতে। ওঠার জন্যে একটা হোটেলের নামও দেয়া হয়েছে আমাদের—ভ্যালদেজ হোটেল। ওটা নাকি ওখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেল।'

'তা বলেছে ঠিকই। ক্রুজুয়াড়োতে থাকার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর পাবেন না। নামকাওয়াস্তে হোটেল, আসলে ওটা একটা পোসাদা, অর্থাৎ সরাইখানা। মালিক আমাকে ভালমত চেনে। হোটেলটা চলে স্থানীয়দের নিয়ে, বিদেশী প্রায় আসে না। তবে গত হপ্তায় গিয়ে অনেকদিন পর একজন আমেরিকানকে দেখে এলাম।'

'টুরিস্ট?' তীক্ষ্ণ হলো ওমরের দৃষ্টি।

'হবে হয়তো। এখানকার লোকের কৌতূহল কম। নিজে থেকে কেউ কিছু না বললে অহেতুক নাক গলাতে যায় না। লোকটা সাধারণ টুরিস্ট, না কোন কাজে এসেছে; জানা যায়নি।'

'ও। ক্রুজোয়াড়ো জায়গাটা কেমন?'

'আহামরি কিছু নয়। তবে জঙ্গলের মধ্যে এর বেশি কিছু আশা করাটাও বোকামি।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন বুমার, 'আরও রস ঢেলে নাও না জগ থেকে।'

মুসা ছাড়া আর কেউ নিল না।

'অনেক খেয়েছি,' কিশোর বলল। 'আপনি বলুন, শুনতে ভাল লাগছে। ক্রুজোয়াড়োতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন?'

'এ রকম একটা জায়গায় যেমনটি হবার কথা,' জবাব দিলেন বুমার। 'থানার দায়িত্বে আছে একজন অফিসার, ইনতেনদেন্তে। আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে হিমশিম খায়। চেষ্টার ত্রুটি করে না। এমন বুনো জায়গায় জনবল তার একেবারেই কম। তবে আমি যখন প্রথম এসেছি, তার চেয়ে অবস্থা এখন অনেক ভাল। তারপরেও এখানে নিজের দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। স্থানীয় লোকজন, দোকানদার আর ব্যবসায়ীরা ঠিক আছে। তাদের ওখানে যারা কাজ করে—ইনডিয়ান, নিগ্রো আর ফিরিঙ্গিদেরও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ঝামেলা পাকায় হলো ল্যানারোরা, এখানকার কাউবয়। বনের বাইরে বড় বড় মাঠ আছে, ওখানে গরুর খামার। হপ্তাশেষে ছুটির দিনে ওসব খামার থেকে আমোদ-ফুর্তি করতে আসে ওরা। বিয়ার কিংবা স্থানীয় মদ আগুয়ারদিয়েন্তে খেয়ে মাতলামি করে। ওদের জায়গা দেয়ার জন্যে অনেক বার আর ড্যান্স হল আছে। আনন্দ দেয়ার জন্যে সিনেমা হলও আছে। আধুনিক সভ্যতার যতসব ছাগলামি-পাগলামি দেখানো হয় সেই হলে।'

'সিনেমা হলও তাহলে আছে?'

'খবরদার, ওটার ধারেকাছে যেয়ো না। প্রায়ই ছবির শেষটা আর দেখার উপায় থাকে না। মারামারি বাধে হলের মধ্যে, বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। তারপর শুরু হয় গোলাগুলি, ছুরি মারামারি। যে যাকে পারে পেটায়, কেউ কেয়ার করে না। কাছাকাছি কোন পুলিশম্যান যদি পাহারা থাকেও, তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখে। সোমবার সকালে মোটামুটি শান্ত হয়ে যায় শহর, আগের রাতের কালিমা সব ঘুম দিয়ে মুছে ফেলতে চায় যেন।'

'উইকএন্ডে কি আপনি শহরে যান?'

'উইকএন্ড তো দূরের কথা, সোমবারেও যাই না। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া, একেবারে ঠেকে না গেলে আমি শহরেই যাই না।'

'ওরকম নরকে কে আর যেতে চায়;' পর পর তিন গ্লাস আনারসের রস খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলল মুসা। আলাপে যোগ দিল।

'ওখানে সব কিছুই সস্তা,' বলতে থাকলেন বুমার। 'নইলে ব্যবসা চলবে না। লোকের ক্রয়ক্ষমতা খুব কম। ঘরবাড়ি অতি সাধারণ। কাদা আর কুপিয়ে কাটা ঘাসের কুচি মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে দেয়াল বানানো হয়। দেয়ালের মাঝে মাঝে ফোকর, ঘরে বাতাস চলাচলের জন্যে। কেউ কেউ আবার দেয়ালে সাদা চুনকাম করে দেয়। এই ঘরের নাম এখানে তাপিয়াল। প্রস্রাবখানা-পায়খানার ব্যবস্থা খুব করুণ।'

'এখান থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তা আছে নাকি?' জানতে চাইল ওমর।

'পায়েচলা বুনোপথ। ওই পথে এমনিতেই চলা দুষ্কর, বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। আজ রাতটা আর যাওয়ার ঝুঁকি নিতে যাবেন না, এখানেই থেকে যান। দেখুন কাল সকালে বৃষ্টি কমে কিনা। আপনাদের আমি ঘোড়া আর গাইড দিয়ে সাহায্য করতে পারব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সত্যি, আপনার দেখা না পেলে বিপদেই পড়ে যেতাম। নদীপথে যাওয়া যায় না? ম্যাপে তো দেখলাম শহরটা নদী

থেকে দূরে নয়।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে নদীপথে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতাম না। এই ঢলের রূপ তো দেখেননি, নদী ফুলেফেঁপে উঠলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কত রকম বিপদ যে আছে। প্লেনটাও খোয়াবেন, জানটাও। তার চেয়ে হেঁটেই যান, অনেক নিরাপদ। আপনার প্লেন নিয়ে ভাববেন না, ওটার দায়িত্ব আমার,' এক মুহূর্ত থেমে দম নিলেন বুমার। অনেক কথা হলো। আপনাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। চলুন, ডাইনিং রূমে। খাওয়ার পর যদি ইচ্ছে হয় তো আমার অর্কিডের বাগান দেখতে যাবেন। খুব দুষ্প্রাপ্য কিছু ফুল আছে আমার এখানে।'

'যেহেতু অর্কিড ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসেছি,' হেসে বলল ওমর, 'ও সম্পর্কে খানিকটা ধারণা থাকা দরকার। নইলে কোথায় কোন কথা বলতে গিয়ে ফেঁসে যাব কে জানে।'

'এখানকার নদী সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা থাকা উচিত, নইলে উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারেন। মারা পড়বেন তাহলে। প্রচুর বৃষ্টির পরে এখন নদীর যা অবস্থা, এ সময়ে জলপথে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করা একদম ঠিক না। ওই আমেরিকান লোকটা, যে ক্রুজোয়াড়োতে এসেছে বললাম, সে বুঝেছে ঠেলা কাকে বলে। প্রায় জোর করে একটা লাকড়ি বওয়ার ফেরি বোট ভাড়া করে ক্রুজোয়াড়ো যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। মরতে মরতে কোনমতে পুয়ের্তো ভেকুতে পৌঁছার পর কিছুতেই আর সামনে এগোতে রাজি হয়নি নৌকার মাঝিরা। এখান থেকে জায়গাটা বিশ মাইল ভাটিতে। বাকি পথ শেষে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে পার হয়েছে ওই লোক। সেজন্যেই বলছি, দুঃসাহস দেখানোর বোকামি করতে যাবেন না। বিপদ আরও আছে নদীতে। মারাত্মক পিরানহার কথা তো নিশ্চয় শুনেছেন। আরেকটা বিপজ্জনক প্রাণী আছে হুরারা নদীতে। তেমব্লাদোরেস।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'ওটা আবার কি? প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী নাকি? আজও টিকে আছে?'

হাসতে লাগলেন বুমার। 'নাম শুনে ওরকমই লাগে বটে, তাই না? ও হলো বান মাছ, বৈদ্যুতিক বান। ইলেকট্রিক শক দিয়ে ঘোড়াকে চিত করে ফেলতে পারে, মানুষের কি হবে বোঝো।'

'বুঝলাম,' নিরাশ হয়ে গেল মুসা, 'নদীতে সাঁতার কাটার আশা খতম। ভেবেছিলাম, বৃষ্টি কমলে একদিন চুটিয়ে সাঁতার কাটব, মাছ ধরব, তা আর হলো না।'

'সাঁতার কাটতে না পারলেও মাছ ধরায় কোন বাধা নেই। প্রচুর আছে। ফেললেই খায়। কেবল বড়শিতে পিরানহা আর বান মাছ উঠে এলে হাত দিয়ে না ধরলেই হলো।'

তিন

কিশোররা কেন এসেছে এই জঙ্গলে জানতে হলে পিছিয়ে আসতে হবে সাতটা দিন। রকি বীচ। রোদ ঝলমলে এক সুন্দর সকাল। তিন গোয়েন্দা আর ওমরকে খবর দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভিক্টর সাইমন।

'আরাম করে বসো,' বললেন তিনি। 'অনেক কথা আছে।'

চেয়ার টেনে বসল কিশোর। হাসল। 'কোনো তদন্তের কাজ দেবেন মনে হচ্ছে?'

'তদন্ত এবং অ্যাডভেঞ্চার।'

'অ্যাডভেঞ্চার? আগেই ভাবা উচিত ছিল, ওমরভাইকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলেছেন যখন।'

মিস্টার সাইমনও হাসলেন, 'কেন অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া আর কিছু পারে না নাকি ও?'

'পারবে না কেন? আমি সেকথা বলছি না। ওমরভাই মানেই তো প্লেন, আর প্লেন মানে দূরের পাল্লা।'

'তা ঠিক, এবারের পাল্লাটাও দূরেরই।' মুসার দিকে তাকালেন তিনি, 'কি খাবে?'

বিগলিত হাসি হাসল মুসা, 'যা খুশি দিতে বলুন কিমকে। আপনার ফোন পেয়ে ছুটে চলে এসেছি। সকালের নাস্তাটাও ঠিকমত করতে পারিনি।'

ভিয়েতনামী বাবুর্চি-কাম-হাউসকিপার নিসান জাং কিমকে ডাকলেন সাইমন। বললেন, 'ওদের খাবার দাও।'

হাত নাড়ল ওমর, 'আমার কিছু লাগবে না। আমি মুসার মত তাড়াহুড়া করিনি।'

'আরে কিছু তো খাও,' সাইমন বললেন।

'না, স্যার, আমি কিছু পারব না। ঠিক আছে, কিম, আমাকে একটা কোকই দাও।'

কিশোর আর রবিনও শুধু কোক চাইল।

মুসা তাকাল কিমের দিকে, 'কিম, ভাই, দোহাই লাগে তোমার, ভাল কিছু থাকলে দাও। দয়া করে ইঁদুর কিংবা চামচিকের সুপ আমাকে দিয়ে টেস্ট করাতে এনো না এখন, এই সাতসকালে গিলতে পারব না।'

মনে ব্যথা পেয়ে মুখ কালো করে ফেলল কিম, 'আমি শুধু আজেবাজে জিনিসই খাওয়াই তোমাদের, না?'

অনেকটা রাগ করেই বেরিয়ে চলে গেল সে। ফিরে এল ঠিক তিন মিনিটের মাথায়। তারমানে খাবার নিয়ে তৈরি হয়েই বসেছিল সে। বিশাল ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টেবিলে। প্লেটে করে যা এনেছে, দেখে হাঁ হয়ে গেল তিন

গোয়েন্দার মুখ। এগারো রকমের কেক। পৃথিবীর এগারোটি দেশের মানুষ যেমন করে বানায়। গত তিন দিনে এগুলো বানানো শিখেছে সে। বসে বসে বানিয়েছে আর জমিয়েছে। খাওয়ানোর লোক পাচ্ছিল না। আজ পেয়েছে সুযোগ।

কিশোর আর রবিন দুই হাত তুলে 'না না' করেও নিস্তার পেল না। সবগুলো কেক থেকে খুব ছোট ছোট এগারোটা করে টুকরো চেখে দেখতেই হলো। ভয়ে ওমর গিয়ে বসে রইল বাথরুমে। অনেক দেরি করে বেরোল যাতে কিম ট্রে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কিমের ধৈর্যের কোন শেষ নেই। দাঁড়িয়েই আছে। এমন অনুরোধ শুরু করল, কি আর করে বেচারা ওমর!

মুসা কি পরিমাণ খেল, সেটা আর বলার প্রয়োজন নেই। একটা কথা বললেই অনুমান করা যাবে, চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে পারল না সে, গিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ল কোণের ইজিচেয়ারে।

মুসার কথায় মনে যে দুঃখ পেয়েছিল কিম, সেটার আর চিহ্নমাত্র রইল না তার চেহারায়। সন্তুষ্ট হয়ে হাসিমুখে শূন্য ট্রে আর গ্লাস-প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল। বেরোনোর আগে বলে গেল দুপুরে না খেয়ে যাওয়া চলবে না।

প্রমাদ গুনল রবিন আর কিশোর। শুরুতে কেক খাইয়ে ওদের বিশ্বাস অর্জন করেছে কিম, দুপুরে হয়তো কুকুরের মাংসের কাবাব এনে হাজির করবে। বলা যায় না। ভিয়েতনামী আর কোরিয়ানরা তো কুকুর খাওয়ার যম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, যত ভাল রান্নাই করুক, কোনও ধরনের মাংসের দিকে হাত বাড়াবে না আজ। শাক-সব্জি হলে খাবে, নইলে বাদ।

ওমরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন সাইমন, 'ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারো।'

'না, ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। কম খাই।'

'খুব ভাল। যে জিনিসে কোন উপকার নেই, শুধু ক্ষতি, সেটাকে আঁকড়ে ধরে রেখে লাভ কি? যাকগে, এবার শোনো, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলুন?'

'একজন ব্ল্যাকমেলারকে খুঁজে বের করে দিতে হবে।'

'কি নাম?'

'পল ভ্যালেন্তি।'

'তার জন্যে প্লেনের কি দরকার?'

'আছে। গোড়া থেকেই বলি। চুয়াল্লিশ বছর আগে পেরুর লিমাতে জন্মগ্রহণ করেছিল পল ভ্যালেন্তি। বাবা দূতাবাসে চাকরি করত। এ দেশ সেদেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমেরিকায় এসে হাজির হলো। ভ্যালেন্তির বয়েস তখন বারো। কয়েক বছর পর বদলি হয়ে আমেরিকা থেকে রুমানিয়ায় চলে গেল ওর বাবা, কিন্তু ছেলেকে আমেরিকাতেই রেখে গেল লেখাপড়া করার জন্যে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ভ্যালেন্তি। খুব ভালমত পাসটাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হলো। তারপর গবেষণায় সুবিধে হবে বলে চাকরি

নিল একটা বড় ওষুধ কোম্পানিতে। রেমন অ্যাণ্ড রেমন।'
'আরিব্বাবা!' ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন, 'ও তো বিশাল কোম্পানি!'
মাথা ঝাঁকালেন সাইমন, 'হ্যাঁ। ওটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার একজন বন্ধু, নাম বিলিয়ার্ড রেমন। সে-ই এসে আমাকে জানিয়েছে সব। যাই হোক, ভাল কাজের জন্যে প্রমোশন পেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল ভ্যালেন্তি। কর্তাব্যক্তিরা তার ওপর খুশি। কিন্তু ওর মনে হতে থাকল, ওকে তারা ঠকাচ্ছে। বেশি বেতন চাইল। সর্বোচ্চ বেতন দেয়া হচ্ছে তখন তাকে। তক্ষুণি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। "ওসব বুঝিটুঝি না, বেতন চাই!" ভ্যালেন্তিও চাপাচাপি শুরু করল। এক পর্যায়ে রাগ করে চাকরি দিল ছেড়ে। এবং তারপর উধাও। একজন ভাল কাজের লোককে হারিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না কোম্পানির। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। দিন চারেক আগে বিলিয়ার্ডের কাছে একটা চিঠি এসেছে। পল ভ্যালেন্তি লিখেছে। জানিয়েছে, তার কাছে গোটা তিনেক ওষুধের ফর্মুলা আছে, যেগুলো রেমন কোম্পানির ইদানীংকার আবিষ্কার। ক্যান্সারের ওষুধ। যাওয়ার সময় চুরি করে নিয়ে গেছে সে। ল্যাবরেটরি চীফ সে-ই ছিল বলে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে। মাত্র একমাস আগের ঘটনা, তাই ওগুলোর খোঁজও পড়েনি, খোয়া যে গেছে সেটাও জানা যায়নি। চিঠি পেয়ে টনক নড়ল। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! পাওয়া গেল না ওগুলো। বোঝা গেল, মিথ্যে কথা লেখেনি ভ্যালেন্তি।'
'কি চায় ও?' জানতে চাইল ওমর।
'টাকা।'
'কত?'
'বিশ লাখ ডলার।'
শিস দিয়ে উঠল ওমর, 'এত!'
'ফর্মুলাগুলোর দাম আরও অনেক বেশি। ইচ্ছে করলে এর দশগুণ দামে অন্য কোম্পানির কাছে বেচে দিতে পারে ভ্যালেন্তি। সেই হুমকিই দিয়েছে।'
'টাকাটা তাহলে দিয়ে দিলেই পারে রেমন কোম্পানি?'
'তা পারে। দিতে ওদের আপত্তিও নেই। কিন্তু ব্ল্যাকমেলারকে বিশ্বাস কি? যদি টাকা পাওয়ার পরেও ফর্মুলা ফেরত না দেয়? মোচড় দিয়ে আরও টাকা চায়? ব্ল্যাকমেলাররা সাধারণত যা করে।'
'হুঁ, বুঝলাম। টাকা না দিলেও সমস্যা—অন্য কোম্পানির কাছে বেচে দেবে ভ্যালেন্তি। পুলিশের কাছে যায় না কেন রেমন?'
'গেলে খুব একটা লাভ হবে না। বরং ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে। অন্য কোম্পানির চর পিছু লাগবে তখন ভ্যালেন্তির। টাকা দিয়ে কিংবা খুন করে যেভাবেই হোক ওই ফর্মুলা হাতানোর চেষ্টা করবে। তাতে ক্ষতিটা যা হবার হবে রেমন কোম্পানির। তাই ওরা চায় গোপনে গোপনে লোকটাকে খুঁজে বের করে তার কাছ থেকে কাগজগুলো আদায় করে আনতে।'
'তারমানে আমাদেরই চেষ্টা করে দেখতে হবে?'

'যদি তোমাদের কোন অসুবিধে না থাকে। আমাকেই ধরেছিল রেমন, কিন্তু আমার সময় নেই। অগত্যা বলল, আমার পরিচিত বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে করিয়ে দিতে।'

কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে সাইমনের দিকে ফিরল ওমর, 'সঙ্গে করে টাকা নিয়ে যেতে হবে নাকি আমাদের? ভ্যালেন্তি টাকাটা নিতে এলেই ধরব খপ করে?'

মাথা নাড়লেন সাইমন, 'না। অত বোকা সে নয়। মনে রেখো, সাধারণ ক্রিমিনালের সঙ্গে ডিল করছি না আমরা। অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান একজন বিজ্ঞানী ভ্যালেন্তি। আমেরিকা থেকে বেরিয়ে সোজা ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল সে। সেখানে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে রেখে গেছে। টাকাটা সেখানে জমা দিতে হবে। জমা দেয়ার মাসখানেক পরে ডাকে পাঠাবে ফর্মুলাগুলো। এক মাস সময় নেয়ার কারণ কি জানো? লন্ডনের ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে সরিয়ে ফেলবে অন্য কোন দেশের ব্যাংকে, সুইজারল্যান্ডেও নিয়ে যেতে পারে। তাকে ধরার কোন উপায়ই থাকবে না আর।'

'ভীষণ চালাক তো!'

'হ্যাঁ। পনেরো দিন সময় দিয়েছে আমাদের। এর মধ্যে একটা বিশেষ ঠিকানায় চিঠি লিখে কোম্পানির তাকে জানাতে হবে, টাকা দিতে রাজি আছে কিনা। পনেরো দিনের বেশি একটা দিন সে অপেক্ষা করবে না। অন্য কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'ঠিকানাটা কি?'

'ক্রুজোয়াড়োর একটা পোস্ট অফিসের নম্বর। চিঠিটা সেখান থেকে জোগাড় করে নেবে সে।'

'ক্রুজোয়াড়ো?' ইজিচেয়ারে খানিকটা সোজা হলো মুসা, 'জিন্দেগীতেও এই নাম শুনিনি।'

ওমর আর অন্য দুই গোয়েন্দারও শূন্য দৃষ্টি। ওরাও শোনেনি।

হাসলেন ডিটেকটিভ, 'আমিও শুনিনি আগে। এবার শুনলাম। ক্রুজোয়াড়ো পেরুর একটা ছোট্ট শহর। লোকসংখ্যা তিন হাজার। অ্যান্ডিজ পর্বতমালার পুবধারে পেরু, ব্রাজিল আর বলিভিয়ার সীমানা যেখানে এক হয়েছে, সেখানে রিও হুরারা নামে একটা নদীর তীরে শহরটা। নদীটা রিও ম্যাদিরা নদীর একটা শাখা। রিও ম্যাদিরা আবার আমাজনের শাখা। আমাজনের যেখান থেকে বেরিয়েছে রিও ম্যাদিরা, তার কাছেই ম্যানাও নামে একটা বন্দর আছে, সাগর থেকে হাজার মাইল দূরে।'

'বন্দরটা চিনি,' কিশোর বলল। 'আমাজন থেকে জন্তু-জানোয়ার ধরে আনার সময় সেবার এই বন্দরেই স্টীমারে উঠেছিলাম।'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন।

অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল ওমর, 'জঙ্গলের এত গভীরে ঢুকে যাওয়ার কি কারণ ওর?'

শুকনো হাসি হাসলেন সাইমন, 'সহজ। পেরু ওর জন্মস্থান। নিশ্চয়

ক্রুজোয়াড়োতেও গিয়েছিল। চেনা জায়গা হলে থাকতে সুবিধে। জঙ্গলের মধ্যে বলে ওখান থেকে ওকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ। তবে যাওয়ার আসল কারণ আমি যেটা সন্দেহ করছি তা হলো, ক্রুজোয়াড়োতে ও ধাওয়া খেলেই পালিয়ে চলে যাবে বলিভিয়া কিংবা ব্রাজিলে। নদীটা পেরোলেই হলো, ঢুকে যাবে অন্য দেশের সীমানায়। তাকে তখন ধরতে হলে আবার নতুন করে খোঁজা শুরু করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'হুঁম্। পনেরো দিনে তো অসম্ভব। তৈরি হয়ে আমাদের ক্রুজোয়াড়োতে পৌঁছতেই সাত-আটদিন লেগে যাবে। তাহলে আমাদের মিশনটা হলো—ভ্যালেন্তিকে খুঁজে বের করে ধরে আনতে হবে?'

'না, ওকে আমাদের দরকার নেই। অহেতুক ঝামেলা। ফর্মুলাগুলো কেবল উদ্ধার করে আনতে পারলেই হলো।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'কি বলো? যাবে?'

'আমার আপত্তি নেই। হাতে সময় আছে।'

'রবিন?'

'কিশোর যা বলে তাই।'

মুসাকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, নিজে থেকেই বলল, 'সবাই চলে যাবে, আমি একা একা রকি বীচে থেকে পচে মরব নাকি?'

হাসল রবিন, 'ওখানে গিয়ে বুঝি পচো?'

'মনে হয় না। দুই-দুইবার গিয়েছি আমরা আমাজনে, না না তিনবার; আরেকবার গেলে অসুবিধে নেই।'

সাইমন বললেন, 'গুড। তোমাদের খরচাপাতি সব রেমন কোম্পানি দেবে। পারিশ্রমিকও ভালই দেবে। তোমাদের কিছু বলা লাগবে না। আমিই ব্যবস্থা করে দেব সব।'

'ঠিক আছে। তা এ ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আছে, কিভাবে করব কাজটা?'

'তার আগে বরং আরেকটা কথা বলে নিই। ফর্মুলা চুরির কথা রেমন কোম্পানি যতই চেপেচুপে রাখুক, ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওগুলো আদায় করে আনতে লোক পাঠাতে পারে অন্য কোম্পানি। সেই লোক হয়তো টাকার জন্যে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'পারছি। আমাদের প্রতিপক্ষ ভেবে খুন করবে।'

'কিংবা ভ্যালেন্তিকে। খুন করে ফর্মুলাগুলো নিয়ে চলে আসবে।'

'ওগুলো তার সঙ্গেই আছে, বলেছে নাকি সে?'

'বলেনি। তবে আমার ধারণা, হাতের কাছেই রেখেছে। কখন কোথায় পালিয়ে যাওয়া লাগে তার ঠিক নেই। যে জিনিস নিয়ে কারবার, সেটা কাছছাড়া করবে না সে। ফর্মুলা খুঁজতে গিয়ে আর যাই করো, খুনখারাপিতে জড়িয়ো না। দক্ষিণ আমেরিকান জেল বড় সাংঘাতিক জায়গা।'

'জানি আমি,' ওমর বলল, 'আর কিছু?'

ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে এনে দিলেন সাইমন। 'এর মধ্যে ভ্যালেন্তির একটা ছবি আছে। দেখে নিয়ো। সুবিধে হবে।'

তখুনি খাম থেকে ছবিটা বের করল কিশোর। রবিন আর ওমর কাত হলো ওর দিকে। ইজিচেয়ার থেকে উঠে এল মুসা।

পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ভ্যালেন্তির চুল কালো, চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরোনো, ডাকাত-ডাকাত চেহারা। বিজ্ঞানী বলে মনেই হয় না।

'ক্রুজোয়াড়োতে গিয়ে কোথায় উঠব আমরা?' জানতে চাইল ওমর।

'হোটেলে। তবে সরাসরি হোটেলে না গিয়ে প্রথমে আরেকটা জায়গায় যাবে। সেজউইক বুমার নামে এক আমেরিকান নেচারালিস্ট আছেন ওখানে। অর্কিড পাগল। তাঁর মূল ব্যবসা অর্কিড। আমেরিকায় তিনটে কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে মাল কেনে। ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর নানা রকম জন্তু-জানোয়ার কিনে নিয়ে ফুল ব্যবসায়ী, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানাকে সাপ্লাই দেয়। ওসব জিনিস বাক্স কিংবা খাঁচায় ভরে ম্যানাওতে পাঠিয়ে দেন বুমার। সেখান থেকে তুলে নেয় স্টীমশিপ সার্ভিসের জাহাজ। আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে।'

'আমরা কি ওদের জাহাজে করেই যাব?'

'না। তোমরা যাবে প্লেনে করে। যে ধরনের প্লেন দরকার, ভাড়া করে নিয়ে যাবে। ওরকম প্লেন তোমাদের কাছে থাকলে, আর সুবিধেজনক দাম হলে সেটা কিনেও নিতে পারে রেমন কোম্পানি। কি করবে সেটা তোমরাই ভাল বুঝবে।'

'বুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি বলব?'

'এখানকার এজেন্টের মাধ্যমে তোমাদের যাওয়ার খবর আগেই তাঁকে জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। বলা হবে, বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা। আমাজনের ফুল আর জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে আগ্রহী। অবিশ্বাস করবে না কেউ। জন্তু-জানোয়ার ধরার ব্যবসা আছে কিশোরের চাচা আর মুসার বাবার। আগেও গিয়েছে ওরা ওদেশে।'

'আমি যাইনি ওদের সঙ্গে।'

'তাতে কি? এবার যাবে। পাইলট লাগবে না ওদের? প্লেন চালাবে কে?'

মৃদু হাসল ওমর, 'বুঝলাম। ছদ্মবেশে যেতে হবে আমাদের। যাতে ভ্যালেন্তি বা অন্য কোম্পানির চর কিছু সন্দেহ করতে না পারে। একটা কথা নিশ্চয় ভেবেছেন, ভ্যালেন্তিও ছদ্মবেশে থাকতে পারে? তাহলে ছবির সঙ্গে হয়তো চেহারার মিল পাব না। এমন কোন অভ্যাস আছে তার, যেটা দেখে তখন চিনতে পারব?'

আঙুল তুললেন সাইমন, 'ও চেইন স্মোকার। তামাকের বাক্স, কাগজ, সবই সঙ্গে থাকে; নিজে হাতে বানিয়ে খায়। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে সারাক্ষণই কাশে। বাঁ হাতের মধ্যমায় একটা সোনার আঙটি পরে। তবে এটার ওপর জোর দেয়া যাবে না। ছদ্মবেশ নিতে গেলে আঙটি খুলেও ফেলতে পারে। এই তো, আর কি?'

চুপ করে রইল ওমর।

সাইমন জিজ্ঞেস করলেন, 'তো, কবে রওনা হতে চাও?'

'ভিসা আর অন্যান্য কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলেই।'

'দু'একদিনেই হয়ে যাবে। সব আমি করে দেব। তোমাদের এখন একটাই কাজ, একটা প্লেনের ব্যবস্থা করে ফেলা।'

চার

বুমারের বাড়িতে রাতটা ভালই কাটল ওদের। মশারি থাকায় মশা কামড়াতে পারেনি। যদিও রাতভর মশারির বাইরে ওগুলোর ক্ষুধার্ত গুঞ্জন শুনেছে ওরা। সুযোগ পেলেই হত কেবল। ঝাঁক বাঁধা বোমারু বিমানের মত ডাইভ দিয়ে এসে পড়ত। 'ব্যাটারা ড্রাকুলার গোষ্ঠী!' মাঝরাতে আধোঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করেছে একবার মুসা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। প্রচণ্ড আঠা-আঠা গরম। মাটি থেকে ভাপ উঠছে। গাছের পাতায় পানি আটকে আছে তখনও। পাখি কিংবা বানরে নাড়া দিলেই ঝরে পড়ছে। চতুর্দিকে কোলাহল। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে হামিংবার্ড, তাদের গুঞ্জন। লক্ষ লক্ষ পোকামাকড়ের কান ঝালাপালা করা চিৎকার। ব্যাঙের ডাক—কোনটা ভারী, গমগমে, কোনটা হাঁসের ডাকের মত প্যাঁক-প্যাঁক। নানা পাখির নানা ডাক, কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ চিৎকার করছে তারস্বরে।

ভোরে উঠেই পায়ারে চলে গেছেন বুমার, ক্যালাপোতে মাল তোলা তদারকের জন্যে। অর্কিডের একটা চালান যাচ্ছে। নদীতে এখন ভাল স্রোত, ম্যানাওয়ে পৌঁছতে সুবিধে হবে।

ছয়টা ঘোড়া রেডি করে রাখতে বলেছিলেন তিনি। জিন পরিয়ে সেগুলোকে তৈরি করে রাখা হয়েছে গোয়েন্দাদের ক্রুজোয়াড়ো নিয়ে যাওয়ার জন্যে। চারটে ঘোড়াতে যাবে ওমর আর তিন গোয়েন্দা, একটা ঘোড়াতে মালপত্র, আর বাকি একটাতে ওদের গাইড। লোকটা শ্রমিকদের সেই নিগ্রো ফোরম্যান। ওকে গাইড হিসেবে বাছাই করার কারণ, মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে সে। হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার মত শরীর, হাসিখুশি, শরীরের তুলনায় কণ্ঠস্বর খুব চাপা, নাম বোকো বারনারদি। কোমরে ঝোলানো ম্যাচেটি। জিনিসটা নেপালিদের ভোজালির মত একধরনের বড় ছুরি, ছোটখাট তলোয়ারই বলা চলে। জঙ্গলে, বিশেষ করে রেইনফরেস্টের মত ঘন আর গভীর জঙ্গলগুলোতে খুবই দরকারী জিনিস। লতা, ডালপাতা কেটে এগোনোর জন্যে তো বটেই, নিরাপত্তার জন্যেও জরুরী।

পায়ারের কাজ ফেলে রেখে এসে মেহমানদের ঘোড়ায় তুলে দিয়ে ওমরকে বললেন বুমার, 'যান। বোকো ক্রুজোয়াড়োতে আপনাদের থাকার

সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর ফিরবে। ওখানে কোন অসুবিধে হলে চলে আসবেন। আপনাদের কাগজপত্র ঠিক আছে তো?'

'আছে।'

'তাহলে গিয়েই আগে সাব-প্রিফেক্তোর সঙ্গে দেখা করে ওগুলোতে স্ট্যাম্প লাগিয়ে নেবেন। বলবেন আমার কথা, সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে। ওর নাম সেনর আরমিজো। এমনিতে লোক খারাপ না, কিন্তু তার সঙ্গে বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গেলেই খেপে যায়। তখন তাকে নরম করা মুশকিল। তবে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। ও আমার বন্ধু।'

বুমারকে ধন্যবাদ দিল ওমর।

রওনা হলো দলটা। ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে চওড়া একটা ফাঁক তৈরি করা হয়েছে, এটাই রাস্তা। রাস্তাটা সোজা হয়ে এগিয়েছে খুব কম জায়গা দিয়েই। এঁকেবেঁকে গেছে। নদী থেকে বেশি দূরেও সরেনি, আবার বেশি কাছেও ঘেঁষেনি। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে পানিতে সূর্যের ঝিলিক। দুই পাশ থেকে বড় বড় গাছের ডাল আর ঝোপ লতাপাতা চেপে এসে ফাঁকটা বন্ধ করে দেয়ার ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে। জমি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। মাটির যা অবস্থা, হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবলেও ভয় লাগে। ঘোড়াই চলেছে অনেক কষ্টে। খুর বলে কাদায় আটকে থাকছে, পিছলাচ্ছে না। গাছের পাতায় পানি আটকে আছে। কোন কারণে নাড়া লাগলেই বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে মুষলধারে বৃষ্টির মত। বন এতটাই ঘন, মাঝখানের ফাঁকটাকে মনে হচ্ছে একটা সুড়ঙ্গ, এগিয়ে গেছে সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। ভয়াবহ গরম। শরীর থেকে ঘাম বেরোচ্ছে অনবরত, আঠার মত আটকে যাচ্ছে চামড়ায়। একরত্তি বাতাস নেই।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গায় একটা আদিমতম কুঁড়ে দেখা গেল। কয়েকজন ইনডিয়ান কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সভ্যতার ছিটেফোঁটা ছোঁয়া লাগেনি ওদের মধ্যে। বোকো জানাল ওরা রবার সংগ্রহ করে। অর্কিড পেলেও নিয়ে আসে। ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নেন বুমার। কিন্তু টাকার কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এমনিতে ওরা শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু মাতাল হলে কি করবে কোন ঠিকঠিকানা নেই।

নীরবে এগিয়ে চলল দলটা। কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। বলবে আর কখন, নানা রকম ঝামেলা। কত জাতের পোকা যে এসে বসছে গায়ে, কোন কোনটা কামড়ে দিচ্ছে, কোনটা সুড়সুড়ি। সেসব তাড়াতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হলো ট্যারানো, বড় আকারের একজাতের ঘোড়ামাছি, প্রচণ্ড কামড় দেয়।

পথের দুধারে, ওপরে-নিচে প্রাণের ছড়াছড়ি। গাছের মাথায় তোতা আর টিয়ার কান ঝালাপালা করা চিৎকার। বিচিত্র স্বরে ডেকে উঠছে ট্যুক্যান পাখি। তেল শুকিয়ে যাওয়া ফ্যানের বেয়ারিঙের ঘড়ঘড়ানির মত শব্দ। ফুল

থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে উজ্জ্বল রঙের হামিংবার্ড। গাছের ডালে বানরের চেঁচামেচি আর শিস। ভেজা, পচা পাতার দুর্গন্ধ ভেদ করে মাঝে মাঝে নাকে এসে লাগে নাম না জানা বুনো ফুলের সুবাস। প্রজাপতি উড়ছে নানা আকারের, নানা বর্ণের, কোথাও একা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে। মানুষের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সামনে থেকে উড়ে গেল একটুকরো নীল মেঘ। মরফো প্রজাপতির ঝাঁক। বিস্ময়কর দৃশ্য। সারি দিয়ে চলে যাচ্ছে ছাতা-পিঁপড়ের দল। মাথার ওপর ছাতার মত ধরে রেখেছে নিজেদের তুলনায় অনেক বড় করে কেটে নেয়া একটুকরো করে পাতা।

কথা নেই বার্তা নেই, শাঁই করে পথের পাশের ঝোপ থেকে ডানা ফড়ফড় করে উড়ে এল অদ্ভুত চেহারার একটা বিশাল মথ। ডানার রঙ ধূসর, তাতে মড়ার খুলি আঁকা। বিষাক্ত হুল আছে। মুখে বাড়ি লাগবে দেখে ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা। বোকো বলল, এই মথের নাম লা সিগারা দ্য লা মুয়েত। অনুবাদ করলে দাঁড়ায় মৃত্যু-মথ। কাউকে হুল ফোটালে নাকি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায় সে।

সন্দেহ হলো ওমরের। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিশ্বাস করো এ কথা?'

'জানি না। আমাকে তো আর কামড়ায়নি কখনও,' মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছে ভেবে হো হো হেসে উঠল বোকো। অভয় দিয়ে বলল, 'নো হে কুইদাদো,' অর্থাৎ ভয়ের কিছু নেই।

'মজার লোক,' নিচু স্বরে কিশোরকে বলল রবিন।

এরপর ঘটল আরেকটা ঘটনা। দুই ফুট লম্বা ছোট একটা সবুজ সাপ গাছের ডাল থেকে খসে পড়ল, এবারও মুসার ওপর। আঁকড়ে থাকতে পারল না, পড়ে গেল মাটিতে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাচেটি দিয়ে সাপটাকে দুই টুকরো করে ফেলল বোকো। জানাল, সাপটার নাম ম্যাকাব্রিল। গাছের ডালে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকে। 'কোন বোকা' যদি ওটার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। মুসার ভাগ্য ভাল, ওকে কামড়াতে পারেনি। সাংঘাতিক বিষ এগুলোর। বাঁচতে চাইলে কামড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে। সাপের বিষের সঙ্গে পানির কি সম্পর্ক, প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারল না বোকো। ওর ভাবভঙ্গিতে মনে হলো, জঙ্গলে চলার পথে এ সব অতি সাধারণ, তুচ্ছ ঘটনা।

ভেতর থেকে ঘামে ভিজছে শার্ট, বাইরে থেকে ভিজছে পাতার পানিতে। গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। বিরক্তিকর। বোকো বলল, এই জন্যেই এখানে কেউ কাপড় গায়ে দিতে চায় না। খালি গায়ে থাকা অনেক আরামের।

'অবশ্যই যদি সে কোনও বোকা না হয়,' আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'নাহলে ম্যাকাব্রিলের কামড় খেয়ে মরতে হবে।'

হেসে ফেলল কিশোর। মুসাও হাসল।

এগিয়ে চলল ওরা। জঘন্য এই পথের শেষ হবে কিনা যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে রবিন, তখনই ঘোষণা করল বোকো, পৌঁছে গেছে। আর বেশিদূর

নেই।

নদীর কিনারে একটা ছোট পাহাড়ের মাথা পেরোনোর সময় অন্যপাড়ে কতগুলো বাড়িঘর চোখে পড়ল। ওটা ব্রাজিলের সীমান্ত। এপারে ওরা রয়েছে পেরুর সীমানার মধ্যে। নদীর খানিকটা উজানে দুই ভাগ হয়ে গেছে নদীটা, ওটা বলিভিয়ার সীমানা, আন্দাজ করল কিশোর। ম্যাপ দেখে মনে রেখেছে।

আরও এগোনো পর সামনে দেখা গেল কফি খেত। একধারে জঙ্গল কেটে কফির চাষ করা হয়েছে। লাল ফল ধরেছে ওগুলোতে।

পাঁচ

দূর থেকে দেখে ক্রুজোয়াড়ো শহরটাকে একটা বিষণ্ন, নিরানন্দ জায়গা বলে মনে হলো গোয়েন্দাদের। কাছে থেকে আরও খারাপ। নোংরা, একটা ধ্বংসস্তূপ যেন। শহরের মেইন রোড, যেটা ধরে এগোল ওরা, ছালচামড়া বলতে কিছু নেই, কেবল থকথকে কাদা। যেখানে সেখানে পড়ে আছে আবর্জনা, সাফ করার কোন মাথাব্যথা নেই যেন কারও। দুধারে বাড়িঘরগুলো যতটা সম্ভব সাধারণ জিনিস দিয়ে খাড়া করা হয়েছে, মাটি, ঘাস আর পাতা। সাদা চুনকাম করা হয়েছে কিছু কিছু দেয়ালের, কিন্তু সেগুলোও দাগে ভরা। সবচেয়ে দামী বাড়িগুলোতে কেবল টিনের চালা। দোকানগুলোর জানালায় কাঁচ নেই। ভেতরে জিনিসপত্র যে ভাবে ইচ্ছে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে, সাজানোর ঝামেলা নেই।

রাস্তায় কিছু লোক দেখা গেল, বেশির ভাগই ল্যানারো। সরু কোমর, ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে থাকতে পা কেমন ভেতরের দিকে বেঁকে গেছে। সবাই দেখতে এক রকম। কোমরে চামড়ার বেল্টে ঝোলানো খাপে পোরা রিভলভার। কারও কারও ম্যাচেটিও আছে। জুতোর গোড়ালিতে কাঁটা বসানো। আঁটো প্যান্ট। কাপড়-চোপড় কল্পনার বাইরে নোংরা। দাগে ভরা শার্ট। মাথার সমব্রেরো হ্যাট দুমড়ে-মুচড়ে এমন আকৃতি হয়েছে, দেখে চেনার উপায় নেই আসল চেহারা।

মুসার পাশে সরে এসে নিচু স্বরে বলল রবিন, 'এক্কেবারে আসল কাউবয়, টিভির পর্দায় যাদের দেখি। কেবল এলাকা আলাদা।'

কথাটা শুনে ফেলল বোকো। বলল, ওরা খুব নিঃসঙ্গ। গরু চরাতে গিয়ে কখনও মাসের পর মাসও একা থাকতে হয়, দ্বিতীয় মানুষের দেখা পায় না। শহরে ঢুকে তাই যদি কিছুটা পাগলামি করেই বসে ওদের কি দোষ দেয়া যায়?

শহরের মধ্যিখানে সবচেয়ে ভাল জায়গাটায় তৈরি করা হয়েছে ভ্যালদেজ হোটেল। একপাশে শহর কর্তৃপক্ষের হেডকোয়ার্টার, তার মধ্যে কাস্টম অফিস আর থানাও রয়েছে। ওমরকে কাগজপত্রের কাজ সেরে আসতে বলল বোকো। ঘোড়াগুলো নিয়ে পেছনের আঙিনায় অপেক্ষা করবে সে।

হোটেলের চেহারা দেখেই দমে গেল রবিন। মুসারও ভাল লাগল না।

ওমর আর কিশোর অবশ্য এমনটাই আশা করেছিল, সুতরাং ওরা বিরূপ হলো না। ভেতরে ঢুকল ওরা। রিসেপশন ডেস্কের ওপাশে বসে আছে একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে। ডেস্কটা কাঠের, কিন্তু এতই সস্তা, বার্নিশ পর্যন্ত করা হয়নি। মেয়েটাকে সুন্দরীই বলা চলে। অতিরিক্ত কথা বলে। দুটো ডাবলরুম দিতে বলল ওরা। অ্যাডভান্স করার আগে ঘর দেখতে চাইল।

দেখাতে নিয়ে চলল এক ইনডিয়ান কিশোর।

পিঁপড়েয় ভরা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন, 'এ তো জঙ্গলের চেয়ে খারাপ! থাকব কি করে?'

ঘর দেখার পর চেহারার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল তার। অতি ছোট ছোট ঘর, তাতে কোনমতে দুটো খাট ঢোকানো হয়েছে। পাশে এত সরু ওগুলোর, কোনমতে একজন মানুষের জায়গা হয়। বিছানায় চাদর নেই। কম্বলগুলো ময়লা। কাঠের মত শক্ত ম্যাট্রেস। আসবাব বলতে একটা ওয়াশ-স্ট্যান্ডে ফাটা বেসিন লাগানো, বাদামী হয়ে গেছে তাতে রাখা পানি। কাপড় রাখার জন্যে দেয়ালে পেরেক লাগানো আছে। এককোণে কতগুলো খালি বিয়ারের বোতল পড়ে আছে। পরিষ্কার করানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি হোটেল কর্তৃপক্ষ। গোসল আর পায়খানার ব্যবস্থা বাইরে, উঠানের একধারে। সাবান, তোয়ালে, এ সব বোর্ডারের নিজেকে কিনে নিতে হবে।

নাকমুখ কুঁচকে বলল রবিন, 'এটা হোটেল না খোঁয়াড়?'

'আছো কোথায় সেটা খেয়াল করবে না?' বলল কিশোর।

'যেখানেই থাকি, আমি বাপু এই খোঁয়াড়ে থাকতে পারব না। এরচেয়ে জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকা অনেক ভাল।'

'তাঁবু পাবে কোথায়?'

'তাহলে খোলা আকাশের নিচেই থাকব।'

'এখানে পারবে না। মশাই পাগল বানিয়ে ছাড়বে। বাকি সব পোকামাকড় আর বুনো জানোয়ারের কথা বাদই দিলাম।'

'তো কি করব? আমি এখানে থাকতে পারব না।'

'আমারও ভাল্লাগছে না,' মুসা বলল। 'তারচেয়ে বুমারের বাড়িতে থাকা অনেক আরামের। এক কাজ করলে পারি না? এখানকার কাজ শেষ করে বরং ওখানেই চলে যাই আমরা। বাকি কাজ ওখানে বসেই করা যাবে।'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর। 'কথাটা মন্দ বলোনি। কিন্তু এখানে কাজ শেষ হতে কত সময় লাগবে বলা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তুমি আর রবিন বোকোর সঙ্গে ফিরে যাও। রবিন গিয়ে অর্কিড নিয়ে পড়ে থাকুক। আর তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করবে। মাছ ধোরো, বনেবাদাড়ে ঘুরে বেরিয়ো বোকোর সঙ্গে—খবরদার, বনে একা ঢুকো না। এ সব করলে আমাদের ছদ্মবেশটা বিশ্বাসযোগ্য হবে।'

প্রস্তাবটা ভাল লাগল রবিনের। 'আর তোমরা?'

'আমরা এখানে ভ্যালেন্তির খোঁজ করব।'

'যদি আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়?'

'বোকোকে বলে দেব যাতে নিয়মিত এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যায়। ইচ্ছে করলে তোমরাও তখন তার সাথে চলে আসতে পারবে।'

অতএব দুটো ঘর না নিয়ে একটা ঘরেরই ব্যবস্থা হলো। মুসা আর রবিন আবার ফিরে যাবে, তাই কাপড় বদলাল না। ইনডিয়ান ছেলেটাকে দিয়ে নিজেদের ব্যাগ আনিয়ে নিল কিশোর আর ওমর। উঠানের ধারের গোসলখানা থেকে গোসল সেরে এসে শুকনো কাপড় পরল। বারে বসে তখন কয়েকজন ল্যানারোর সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে বোকো। বিয়ার খাচ্ছে। মুসা আর রবিন ফিরে যাচ্ছে শুনে খুশি হলো সে। তখনই রওনা হতে চাইল।

যেতেই যখন হবে, দেরি করার মানে হয় না। ওমর আর কিশোরের কাজে লাগতে পারে ভেবে দুটো ঘোড়া রেখে দিল হোটেলের পেছনের আস্তাবলে। ইনডিয়ান হোটেল বয়টাকে ভালমত বলে দিল ঘোড়াগুলোর দানাপানির দিকে নজর রাখতে।

বোকোকে কিছু টাকা বকশিস দিল ওমর। সেটা থেকে বিয়ারের দাম মিটিয়ে দিতে বলল।

মুসারা চলে যাওয়ার পর হোটেল মালিকের সঙ্গে দেখা করল কিশোর আর ওমর। লোকটা মেকসিকান। নাম ব্রুনো ভ্যালদেজ। গর্ব করে বলল, 'এত ভাল হোটেল আর এ অঞ্চলে পাবেন না। সাপ-বিচ্ছু কিচ্ছু নেই।'

ওদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে এল সে। হোটেলের বাকি সব ঘরের মত এটারও করুণ অবস্থা। তবে খাবার যা এল সেটা সত্যি চমৎকার। এত ভাল রান্না আশা করেনি ওরা। গরুর তাজা মাংস পাওয়া যায় প্রচুর। সেজন্যেই বোধহয় কাবাব যেটা দেয়া হলো, স্বাদ খুব ভাল। মাংস আর ভাত। আপাতত আলু নেই স্টকে। ভ্যালদেজ জানাল, শীঘ্রি এসে যাবে, তখন আলুও দেয়া হবে। পরিশ্রম করে এসেছে। খিদেও পেয়েছে খুব। ভাত আর মাংস গোগ্রাসে গিলল দুজনে।

খাওয়ার পর এল কফি। বাগান থেকে সদ্য তুলে আনা সে কফির ঘ্রাণই আলাদা। মোট কথা, খাওয়াটা জমল ভাল।

'সাব-প্রিফেক্টোর সঙ্গে দেখা করে আমাদের কাগজপত্রগুলোতে আগে স্ট্যাম্প মারাতে হবে,' ওমর বলল। 'তারপর আসল কাজে নামব।'

'কি করে খুঁজে বের করবেন ভ্যালেন্তিকে, কিছু ভেবেছেন?'

'এখনও কিছু ভাবিনি। তবে কাউকে ওর ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাহলে ওর কানে চলে যেতে পারে—যদি এই এলাকায় থেকে থাকে। যাবে তখন গায়েব হয়ে। আপাতত আমাদের কাজ চোখকান খোলা রাখা। কারও মুখে ওর নাম শোনার অপেক্ষায় থাকা। ওই আমেরিকান লোকটার ব্যাপারে চিন্তিত আছি আমি, বুমার যার কথা বললেন। মনে হচ্ছে, লোকটা স্পাই, সাধারণ ট্যুরিস্ট নয়। নইলে ঝড়তুফানের পরোয়া না করে এখানে আসার জন্যে অস্থির হবে কেন? ও উঠেছে কোথায় সেটা জানতে হবে। ভ্যালদেজ এই এলাকার সবচেয়ে ভাল হোটেল হয়ে থাকলে এখানেই ওঠার সম্ভাবনা। তোমার কি মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আমি একমত।'
'চলো, শহরটা ঘুরে দেখে আসি।'
'হোটেলের রেজিস্টারও তো সই করলাম না।'
'এখানে ওসবের বালাই আছে বলেও মনে হয় না। তবু চলো রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।'

ওমরের ধারণাই সত্যি হলো। একগাল হাসি দিয়ে জানিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট মেয়েটা, সই করা লাগবে না।

'আপনার দিকে অমন করে তাকাচ্ছিল কেন ও?'

হেসে ফেলল ওমর, 'পছন্দ হয়েছে মনে করেছ নাকি? ও তাকাচ্ছিল আসলে আমার পকেটের দিকে, কত মোটা বকশিস পাবে সেই আশায়।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরোলেই সাব-প্রিফেক্তোর অফিস। ভেতরেই পাওয়া গেল সেনর আরমিজোকে। টেবিলে মুখোমুখি বসে পুরু গোঁফওয়ালা, মোটাসোটা, ইউনিফর্ম পরা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। এই লোকই ইনতেনদেন্তে, স্থানীয় মিলিটারি পুলিশের প্রধান। আধখালি একটা মদের বোতল আর দুটো গেলাস রাখা আছে টেবিলে।

খুব ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহার করা হলো কিশোরদের সঙ্গে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এতটা ভাল ব্যবহার আশা করেনি ওরা। এটা বিশ্বখ্যাত স্প্যানিশ ভদ্রতা। ওদের কাছ থেকে শিখেছে। বুমারের মেহমান শুনে কাগজগুলো উল্টে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না আরমিজো। সীল মেরে দিলেন। মুসা আর রবিনের রেখে যাওয়া কাগজপত্রেও সীল মেরে নেয়া হলো। ওদের না দেখেই সীল দিয়ে দিলেন আরমিজো।

আরমিজো বা ইনতেনদেন্তে কোন প্রশ্ন করলেন না। ভবিষ্যতে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে সেজন্যে ওমর নিজেই জানিয়ে দিল বুমারের মেহমান হয়ে এসেছে ওরা। ট্যুরিস্ট। অর্কিড আর জন্তু-জানোয়ারে আগ্রহী। কয়েকদিন থাকবে।

'যতদিন ইচ্ছে থাকুন,' আরমিজো বললেন। 'ভাল জায়গায় উঠেছেন। থাকতে অসুবিধে হবে না।'

এ কথার কোন জবাব দিল না ওমর। মৃদু হাসল শুধু।

পুলিশ-প্রধান বললেন, যে কোনভাবে ওদের সাহায্য করতে পারলে তিনি খুশি হবেন। কোন রকম অসুবিধে হলেই যেন নির্দ্বিধায় ওরা তাঁর কাছে চলে আসে।

ভ্যালেন্তির কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না ওমর। প্রথম দর্শনেই এ রকম একটা প্রশ্ন করে পুলিশের সন্দেহ জাগানোর ঝুঁকি নিতে চাইল না। ভ্যালেন্তি বিদেশী হলে তাও নাহয় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে পারত—আর ক'জন আমেরিকান এসেছে এখানে? নিজের দেশে নিজেকে বিদেশী বলে চালানোর কোন যুক্তিই নেই এবং নিঃসন্দেহে সেটা করেওনি ভ্যালেন্তি।

দুই অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল পোস্ট অফিসের সামনে। অফিসটা দেখল। মনে ক্ষীণ আশা

যদি ভ্যালেন্তিকে চোখে পড়ে যায়? কয়েকটা বারে ঢুকে দেখল। একটা কাফেতে ঢুকে কফি খেল। কিন্তু কোনখানেই ভ্যালেন্তির চেহারার কাউকে নজরে পড়ল না।

অবশেষে একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে হোটেলে ফিরে এল ওরা।

'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' নিচুস্বরে কথা বলল ওমর। পাতলা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘরের দেয়াল তৈরি হয়েছে। অন্যপাশে কেউ কান পেতে থাকলে পরিষ্কার শুনতে পাবে। 'আমাদের যতটা ধারণা দেয়া হয়েছে, ভ্যালেন্তি যদি তার অর্ধেক চালাকও হয়ে থাকে, এখানে আসা বিদেশীদের ওপর কড়া নজর রাখবে সে। আমার ভয়, আমরা তাকে খুঁজে বের করার আগেই আমাদের আসার খবর ওর কানে চলে যাবে। এমনকি দেখেও ফেলতে পারে আমাদের। সন্দেহ হলেই ডুব দেবে গভীর পানিতে। খুঁজে বের করা তখন তাকে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

ছয়

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ওমর।

তিনদিন পার হয়ে গেছে, এখনও ভ্যালেন্তির কোন খোঁজ নেই। পনেরো দিন সময়ের মধ্যে দশ দিনই কেটে গেছে, হাতে আছে আর মাত্র পাঁচ দিন। অবশ্য ভালমত খোঁজ নেয়া যাকে বলে, তা করতেও পারছে না ওরা। সর্বসাধারণের যাতায়াত আছে এমন সব জায়গা যেমন পোস্ট অফিস, বার, সিনেমা হল, খাবারের দোকানগুলোতে ঘোরাফেরা করে ভ্যালেন্তির চেহারার মানুষ খুঁজেছে। লোকের কথাবার্তায় ভ্যালেন্তি নামটা শোনার জন্যে উৎকীর্ণ হয়ে থেকেছে। এ ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।

আমেরিকান লোকটাকে দেখেছে ওরা। ভ্যালদেজ হোটেলেই উঠেছে সে। হোটেল মালিকের কাছ থেকে নামটাও জেনে নিয়েছে কায়দা করে। লোকটার নাম নেলসন। খুব ভাল স্প্যানিশ বলতে পারে। ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে ওরা, ওদের মতই কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেও। এবং সেই কেউটা যে ভ্যালেন্তি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

মোটামুটি নির্বিবাদে পেরিয়ে গেল হপ্তাশেষের ছুটির দিনটা। ল্যানারোরা ছুটি কাটাতে এল, যথারীতি মারপিট করল; তবে হাতাহাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল সেটা, গোলাগুলি কিংবা ছুরি মারার ঘটনা ঘটল না।

ভ্যালেন্তি ক্রুজোয়াড়োতে আছে কিনা, সন্দেহ হতে লাগল ওদের। হয়তো অন্য কোন শহরে আছে। কিংবা আছে ব্রাজিলে, অথবা বলিভিয়ায়। তাহলে শুধু শুধু এখানে সময় নষ্ট করছে ওরা।

'কিন্তু চিঠি তো পাঠিয়েছে এখান থেকে,' প্রশ্ন তুলল ওমর। 'এখানে না থাকলে পাঠাবে কি করে?'

'অন্য কাউকে দিয়ে পোস্ট করাতে পারে।'

'তা বটে।'

'লোকের সঙ্গে কথাই বলতে হবে, বুঝতে পারছি। ওর ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। আর কোন উপায় নেই।'

'কাদের কাছে নেবে?'

'সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলো পোস্ট অফিস। ভ্যালেন্তি নামে কেউ ওখানে চিঠি পোস্ট করতে যায় কিনা জিজ্ঞেস করব।'

'হয়তো যায়। নিজের নাম না বলে বানিয়ে একটা নাম বলে দেয়। বুঝব কিভাবে?'

'তাও তো কথা! নাহ্, হবে না! বুমারকেই গিয়ে ধরতে হবে। তাঁকে সব কথা জানিয়ে খোলাখুলি সাহায্য চাইতে হবে। অনেক লোক জানাশোনা আছে তাঁর। ওদের লাগিয়ে খবরটা বের করে দিতে পারবেন তিনি।'

'আমার কি ধারণা জানেন? নিজে পোস্ট অফিসে যায় না ভ্যালেন্তি। অন্য কাউকে পাঠায়। চিঠি আনার জন্যেও, পোস্ট করার জন্যেও। সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই একটা লাইন পেয়ে যাব।'

কিন্তু কে সেই লোক? কি করে তাকে পাওয়া যাবে?

পাওয়া তাকে গেল অনেকটা অযাচিত ভাবেই। বোকোর সাহায্যে।

সেদিন ওমর আর কিশোর শহরে ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে দেখে রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে বসে গল্প করছে বোকো। হেসে হেসে কথা বলছে দুজনে।

এগিয়ে গেল ওমর, 'আরে, বোকো, তুমি?'

'সেনর বুমার পাঠালেন আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে।'

'তিনি কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'তা শুধু মুখে বসে আছ কেন? গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে না? চলো, বারে চলো।'

বারে এসে বোকোর জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিল ওমর। নিজের আর কিশোরের জন্যে কমলার রস।

'মেয়েটার সঙ্গে তো বেশ জমিয়ে ফেলেছ দেখলাম,' হেসে বলল ওমর। 'কি বলছিলে?'

'আমি বলিনি তেমন, শুনছিলাম। ও কথা শুরু করলে আর কেউ বলতে পারে নাকি?'

'কি বলছিল ও?'

'আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

আগ্রহী হলো ওমর, 'কি কথা?'

'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন, কদ্দিন থাকবেন, এখানে কি কাজ, এইসব।'

'কি বললে?'

'আপনারা সেনর বুমারের মেহমান। এখানে বেড়াতে এসেছেন। অর্কিড পছন্দ করেন।'

'আমাদের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন ওর?'

'ওর নয়, এক সেনরের। নতুন যে কোন গ্রিংগো হোটেলে এলে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে জানানোর জন্যে ওকে টাকা দেয় সেনর।'

আমেরিকানদের গ্রিংগো বলে এই অঞ্চলের মানুষ। চট করে কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'তাই? এত কৌতূহলী সেনরটি কে?'

'ও বলেনি।'

'কোথায় থাকে?'

'জানে না বলল।'

'তাহলে এ সব তথ্য ওকে কোথায় গিয়ে দেয় মেয়েটা? ওই লোক এখানে আসে?'

'না। এখানকার কাজ শেষ করে অন্য এক জায়গায় চলে যায় এদিথ। কথা বলে। ওকে প্রচুর ড্রিংক কিনে খাওয়ায় ওই সেনর।'

'এদিথ কে? মেয়েটা?'

মাথা ঝাঁকাল বোকো।

'কোথায় দেখা করে ওরা?'

'আমাকে বলেনি।'

'হোটেলে আসা গ্রিংগোদের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন সেনরের তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

রহস্যময় হাসি হাসল বোকো, 'হবে হয়তো কোন সোনার খনির মালিক। কিংবা গুপ্তধনের খোঁজ জানে। নকশা বিক্রি করতে চায় গ্রিংগোদের কাছে।'

কৌতূহল হলো কিশোরের, 'নকশা?'

'হ্যাঁ। খুব ভাল ব্যবসা এটা এখানে। নতুন যারাই আসে, বেশির ভাগই সোনার খনির খোঁজ করে। বিক্রি করার লোকেরও অভাব নেই। কোথায় খনি আর গুপ্তধন আছে, ওরা জানে। কেউ চাইলেই কিভাবে যেতে হবে, রেডিমেড নকশা বের করে দেবে, কিংবা ওখানে বসেই এঁকে দেবে। তবে সেটা কিনে নিতে হবে ওদের কাছ থেকে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল ওমর। 'আমি যদি একটা খনি কিনতে চাই?'

অবাক হলো বোকো। 'আপনি কিনবেন? আপনাকে দেখে তো অতটা বোকা লোক মনে হয় না, সেনর! কেউ সোনার খনির মালিক হলে সে কি সেটা বিক্রি করে নাকি? গুপ্তধনের নকশা পেলেও নিজেই তুলে আনবে।'

'বুঝতে পারছি বোকা গ্রিংগোদের ঠকায় ওরা। আমি আসলে খনি কেনার লোভ দেখিয়ে লোকটাকে কাছে আনতে চাই। দেখতে চাই ওকে। মেয়েটার সঙ্গে তোমার খাতির কেমন?'

হাসল বোকো, 'ভালই। কেন?'

'জানতে পারবে কোন লোক গ্রিংগোদের ব্যাপারে আগ্রহী? কোথায় দেখা

করে দুজনে?'

'দ্বিধায় পড়ে গেল বোকো। 'যদি না বলে?'

'টাকার লোভ কেমন?'

'সাংঘাতিক।'

'তাহলে টাকা দিয়েই বলাবে,' মানিব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে দিল ওমর। 'নাও। আমরা এখানে আছি।'

'সি, সেনর,' দ্রুত বিয়ারটা শেষ করে উঠে চলে গেল বোকো।

'এতদিনে মনে হচ্ছে একটা পথ পাওয়া গেল,' নিচুস্বরে বলল ওমর।

খুব বেশি সময় লাগাল না বোকো। ফিরে এল।

'কি জানলে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল বোকো। 'এখানে না, সেনর। বাইরে চলুন।'

কিশোর আর ওমরকে নিয়ে পেছনে আস্তাবলের কাছে চলে এল সে।

'হ্যাঁ, বলো,' শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ওমর।

'এদিথ বলল…বলতে ভয় পাচ্ছিল ও। টাকা দেখে শেষে আর সামলাতে পারল না। বলে ফেলল। বার লুজিয়ানোতে রাতে দেখা করে ওরা।'

'আজ করবে?'

'করতে পারে।'

'কটার সময়?'

'এগারোটা।'

'লোকটার নাম কি?'

'কোল প্যাসিয়ানো।'

'কোথায় থাকে?'

'এদিথ বলল সে জানে না। ক্রুজোয়াড়োতে আসার পর এই হোটেলেই উঠেছিল লোকটা। তিন দিন থেকে চলে গেছে। অন্য কোথাও উঠেছে।'

'কোল প্যাসিয়ানোর দেশ কোথায়?'

'এ দেশীই হবে। আর কোথায়?'

'তারমানে জিজ্ঞেস করোনি?'

'না?'

'আমাদের কথা ওকে বলেছে এদিথ?'

'যে কোন গ্রিংগো এলেই ওকে জানানোর কথা এদিথের।'

'শুধু কি গ্রিংগোদের কথাই জানায়, না আরও কিছু করে লোকটার জন্যে?'

'আরেকটা কাজ করে দেয় এদিথ, নিজে থেকেই বলল। লোকটার চিঠি পোস্ট করে দিয়ে আসে। কোনও চিঠি এলে সেটা নিয়ে আসে।'

এটা একটা বিরাট খবর! চট করে কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। বোকোর দিকে ফিরল। 'অনেক উপকার করলে, বোকো। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ফিরবে কখন?'

'এখনই।'

'মুসা আর রবিন কেমন আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

একগাল হেসে বোকো বলল, 'সেনর রবিন তো সেনর বুমারের শিষ্য হয়ে গেছেন। সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। আর সেনর মুসার খাতির ইনডিয়ানদের সঙ্গে। ভেলায় করে নদীতে মাছ ধরতে চলে যান, জঙ্গলে ঢোকেন। আনন্দেই আছেন।'

'তা থাকবেন, জানি,' হেসে বলল ওমর। 'সেনর বুমারকে বোলো, আমরা ভাল আছি। শীঘ্রি দেখা হবে।'

'সি, সেনর।'

ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল বোকো।

'কি বুঝলেন, ওমরভাই?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে একটা মুহূর্ত ভাবল ওমর, 'এতদিনে একটা সূত্র মিলল। আশা করি আজ রাতেই কোল প্যাসিয়ানোর দেখা পাব। তবে ও ভ্যালেন্তি কিনা, কিংবা তার সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে কিনা, সেটা সময়ই বলতে পারবে। এমনও হতে পারে, এই লোক সাধারণ ঠগবাজ। বোকা গ্রিংগোদের তালাশে থাকে। চান্স পেলেই ঠকায়।'

'আপনি যাই বলুন, আমার সন্দেহ প্যাসিয়ানো সাধারণ ঠগবাজ নয়। অত লুকোছাপা করবে কেন তাহলে? চিঠি পর্যন্ত পোস্ট করতে যায় না পোস্ট অফিসে। কেন? কিসের অত ভয়?'

'এটা একটা প্রশ্ন বটে।'

'এদিথকে কেমন মনে হয় আপনার?'

'অতি সাধারণ, লোভী একটা মেয়ে। একবিন্দু বিশ্বাস নেই। টাকা দিয়ে যে কেউ কিনে নিতে পারে ওকে।'

'বোকোকে মিথ্যে কথা বলেনি তো?'

'বলতেও পারে।'

'কি করতে চান এখন? বার লুজিয়ানোতে গিয়ে নজর রাখবেন?'

'যেতে তো হবেই। না হলে বুঝব কি করে এদিথ সত্যি বলল না মিথ্যে? পোশাক বদলে যাব। এ দেশী লোক সেজে বারে খদ্দেরদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

'আমি কি করব?'

'সেইটাই সমস্যা। তোমাকে ওখানে মানাবে না। বয়স কম।'

হাসল কিশোর, 'অল্প বয়সেই বখে যেতে অসুবিধে কি? বাউণ্ডুলে হয়ে গেছি।'

ওমরও হেসে ফেলল, 'সেটা বোঝানোর জন্যে তো মদ খেতে হবে। পারবে?'

'কাজের খাতিরে একআধটু চেখে দেখলে ক্ষতি কি? ভাববেন না, খাই আর না খাই, অভিনয় করে চালিয়ে দিতে পারব।'

হোটেলের বারে ফিরে এল দুজনে। দেখল নেলসন এসেছে। স্থানীয়

একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সামনের দুটো দাঁত নেই লোকটার। হাসলে কুৎসিত লাগে। গায়ের বুশ জ্যাকেটটা অতিরিক্ত ময়লা। হ্যাটের অবস্থাও শোচনীয়।

'বাহ্,' কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল ওমর, 'আমাদের আমেরিকান বন্ধু একজন দোস্তও খুঁজে বের করে ফেলেছে।'

শান্তভাবে কেটে গেল দিনটা। বিকেলের দিকে কিশোর আর ওমর গিয়ে দেখে এল বার লুজিয়ানোর চেহারা। বড় একটা ঘর। সাদামাঠা, এলোমেলো, নোংরা। এর চেয়ে ভাল কিছু অবশ্য আশাও করেনি ওরা।

হোটেলে ফেরার পথে একটা দোকান থেকে কিছু স্থানীয় পোশাক কিনে নিল।

রাতের খাওয়া শেষ করে কাপড় বদলাল দুজনে। ওমর সাজল ব্যবসায়ী। কিশোর তার সহকারী। সস্তা শার্ট গায়ে দিল, মাথায় খড়ের হ্যাট। কোমরের বেল্টে একটা ম্যাচেটিও গুঁজল।

'ভাল মানিয়েছে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ওমর। 'টাকাপয়সা বেশি নিয়ো না পকেটে। বারে চোর-ডাকাত নিশ্চয় ঢুকবে। মারামারি বাধলে হট্টগোলের মধ্যে কেড়ে নিতে পারে।' কি ভেবে ওর পিস্তলটা সুটকেস থেকে বের করে পকেটে ভরল।

এগারোটা বাজার পনেরো মিনিট বাকি থাকতে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

বারের কাছাকাছি আসতে কানে এল বহু মানুষের হই-চই। ভেতরে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত। দরজার কাছে পৌঁছেছে দুজনে, ঢুকতে যাবে, এ সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল দুজন ল্যানারো। ঘুসোঘুসি শুরু করল। পড়ে গেল একজন। দ্বিতীয়জন টলছে। কোনমতে উঠে দাঁড়াল পড়ে যাওয়া লোকটা। হাতে দেখা গেল একটা বোতল। এতক্ষণ কোথায় ছিল ওটা কে জানে! ছুঁড়ে মারল অন্য লোকটাকে সই করে। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল লোকটা। দেয়ালে বাড়ি লেগে ঝনঝন করে ভাঙল বোতলটা।

বিড়বিড় করে বকতে বকতে আবার ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। আরেকদিকে চলে গেল যে বোতল ছুঁড়েছে সে।

হাসল কিশোর, 'দারুণ জায়গা, ওমরভাই।'

'খুব সাবধান থাকবে।'

আগে আগে ঢুকল ওমর। পেছনে কিশোর। প্রচণ্ড গরম বাতাস এসে ধাক্কা মারল যেন শরীরে। তাতে মেশানো বিয়ার, ঘাম, তামাক আর প্যারাফিন-ল্যাম্পের প্যারাফিনের গন্ধ। বহুকণ্ঠের কোলাহল ছাপিয়ে অ্যাকর্ডিয়ন আর গিটার বাজছে। ঘরের এক প্রান্তে খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়েছে, চেয়ার-টেবিল নেই। সেখানে স্কার্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্প্যানিশ নাচ নাচছে একটা মেয়ে। মুখে কড়া রঙ মাখা। ভারী শরীর। তবে চেহারাটা মিষ্টি। কব্জির মোটা বালা টুং টাং করছে বাড়ি লেগে।

ঘরের বেশির ভাগ লোক ল্যানারো। বারের সামনে টুলে বসেছে

অনেকে। বয়স্ক একজন পুরুষ আর একজন মহিলা মদ ঢেলে দিচ্ছে ওদের। দুজনেরই চুল কালো, চোখও কালো। বাঁশের ছোট ছোট টেবিল ঘিরে দু-তিনজন করে লোক বসেছে। টেবিলে রাখা গেলাস আর বিয়ারের বোতল। একটা টেবিলে চারজন লোক তাস খেলছে।

বার থেকে ওমরও দুটো বোতল আনল। একটা বিয়ার, আরেকটা সোডা। ফিসফিস করে কিশোরকে বলল, 'খেতে না পারলে খাওয়ার ভঙ্গি করো। কিংবা শুধু সোডা ভরে নাও।'

কিশোরের চোখ তখন ভ্যালেন্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একধারে একা বসে আছে একজন লোক। চেয়ারে নেতিয়ে পড়া ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে প্রচুর মদ গিলেছে। দাড়িগোঁফে ভর্তি মুখ। হ্যাটের কানা টেনে দিয়েছে কপালের ওপর। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। পাউচ থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে টানছে। তবে এতে প্রমাণ হয় না এই লোকই ভ্যালেন্তি। বেশির ভাগ ল্যানারো সিগারেট বানিয়ে খায়। থেকে থেকে কাশছেও লোকটা। এটাও স্বাভাবিক। যা ধোঁয়া আর গন্ধ, কিশোরেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে, থেকে থেকে গলা খুসখুস করছে। লোকটার হাতের দিকে তাকাল সে। কোন আঙুলেই আঙটি নেই।

কয়েক মিনিট পরিস্থিতি এক রকম রইল। মেয়েটা নাচছে। লোকে হুল্লোড় করছে। হাততালি দিয়ে বাহবা দিচ্ছে কেউ। মুগ্ধকণ্ঠে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্র্যাভো, ভ্যালেনসিয়া!'

জানা গেল মেয়েটার নাম ভ্যালেনসিয়া।

সারা ঘরে ঘুরছে কিশোরের চোখ। দরজার দিকে তাকাতেই আটকে গেল চোখ।

এদিথ ঢুকেছে! ঝলমলে পোশাক। ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিক।

হ্যাটের কানাটা কপালের ওপর আরও নামিয়ে দিল ওমর। যাতে এদিথ ওকে চিনতে না পারে। কিশোরও তাই করল।

ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল মেয়েটা। তাকাল না। সোজা গিয়ে বসল একা বসে থাকা লোকটার টেবিলে।

উঠে দাঁড়াল লোকটা। টলমল পায়ে গিয়ে বার থেকে নিয়ে এল এক বোতল বিয়ার আর দুটো গেলাস।

কিশোর আর ওমর দুজনের নজরই এখন ওদের দিকে।

ঘনঘন কয়েকবার গেলাসে চুমুক দিল এদিথ আর লোকটা। তারপর প্রায় কপালে কপাল ঠেকিয়ে কথা বলতে লাগল। এত হই-চইয়ের মাঝে ওরা কি বলছে শোনা অসম্ভব। শুনতে হলে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তা-ও সম্ভব নয়। অগত্যা শুধু তাকিয়েই রইল কিশোর।

মিনিটখানেক পর আস্তে করে কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল ওমর। দরজার দিকে ইঙ্গিত করল।

ফিরে তাকাল কিশোর। সেই আমেরিকান লোকটা ঢুকছে। নেলসন। সঙ্গে দাঁতপড়া লোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিশোরদের কাছাকাছি

আরেকটা টেবিল খালি দেখে তাতে গিয়ে বসল।

দ্রুত ভাবনা চলল কিশোরের মাথায়। নেলসনের ঢোকাটা কি কাকতালীয়? নাকি সে-ও দেখতে এসেছে কার সঙ্গে কথা বলে এদিথ? মেয়েটার পিছু নিয়ে ঢুকেছে এই বারে?

কয়েক মিনিট কথা বলল এদিথ আর দাড়িওয়ালা লোকটা। তারপর হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল দুজনে। দরজার দিকে এগোল।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। নিচুস্বরে ওমরকে বলল, 'আপনি বসে থাকুন। নেলসনের দিকে নজর রাখুন। আমি ওদের পিছু নিচ্ছি।'

'একা যাবে?'

'আর কোন উপায় নেই।'

'সাবধানে থাকবে।'

'থাকব। বিপদ বুঝলে ফিরে আসব।'

এদিথরা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর কিশোর বেরোল।

একা বসে নেলসনের দিকে চোখ রাখল ওমর। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে হলো না। কিশোর বেরোনোর মিনিটখানেক পর নেলসন আর তার সঙ্গীও উঠে দরজার দিকে এগোল।

নেলসনের পিছু নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল ওমর। ঠিক এই সময় বোতল আছড়ানোর শব্দ হলো। কাঁচ ভাঙল ঝনঝন করে। চিৎকার করে গাল দিল কে যেন। ঘুসি মারল একজন। মারামারি বাধতে দেরি হলো না আর। পাইকারি মারপিট। যে যেভাবে যাকে পারছে মারছে, চেয়ার-টেবিল আছড়াচ্ছে, বোতল ভাঙছে। নরক গুলজার। এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে দরজার দিকে এগোতে কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেল ওমরের। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে মোটামুটি অক্ষত শরীরে যখন বাইরে বেরোল সে, দেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে নেলসন আর তার সঙ্গী।

চাঁদ ওঠেনি তখনও। কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না। কোনদিকে যাবে? অবশেষে নিরাশ হয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল হোটেলের দিকে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত। কিশোরের আসতে দেরি হবে না এই আশায় ঘরে না গিয়ে বারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা বাজল। এল না কিশোর।

দেড়টা, তাও এল না। দুটোর ঘরের দিকে যখন সরে যেতে লাগল ঘড়ির কাঁটা, কিশোর ফিরল না, দুশ্চিন্তায় ভরে গেল ওর মন। কিন্তু কি করবে? কোনখানে খুঁজতে যাবে কিশোরকে?

মনে মনে দোষারোপ করতে লাগল নিজেকে। কিশোর পিছু নেবে বলল, আর কিছু না ভেবেচিন্তে হুট করে সেও রাজি হয়ে গেল, উচিত হয়নি মোটেও। বরং কিশোরকে বারে বসিয়ে রেখে তার নিজের যাওয়া উচিত ছিল ওদের পেছনে।

বেরিয়ে কোনও লাভ নেই এখন। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ভারী পায়ে

নিজের ঘরে ফিরে এল ওমর।

সাত

এদিথ আর দাড়িওয়ালা লোকটার পিছু নেয়ার সময় কিশোরও কোন বিপদের আশঙ্কা করেনি। করলেও ঝুঁকিটা নিতেই হত। ভ্যালেন্তির খোঁজ পেতে হলে এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে সে, এই লোকই কোল প্যাসিয়ানো। ছদ্মবেশী ভ্যালেন্তি যদি নাও হয়, তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এর।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাত। গুমোট গরম। আকাশটা যেন কালো মখমলে ঢাকা একটা ছাত। তাতে উজ্জ্বল মণির মত জ্বলছে তারাগুলো। কালো বনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে হলদেটে এক বিচিত্র আভা। তারার সঙ্গে যোগ দিতে চাঁদও উঠে আসছে, বুঝতে পারল সে।

সামনের ছায়ামূর্তি দুটোকে লক্ষ্য করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিশোর। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। ফাঁকা মেইন রোডের শেষ মাথায় পৌছতে দেরি হলো না। দৃষ্টি সামনের দিকে। সামনের দুজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক গতিতে হেঁটে চলল।

পথের দুধারে শেষ হয়ে এল বাড়িঘর। সামনে ছোট ছোট গাছ। খেত। কিসের খেত, অন্ধকারে চিনতে পারল না। গাছের ছায়া এসে পড়েছে পথের ওপর। ঢেকে দিয়েছে পথটা। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না আর। কিন্তু সামনেই আছে ওরা, জানা কথা। না থেমে এগিয়ে চলল কিশোর। আরও এক সমস্যা দেখা দিল। বনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মশার অত্যাচার।

বাঁয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নদী চোখে পড়ছে। তবে বেশ দূরে।

আধমাইল মত এসে দুভাগ হয়ে গেল রাস্তাটা। দুটোর মধ্যে যেটা বেশি চওড়া সেটা ঢুকেছে জঙ্গলে। আর দ্বিতীয়টা, সরু একটা পায়েচলা পথ এগিয়ে গেছে নদীর দিকে। এতক্ষণ ছায়ামূর্তি দুটোকে অন্ধকারে চোখে না পড়লেও নিশ্চিন্তে এগিয়েছে, জানত ওরা সামনেই আছে। কিন্তু এখন পড়ে গেল দ্বিধায়। ওদের দেখা যাচ্ছে না। কোন্ রাস্তা ধরে গেছে, বোঝার উপায় নেই।

কান পাতল সে। মনে হলো, সরু রাস্তাটায় কথা শুনতে পেল। এগোল সেই পথ ধরেই।

বেশিদূর যেতে হলো না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা সাদা রঙ করা বাড়ির দেয়াল চোখে পড়ল চাঁদের আলোয়। গেট খোলার মৃদু শব্দ হলো।

গন্তব্যে পৌছে গেছে। অনেক বেশি সাবধানতা দরকার এখন। পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। গাছপালায় ঘেরা বাড়িটার আরও কাছে চলে এল। নানা রকম ফুলগাছের বাগান। লতায় ছাওয়া একটা বাংলোবাড়ি। এই এলাকায় যত বাড়ি দেখেছে এতদিন, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুন্দর। তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে গাছপালা, কেবল সামনের দিকটা খোলা,

পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে। কাঠ আর চারাগাছ দিয়ে একটা জেটি মত তৈরি করা হয়েছে পানির কিনারে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না ওখানে ক্যানূ বা ভেলা বাঁধা আছে।

স্রোতের শব্দ কানে আসছে। চাঁদের আলোয় রূপালী হয়ে গেছে পানি। বনের মধ্যে জোনাকির অভাব নেই। টিপটিপ জ্বলছে আর নিভছে।

বাড়িটার দিকে তাকাল আবার সে। কোন মানুষ দেখা গেল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করবে।

ভেবেচিন্তে পা বাড়াল কিশোর। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা বোর্ডে লেখা বাড়িটার নাম:

ক্যাসা কারাদোনা।

নিচে লেখা: সে প্রহিবে লা এনত্রাদা। মানে হলো 'প্রবেশ নিষেধ'।

গাছের ফাঁকে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। কথা শোনা যাচ্ছে। কারা বলছে দেখার জন্যে একদিকে সরে গেল কিশোর। বাড়ির একধারে একটা ছোট আঙিনা। তাতে নানা রকম ফুলগাছ, ফুলের ঝাড়। বাগানে বেরোনোর দরজাটা খোলা। বেশ কিছু সুন্দর আসবাবপত্র রাখা হয়েছে বাগানে—একটা টেবিল, একটা লম্বা বেঞ্চ, আর কিছু চেয়ার। লণ্ঠনটা টেবিলে রেখেছে।

লম্বা বেঞ্চটায় বসল প্যাসিয়ানো আর এদিথ। ঘর থেকে মদের বোতল আর গেলাস এনেছে লোকটা। বোতলের ছিপি খুলে ফেলেছে। মদ ঢালছে গেলাসে। অসংখ্য মথ আর নিশাচর পোকা উড়ছে আলোটাকে ঘিরে। সব কিছু মিলিয়ে দেখার মত দৃশ্য।

কিন্তু আপাতত এই দৃশ্যের প্রতি আগ্রহ নেই কিশোরের। সে শুনতে চায় কি কথা বলছে দুজনে। দু'চারটে টুকরো-টাকরা শব্দ ছাড়া স্প্যানিশ বোঝে না সে। তবু অনুমানে যদি কিছু বোঝা যায় এই আশায় শোনার জন্যে আরেকটু কাছে এগোল ওদের। কিন্তু এতটাই নিচু স্বরে কথা বলছে দুজনে, ভাষা জানলেও বোঝা কঠিন হয়ে যেত ওর জন্যে।

আপাতত আর কিছু করার নেই এখানে। কোথায় যায় ওরা দেখতে চেয়েছিল। দেখেছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে, এই সময় কানে এল পায়ের শব্দ। চট করে গাছের ছায়ায় সরে গেল সে। গটমট করে এগিয়ে এল আরেক তরুণী। ঝটকা দিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। কিশোরের চেনা। খানিক আগে দেখে এসেছে বার লুজিয়ানোতে। নর্তকী ভ্যালেনসিয়া।

ও এখানে কেন? কৌতূহল হলো কিশোরের।

প্যাসিয়ানোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। স্প্যানিশ ভাষায় উঁচু স্বরে কথার তুবড়ি ছোটাল। কথা না বুঝলেও ভ্যালেনসিয়া যে ভীষণ রেগে গেছে এটুকু আন্দাজ করতে পারল কিশোর।

মহাখাপ্পা হয়ে ভ্যালেনসিয়াকে ঢুকতে দেখে চমকে গেল এদিথ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে হলো দৌড় মারবে। খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল প্যাসিয়ানো। টেনে বসিয়ে দিল আগের জায়গায়।

প্যাসিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল নাচাতে নাচাতে বকেই চলল

ভ্যালেনসিয়া। শুনতে পাচ্ছে কিশোর, এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। ঝগড়াটা মূলত প্যাসিয়ানো আর ভ্যালেনসিয়ার। এদিথ ভয়ে কুঁকড়ে আছে। কি নিয়ে ঝগড়া, অনুমান করতে পারছে কিশোর। সেই পুরাতন কাহিনী—ঈর্ষা; দুই নারী এক পুরুষ।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ভ্যালেনসিয়ার কণ্ঠ। চিৎকার করছে। ওকে থামানোর জন্যে গেলাসে মদ ঢেলে বাড়িয়ে ধরল প্যাসিয়ানো। এক থাবায় ওটা ফেলে দিল ভ্যালেনসিয়া। আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকাল এদিথের দিকে।

প্রমাদ গুণল কিশোর। চুলোচুলি না শুরু করে দেয়।

বারে নেচেছে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। ক্লান্ত। মারামারির মধ্যে আর গেল না ভ্যালেনসিয়া। বসে পড়ল একটা চেয়ারে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার তাকাল প্যাসিয়ানোর দিকে। কি যেন বলতে লাগল। এবার আর চিৎকার করল না।

বদলে যাওয়া কণ্ঠস্বর শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে অনুমান করতে পারল কিশোর, ঝগড়ার কথা নয়, অন্য কিছু বলছে ভ্যালেনসিয়া। কি বলছে বুঝল না। 'বার লুজিয়ানো' নামটা দুবার উচ্চারণ করতে শুনল।

সতর্ক হয়ে গেল প্যাসিয়ানো। দ্রুত চলে গেল ঘরের ভেতর।

কথা বুঝলে নাহয় আরও শোনা যেত। কিছুই বোঝা যায় না। অহেতুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেয়ে লাভ কি? হোটেলে ফিরে চলল কিশোর।

তেরাস্তার মুখে এসে চওড়া রাস্তাটা কোথায় গেছে দেখার কৌতূহল হলো। একবার দ্বিধা করে রওনা হলো ওটা ধরে।

খুট করে পেছনে শব্দ হতেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। একটা ছায়ামূর্তি ওকে মারার জন্যে হাত তুলেছে। বাধা দেয়া কিংবা সরে যাওয়ার আগেই নেমে এল হাতটা। কিশোরের মনে হলো, বাজ পড়ল মাথায়। তীব্র উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল যেন মগজে। বনবন করে ঘুরতে লাগল আলোটা। কমলা রঙ হয়ে গেল প্রথমে, কমলা থেকে লাল। তারপর ঘন অন্ধকার।

আট

সারারাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করে ভোরের দিকে বোধহয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল ওমরের, দরজায় ঘনঘন করাঘাতের শব্দে চমকে জেগে উঠে বসল বিছানায়। তখনও অন্ধকার রয়ে গেছে। মোম জ্বেলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ইনতেনদেন্তে। গায়ে ইউনিফর্ম জ্যাকেট, পরনে পাজামা। তাড়াহুড়োয় বদলানোর সময় পাননি। পেছনে দাঁড়ানো ভ্যালদেজ। চুল উস্কখুস্ক। চোখে ঘুম। জোর করে তাকে বিছানা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ওমর, 'কি ব্যাপার?'

জবাব দিলেন পুলিশ অফিসার, 'আপনার বন্ধু, সেনর।'
'কিশোর? কি হয়েছে ওর?'
'অনেক বেশি মদ খেয়েছিল কাল রাতে। ছেলেমানুষ তো, সহ্য করতে পারেনি।'
'মদ! ও মদ খায় না।'
'টলে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে।'
'টলে পড়েছে? তা কি করে সম্ভব!' হঠাৎ হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল ওমরের। আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ বাড়ি মারেনি তো? বেঁচে আছে?'
'তা আছে। তবে আঘাতটা গুরুতর। বাড়ি মারার সম্ভাবনাটাও বাদ দিইনি আমরা। চোর-ডাকাতের পাল্লায়ও পড়ে থাকতে পারে। একটা টাকাও নেই পকেটে।'
'ও কোথায়?'
'থানায়। এত বেশি লোক জখম হয় এখানে, ব্যথা পেয়ে বেহুঁশ হয়, তাদের জন্যে আলাদা একটা ঘরই রাখতে হয়েছে আমাদের। একটা মেয়ে দেখতে পেয়ে আমার এক এজেন্তেকে বলেছে। একজন ল্যানারোর সাহায্যে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে এজেন্তে। ডাক্তার দেখিয়েছি। যখন বলল মরেনি, আপনাকে খবর দিতে এলাম।'
'কোথায় পাওয়া গেছে ওকে?'
'রাস্তায়।'
'রাস্তার কোনখানে?'
'মেইন রোডের শেষ মাথায়। আপনি কি দেখতে যাবেন?'
'অবশ্যই। চলুন।'
তাড়াতাড়ি একটা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে, জুতো পরে, দুজনের সঙ্গে নিচে নেমে এল ওমর। ভ্যালদেজ বলল, কফি তৈরি করে আনছে, খেয়ে যেতে।
অপেক্ষা করতে রাজি হলো না ওমর।
কয়েক মিনিটের মধ্যে ইনতেনদেন্তের সঙ্গে ছোট একটা বদ্ধ ঘরে এসে ঢুকল। ময়লা ম্যাট্রেসের ওপর উঠে বসেছে কিশোর। ছাই হয়ে গেছে মুখ। মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে আর মুখে শত শত লাল দাগ। সব মশার কামড়। অচেতন অবস্থায় পেয়ে মনের সুখে কামড়িয়েছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। ওমরকে দেখে মলিন হাসি হাসল।
ওর পাশে গিয়ে বসল ওমর। 'কথা বলার দরকার নেই। পরে শুনব সব।' পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোটেলের বিছানায় এরচেয়ে আরামে থাকবে। নিয়ে যাব?'
'নিশ্চয়। এখানে থেকে কষ্ট করে লাভ কি?'
'জখম কতটা খারাপ? ডাক্তার কি বললেন?'
'ভালই জখম। শুকাতে সময় লাগবে।'
'তা মেয়েটা কে? যে ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল?'

'এাদথ।'

ভুরু কুঁচকে গেল ওমরের। 'ভ্যালদেজ হোটেলের রিসেপশনিস্ট?'

'হ্যাঁ। আপনি বসুন। ওকে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেলেন ইনতেনদেন্তে। কয়েক মিনিট পর সঙ্গে দুজন পুলিশ নিয়ে আবার ঢুকলেন। ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছে। ওদের সাহায্যে কিশোরকে হোটেলে বয়ে নিয়ে এল ওমর। কাপড় বদলে পাজামা আর শার্ট পরিয়ে দিল।

কফি নিয়ে এল ভ্যালদেজ। ট্রে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ওমরের দিকে তাকিয়ে আচমকা প্রশ্ন করলেন ইনতেনদেন্তে, 'আপনার কোনটা মনে হয়—পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছে, না বাড়ি মেরেছে?'

'বাড়ি মেরেছে।'

'হুঁম্! লোকটাকে খুঁজে বের করবই আমি।' আড়চোখে ওমরের দিকে তাকালেন অফিসার, 'এখানে আপনাদের কোন শত্রু নেই তো?'

জবাব দেবার আগে দ্বিধা করল ওমর। কথা আদায় করার সুযোগটা ছাড়ল না, 'ভ্যালেন্তি নামে একটা লোকের সঙ্গে সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে। নিশ্চয় চেনেন তাকে?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন ইনতেনদেন্তে। মাথা নাড়লেন, 'মনে করতে পারছি না। কি নিয়ে গোলমাল হয়েছে তার সঙ্গে?'

'এখানে না। আমেরিকায় থাকতে হয়েছে। শেষ খবর যা পেয়েছি, সে নাকি ক্রুজোয়াড়োতে চলে এসেছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার মাথা নাড়লেন ইনতেনদেন্তে, 'কই, না তো!'

'এলে আপনার মনে থাকত?'

'নিশ্চয় থাকত। মনে রাখাই আমার কাজ। বাইরের কেউ এলে, কাগজপত্রে সীল দিয়ে নিয়ে গেলে মনে থাকতই।'

'ও বাইরের কেউ নয়। এ দেশী।'

'তাহলে আর দেখব কি করে? এ দেশের নাগরিক হলে তো কাগজ সীল মারাতে আসতে হবে না আমার কাছে।'

কিশোর সুস্থ হলে তার জবানবন্দি নিতে আসবেন বলে দুই সহকারীকে নিয়ে চলে গেলেন অফিসার।

গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে কিশোরের গায়ের মশার কামড়গুলো ডলে দিল ওমর। কফি খাওয়াল। 'এখন কথা বোলো না।'

'অনেকটা সুস্থ লাগছে।'

'তবু। ঘুমাও।'

'পারব না। মাথায় যা ব্যথা। মনে হচ্ছে জখমটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ঘুম আসবে না। মেরেই ফেলতে চেয়েছিল নাকি কে জানে!'

'কে? দেখেছ নাকি?'

'না। চেহারা দেখিনি।'

'অনুমানও করতে পারছ না?'

'না।'

'রাস্তায় কাউকে দেখোনি?'

'কোন রাস্তায়?'

'মেইন রোডে?'

'মেইন রোডে ঘটেনি তো ঘটনাটা। বনের মধ্যে ছিলাম তখন। নিশ্চয় বেহুঁশ করে মেইন রোডে এনে ফেলে গেছে।'

ঘটনাটা কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

ওমর জিজ্ঞেস করল, 'কটা বাজে তখন বলতে পারো?'

'এই বারোটা হবে। ঘড়ি দেখিনি।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা দোলাল ওমর। 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই নেলসন আর তার দোস্তও বেরিয়ে গিয়েছিল। পিছু নিতে উঠলাম। এই সময় বারের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দিল ল্যানারোরা। বেরোতে দেরি হয়ে গেল আমার। বেরিয়ে দেখি নেলসনরা গায়েব। এমন হতে পারে, নেলসন তোমার পিছু নিয়েছিল। সে-ই বাড়ি মেরে বেহুঁশ করেছে।'

'তা পারে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'যদি আমাদের মতই ভ্যালেন্তির পিছু নিয়ে থাকে সেও, ফর্মুলাগুলো চায়। আমাদের বসিয়ে দিতে পারলে ঝামেলা অনেক কমবে ওর।'

'তা ঠিক,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে ওমর বলল, 'কাল রাতে তোমার পিছু নেয়ার সম্ভাবনা যে তিনজনের, তারা হলো—নেলসন, তার সঙ্গের দাঁতপড়া লোকটা এবং ভ্যালেনসিয়া। তোমাকে বাড়ি মারার ব্যাপারে ভ্যালেনসিয়াকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়, কারণ তার কোন স্বার্থ দেখতে পাচ্ছি না। দাঁতপড়া লোকটা টাকা খেয়ে নেলসনের হয়ে কাজটা করে দিতে পারে। কিংবা নেলসন নিজেই এ কাজ করেছে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, তোমার পকেট থেকে টাকা সরিয়ে ঘটনাটাকে সাধারণ ডাকাতির রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আসলে ডাকাতি নয় এটা। এখন আরেকভাবে চিন্তা করে দেখা যাক, ভ্যালেনসিয়া কি এমন কথা বলেছে প্যাসিয়ানোকে যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে গেল সে?'

'সেটা তো আমিও ভাবছি।'

'এমন হয়নি তো, তোমাকে লুকিয়ে প্যাসিয়ানোর বাড়িতে চোখ রাখতে দেখেছে ভ্যালেনসিয়া, সেটা জানিয়েছে প্যাসিয়ানোকে, প্যাসিয়ানো তখন তার চাকরকে পাঠিয়েছে তোমাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করার জন্যে?'

'করতে পারে। তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম, কোন চাকরকে বেরোতে দেখিনি। মনেই হয়নি বাড়িতে আর কোন লোক আছে। যাই হোক, আমার প্রশ্ন হলো, পিটিয়ে বেহুঁশ করার পর নদীতে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে রাস্তায় এনে রাখতে গেল কেন? শুধু শুধু ঝামেলা করা না এটা?'

'আমার ধারণা ওরা ভেবেছে তুমি মরে গেছ। বাড়ির কাছে তোমাকে পাওয়া গেলে প্যাসিয়ানোর ওপর সন্দেহ জাগতে পারে ইনতেনদেন্তের।

আবার লাশটা নদীতে ফেলে দিলেও ঝামেলা। আমি গিয়ে পুলিশকে জানাব, তুমি নিখোঁজ হয়েছ। ওদেরকে বলব, কাল রাতে প্যাসিয়ানোর পিছু নিয়ে বার থেকে বেরিয়েছ। এ ক্ষেত্রেও সন্দেহ জাগবে পুলিশের। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবে। সেজন্যে এমন জায়গায় ফেলে গেছে যাতে তার ওপর কারও সন্দেহ না হয়। ভাবছি, এ সব কথা এদিথ কতখানি জানে?'

'তাকে জিজ্ঞেস করেন না গিয়ে? একটা ছুতো তো আছে। মেইন রোডে সে-ই আমাকে পড়ে থাকতে দেখেছে।'

হাতের তালুতে থুঁতনি রাখল ওমর। ভাবল। আবার সরিয়ে নিল হাতটা। 'করলেই কি আর বলবে নাকি? বোকোকে পেলে এখন কাজ হত, ওকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাতে পারতাম। ওকে কিভাবে খবর দেয়া যায় ভাবছি। আরও একটা কাজ করব, তোমাকে যেখানে বাড়ি মারা হয়েছে সেখানটা দেখে আসব। সূত্র পাওয়া যেতে পারে। ঠিক কোন্ জায়গায় তোমাকে মেরেছে, বুঝিয়ে বলো তো?'

বলল কিশোর।

'নরম মাটি?'

'একেবারেই নরম।'

'তাহলে পায়ের ছাপ থাকবে।'

'থাকলেও আলাদা করে চেনা কঠিন হবে। রাস্তা যেহেতু, নিশ্চয় লোক চলাচল আছে। অনেকের ছাপই থাকবে।'

'তবু, দেখব। বোকোকেও দরকার। মিস্টার বুমারকে একটা খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিভাবে?'

'হোটেলের মালিককে বলে একজন লোক জোগাড় করে চিঠি দিয়ে পাঠাব বুমারের কাছে। কথা অনেক হলো। এবার তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। আমি যাই।'

নিচে নেমে বসার ঘরে ভ্যালদেজকে দেখতে পেল ওমর। তাকে জিজ্ঞেস করল, এমন কোন লোক পাওয়া যাবে কিনা যাকে মিস্টার বুমারের বাড়িতে পাঠানো যায়।

ভ্যালদেজ বলল, যাবে। ওই ইনডিয়ান কিশোরকে ডেকে আনল সে। ওমরকে বলল, 'দিন, কি দেবেন ওর কাছে।'

ছোট একটা চিঠি লিখে, খামে ভরে ছেলেটার হাতে দিল ওমর।

চলে গেল ছেলেটা।

ভ্যালদেজকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসেপশনে ঢুকল ওমর। এদিথ তখনও আসেনি। মাত্র সাতটা বাজে। আসার কথাও নয়। ওর ডিউটি শুরু হতে দেরি আছে।

ওর জন্যে অপেক্ষা করবে কিনা ভাবল সে। করে কি হবে? কিছু জিজ্ঞেস করলে হয় বলবে না, নয়তো মিথ্যে বলবে। বোকোকেই যখন মিথ্যে বলেছে, ওকে বলতে আর দোষ কি? ও বলেছিল কোল প্যাসিয়ানো কোথায় থাকে

জানে না। কিন্তু জানে যে কাল রাতেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। নাকি সত্যি ও জানত না? কাল রাতে প্রথম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে প্যাসিয়ানো? কিশোরকে পড়ে থাকতে দেখেছে সে। এত সকালে কেন বেরিয়েছিল? মেইন রোডের শেষ মাথায় গিয়েছিল কি করতে?

প্রশ্নগুলো দ্বিধায় ফেলে দিল ওমরকে।

প্রশ্ন আরও আছে। কোল প্যাসিয়ানোই ভ্যালেন্তি কিনা সেটা কি জানে এদিখ? সে বোকোকে বলেছে প্যাসিয়ানোর চিঠি পোস্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করে তাকে পৌঁছে দেয়। এটার কি প্রয়োজন? প্যাসিয়ানো নিজে পোস্ট অফিসে যায় না কেন? তারমানে কোথাও একটা ঘাপলা আছে। হতে পারে, প্যাসিয়ানো আর ভ্যালেন্তি সত্যি আলাদা লোক। দুজনের যোগাযোগ আছে। এদিখ চিঠিগুলো সংগ্রহ করে প্যাসিয়ানোকে দেয়, প্যাসিয়ানো ভ্যালেন্তিকে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ভ্যালেন্তিকে খুঁজে পেতে হলে প্যাসিয়ানোর ওপর নজর রাখা জরুরী। আরও একটা প্রশ্ন, খামের ওপর ঠিকানায় কি ভ্যালেন্তির নাম লেখা থাকে, না অন্য কারও?

এ সব প্রশ্নের অনেকগুলোর জবাবই জানা আছে এদিথের। কিন্তু ওকে বলবে কি?

চিন্তা-ভাবনা করে আগের সিদ্ধান্তেই অটল রইল ওমর—ও নিজে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, বোকোকে দিয়েই করাবে। ভ্যালেনসিয়ার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। কয়েকটা প্রশ্ন করবে। তবে সবার আগে দেখতে যাবে কিশোরকে যেখানে মারা হয়েছে সেই জায়গাটা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে মেইন রোড় ধরে হাঁটতে শুরু করল সে।

নয়

তেরাস্তার মুখটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না ওমরের। নরম মাটিতে অসংখ্য ছাপ পড়ে আছে—নারী-পুরুষ উভয়েরই, যাওয়া এবং আসার। একখানে খানিকটা জায়গার মাটি কেমন দেবে যাওয়া। নিশ্চয় এখানেই পড়ে গিয়েছিল কিশোর। পায়ের ছাপ এ জায়গাতেও আছে।

ভাল করে দেখতে লাগল ওমর। এক ধরনের আঁকিবুঁকি দাগ পড়েছে মাটিতে। তাতে বোঝা যায় জুতোর তলা খড় কিংবা বেতের তৈরি। দাগগুলো বেশ গভীর। নিচু হয়ে ভারী কিছু তুলতে হয়েছে জুতোর মালিককে, সেজন্যেই অমন গভীর হয়ে পড়েছে। ভারী কিছু মানে কি কিশোরের অজ্ঞান শরীর? কি জুতো পায়ে দিয়েছিল লোকটা, ছাপ দেখে তাও বোঝা যায়; ঘরে তৈরি মোকাসিন। এই এলাকার গরীব লোকেরা পরে।

খোঁজাখুঁজি অনেক করল, কিন্তু আর কোন সূত্র পেল না ওমর। ফিরে চলল। শহরে ঢুকে বার লুজিয়ানোর দিকে এগোল। ভ্যালেনসিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

বারের দরজা খোলা। মেঝে ঝাড়ু দিয়ে, মুছে পরিষ্কার করছে একজন লোক। আগের রাতে এই লোকই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মদ সরবরাহ করছিল। সাদামাঠা চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা করুণ। তবে ওমর যখন তাকে 'বুয়েনস দিয়াস' জানিয়ে কথা বলল, খুব ভদ্র ব্যবহার করল লোকটা। জানাল ভ্যালেনসিয়া তার মেয়ে। ওমরকে বসতে বলে ওপরতলায় ডেকে আনতে গেল মেয়েকে।

নিচে নেমে এল ভ্যালেনসিয়া। ঘুমে জড়ানো চোখ। দিনের আলোয় অন্য রকম লাগছে তাকে। রাতের সপ্রতিভ ভাবটা নেই। চোখমুখ ফোলা, তাতে ক্লান্তির ছাপ। বিষণ্ন, বিধ্বস্ত চেহারা। ল্যানারোদের মনোরঞ্জনের জন্যে নাচতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় ওকে, সেজন্যেই এই অবস্থা। মায়াই লাগল ওমরের। বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল।

রাজি হলো ভ্যালেনসিয়া।

বিয়ার এনে দিল ওর বাবা।

ওমর বলল, 'আপনার সাহায্য দরকার আমার, সেনোরিতা। কাল রাতে এখানে এসেছিলাম আমি...'

'দেখেছি।'

'আমার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।'

'তাকেও দেখেছি।'

'এ সব বারেটারে ঢোকার তার অভ্যেস নেই। তাই রাতে এখান থেকে বেরিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিল। কে জানি তার মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে গেছে।'

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সব সময়ই ঘটে এ রকম। টাকাপয়সা চুরি গেছে?'

'পকেট সাফ।'

'ঠিকই আছে। ডাকাতি। কিন্তু আমাকে এ সব বলার মানে কি?'

'আমি মনে করলাম আপনি হয়তো কিছু জানতে পারেন। রাতে আপনাকেও রাস্তায় বেরোতে দেখেছি আমি,' শেষ কথাটা মিথ্যে বলল ওমর। কিশোরের দেখাটাই নিজের বলে চালিয়ে দিল।

'আমি কিছু দেখিনি।'

'কাউকে না, যে এ রকম একটা কাজ করে থাকতে পারে?'

'আমি কাল রাতে বেরোইনি,' সরাসরি মিথ্যে বলল ভ্যালেনসিয়া। 'আপনি কাকে দেখেছেন কে জানে।'

'মনে হলো আপনাকেই দেখেছি। সেনর প্যাসিয়ানোর বাড়িতে গিয়েছেন।'

'ওরকম কোন সেনরকে আমি চিনিই না,' গেলাসের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যালেনসিয়া।

'চেনেন না? কাল রাতে এই বারে মদ খেতে এসেছিল সে। দাড়ি আছে।'

'কত লোকই তো আসে। সবাইকে আমি চিনি না।'

'আমি ভেবেছি সেনর প্যাসিয়ানো এখানকার নিয়মিত কাস্টোমার। তাই...'

'ওই নাম কখনও শুনিনি আমি,' ঝাঁজাল কণ্ঠে কথাটা বলে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেনসিয়া। 'আপনার কথা শেষ হয়ে থাকলে এখন যেতে পারেন। আমার ঘুম পুরো হয়নি।'

বিয়ারের দাম চুকিয়ে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল ওমর। এবার কি করবে? বোকো না আসাতক আর কিছু করার নেই। হোটেলে ফিরে চলল। মনে প্রশ্ন। মিথ্যে বলল কেন ভ্যালেনসিয়া? পুলিশের ঝামেলা থেকে প্যাসিয়ানোকে বাঁচানোর জন্যে? তাই হবে। নিশ্চয় প্যাসিয়ানোকে ভালবাসে সে। নাকি কোন কারণে ভয় করে?

হোটেলে ফিরে দেখল কিশোর ঘুমাচ্ছে। ওকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দে নিচে নেমে এল আবার। একধারে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে লাগল চুপচাপ। অপেক্ষা করতে লাগল বোকোর আসার।

আধঘণ্টা পর ঘরে ঢুকল মুসা আর রবিন। ওকে দেখে ছুটে এল। প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল দুজনে, 'কিশোরের কি অবস্থা, ওমরভাই?'

'অনেকটা ভাল। ঘুমোচ্ছে।'

সিঁড়ির দিকে ছুটল দুজনে।

কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকল বোকো। ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে বেঁধে রেখে আসতে দেরি হয়েছে। জানাল, চিঠি পেয়ে আর একমুহূর্ত দেরি করেননি সেনর বুমার। পাঠিয়ে দিয়েছেন ওকে।

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে বোকোকে জানাল ওমর। তারপর বলল, 'তোমার সাহায্য দরকার আমার, বোকো। জানতে চাই কে ওকে মেরেছে, কেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোল প্যাসিয়ানো অনেক কিছু জানে। ওর আসল নাম প্যাসিয়ানো কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমার ধারণা ও একজন অপরাধী। আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছে। এদিথের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে তোমাকে। কিশোরকে মারার ব্যাপারে সে কিছু জানে কিনা বের করতে হবে। পোস্ট অফিস থেকে প্যাসিয়ানোর যে চিঠিগুলো নিয়ে আসে, তাতে কার নাম লেখা থাকে তাও জিজ্ঞেস করবে। পারবে?'

'সি, সেনর।'

'এদিথ তোমাকে বলবে?'

'বলবে,' দাঁত বের করে হাসল বোকো, 'অনেক দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার খাতির।'

মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিল ওমর। 'নাও, কাজে লাগতে পারে। যত ইচ্ছে কথা বলো ওর সঙ্গে। তাড়াহুড়ো নেই। আমি এখানে আছি।'

'সব জেনে তবেই আসব,' উঠে চলে গেল বোকো।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগল ওমর।
খুব বেশি সময় লাগাল না বোকো, ফিরে এল। ওর হাসি দেখেই বোঝা গেল, কাজ হয়ে গেছে।
'সব বলে দিয়েছে আমাকে এদিথ,' গর্বের সঙ্গে বলল বোকো। চেয়ারে বসল। 'চিঠিতে পল ভ্যালেন্তি নাম লেখা থাকে। ভ্যালেন্তি প্যাসিয়ানোর বন্ধু।'
হাসি ফুটল ওমরের ঠোঁটে। আসলেই কি তাই? বন্ধু? নাকি দুজনে একই লোক? প্যাসিয়ানোই ছদ্মবেশী ভ্যালেন্তি?
'চিঠি আসে কোন দেশ থেকে, জেনেছ?'
'জেনেছি,' মাথা ঝাঁকাল বোকো, 'আমেরিকা। আজও একটা চিঠি এসেছে। রাতে সেটা ক্যাসা কারাদোনায় নিয়ে যাবে এদিথ।'
'বার লুজিয়ানোতে নয় কেন?'
'নাহ্, বারে আর যাবে না,' হাসল বোকো। 'ভ্যালেনসিয়ার মুখ দেখতে চায় না আর। বুঝলেন না, দুই মেয়েমানুষের গণ্ডগোল। ভ্যালেনসিয়া ভাবছে প্যাসিয়ানোকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় এদিথ।'
'আসলে কি তাই?'
জোরে জোরে মাথা নাড়ল বোকো, 'মোটেও না।'
'আর কি জানে এদিথ?'
'ও কসম খেয়ে বলেছে, সেনর কিশোরকে মারার ব্যাপারে সে কিছু জানে না। অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা দেহটার ওপর হোঁচট খেয়ে পড়েছিল।'
'অত ভোরে ওখানে গিয়েছিল কেন?'
'প্যাসিয়ানোর বাড়ি থেকে আসছিল।'
'তাহলে সে সত্যি জানে না কে কিশোরকে মেরেছে?'
'না।'
'রাস্তায় কাউকে দেখেনি?'
'না। তবে ক্যাসা কারাদোনা থেকে বেরোনোর আগে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছে প্যাসিয়ানোর চাকর জেমসকে। ওর কাজই হলো বাড়ি পাহারা দেয়া। বাড়ির কাছে কেউ গেলেই দূর দূর করে তাড়ায়। লোকজন একেবারে দেখতে পারে না।'
'সে কিছু বলেছে এদিথকে?'
'না। ফিরেও তাকায়নি।'
'থ্যাংক ইউ, বোকো। অনেক সাহায্য করলে। একটা কথা, এদিথ তোমাকে পছন্দ করে, না?'
হাসল বোকো। 'করে।'
'খুব?'
'খুউব।'
'বিয়ে করে ফেলছ না কেন তাহলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোকো। 'সেনর বুমারের ভয়ে। মেয়েমানুষ দেখতে পারেন না তিনি। বিয়ে করলে এদিথকে অর্কিড ভিলায় নিয়ে যেতে হবে। সেটা তিনি পছন্দ করবেন না।'

'তোমাকে যে টাকা দিলাম সেটা এদিথকে দিয়েছ?'

'দিয়েছি। খুব খুশি হয়েছে। নতুন কাপড় কিনবে। নতুন পোশাক ওর খুব পছন্দ।'

'তুমি এখন কি করবে?'

'কি করব মানে?'

'ভিলায় ফিরবে কখন?'

'তাড়া নেই। সেনর বুমার বলে দিয়েছেন, কাল গেলেও চলবে। আমাকে আপনাদের দরকার হতে পারে, তাই থাকতে বলেছেন।'

হাসল ওমর। 'তারমানে শহরেই থাকবে। আবার দেখা করবে এদিথের সাথে।'

হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে গেল বোকোর, 'ধরে ফেলেছেন, সেনর।'

'প্যাসিয়ানোর কথা আর কি কি জানে এদিথ, জানার চেষ্টা কোরো। দরকার হয় আরও টাকা দিয়ো ওকে।' মানিব্যাগ বের করল ওমর। 'এই নাও।'

'সি, সেনর,' উঠে চলে গেল বোকো।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। ভ্যালেন্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। ফর্মুলাটা কোথায়? প্যাসিয়ানো আর ভ্যালেন্তি এক লোক হলে ক্যাসা কারাদোনাতেই আছে। লুকিয়ে রেখেছে কোনখানে। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে পকেটে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি নেবে না।

ওপরতলায় উঠে এল সে। ঘুম ভেঙেছে কিশোরের। সুপ দিয়ে গেছে ভ্যালদেজ। সেটা খাচ্ছে। দুই পাশে বসে আছে মুসা আর রবিন।

পায়ের ছাপ দেখে কি বুঝেছে, ভ্যালেনসিয়া কি বলেছে, এদিথের কাছে কি কি জেনে এসেছে বোকো, সব তিন গোয়েন্দাকে জানাল ওমর।

'কি করবেন এখন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আপাতত কিছু করা যাবে না। দিনের বেলায় ক্যাসা কারাদোনায় ঢুকতে গেলে জেমসের চোখে পড়ে যাব। তাতে সাবধান হয়ে যাবে ভ্যালেন্তি। ফর্মুলা নিয়ে গায়েব হয়ে যাবে। এ কদিনের কষ্ট সব বিফলে যাবে আমাদের। বরং, রাতে, এদিথ যখন চিঠি পৌঁছে দিতে যাবে, তাকে অনুসরণ করব আমি।'

'আমার মত মাথায় বাড়ি খেতে চান?'

'কে বাড়ি মারে সেটা দেখতে চাই। যেহেতু জানা হয়ে গেছে মাথায় বাড়ি মারার লোক আছে, তোমার মত অসতর্ক অবস্থায় পাবে না আর আমাকে। বরং মারতে এলে কপালে দুঃখ আছে তার আজ।'

'আর যদি ভ্যালেন্তিকে পেয়ে যান?'

'ফর্মুলাটা আদায় করার চেষ্টা করব।'

'আশা করছি বিকেল নাগাদ মাথার ব্যথা কমে যাবে। তাহলে আমিও যেতে পারব আপনার সঙ্গে।'

'কোন প্রয়োজন নেই। তোমার বিশ্রাম দরকার। নিতে থাকো। দু'চারদিন তুমি বিছানা থেকে না উঠলেও আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমাকে সাহায্য করার জন্যে মুসা আর রবিন তো আছেই, চাইলে বোকোকেও পাওয়া যাবে।'

দশ

দ্রুত কেটে গেল দিনটা। ইতিমধ্যে কিশোর কেমন আছে একবার এসে দেখে গেলেন ইনতেনদেন্তে।

রাত হলো। একটু আগেভাগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলল ওমর। এদিথকে অনুসরণ করে ক্যাসা কারাদোনায় যেতে তৈরি হলো।

মুসা যেতে চাইল।

রাজি হলো না ওমর। কারও পিছু নেয়ার সময় একা থাকাই ভাল।

কিশোর পরামর্শ দিল, 'এদিথ আপনাকে একা পিছে পিছে যেতে দেখলেও সন্দেহ করে বসবে। তার চেয়ে আরেক কাজ করুন না, আগেই গিয়ে বাড়িটার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকুন। জানাই তো আছে ও কোথায় যাবে।'

বুদ্ধিটা পছন্দ হলো ওমরের। 'তা ঠিক। ও কি করে, সেটা জানাটাই এখন জরুরী।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা প্যাসিয়ানোর বাড়ি রওনা হলো ওমর। তেরাস্তার মাথা ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে লুকিয়ে বসল রাস্তার পাশের ঝোপে।

অন্ধকার রাত। চাঁদ ওঠেনি। গাছের মাথার ঘন পাতার আচ্ছাদন ভেদ করতে পারছে না তারার আলো। বাতাস স্তব্ধ। অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্যে গরমটাও অসহ্য। তার ওপর মশার অত্যাচার। ওগুলোর কামড়ে চুপ করে বসে থাকাই দায়। সময় কাটতে চাইছে না কিছুতে।

এগারোটা বাজল যেন বহু যুগ পর। পদশব্দ কানে এল ওর। পাশ দিয়ে চলে গেল একটা ছায়ামূর্তি। অন্ধকারেও বোঝা গেল, মেয়েমানুষ। তবে এদিথ না ভ্যালেনসিয়া, নিশ্চিত হওয়া গেল না।

কান পেতে আছে ওমর। ক্যাসা কারাদোনার দিকে চলে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। হঠাৎ শোনা গেল রোম-খাড়া-করা চিৎকার। কয়েকবার গোঁ-গোঁ থেমে গেল। ধপ করে পড়ে গেল কি যেন। এগিয়ে আসতে লাগল ছুটন্ত পদশব্দ।

ওমরের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল আরেকটা ছায়ামূর্তি। শহরের দিকে। মনে হলো গায়ে চাদর কিংবা কম্বল জড়ানো। মুহূর্তে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

কয়েকটা সেকেন্ড অপেক্ষা করল ওমর। তারপর বেরোল। দ্রুত হেঁটে

চলল চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। কিছুদূর এগিয়ে হোঁচট খেল। উবু হয়ে দেখল একটা দেহ পড়ে আছে মাটিতে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল। ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল হাতটা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে এদিথ। পিঠে বেঁধা একটা লম্বা ছুরি। প্রচণ্ড আক্রোশে যেন সবেগে আঘাত হেনে পুরো ফলাটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে, বাঁটটা বেরিয়ে আছে কেবল। হৃৎপিণ্ডে ঢুকেছে ছুরি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে বেচারি। নতুন একটা নীল জামা পরনে। নিশ্চয় ওমরের কাছ থেকে পাওয়া টাকাতেই কিনেছিল।

ছুরিতে হাত দিল না ওমর। বাঁটে আঙুলের ছাপ লেগে গেলে বিপদ হবে। এই অবস্থায় এখন তাকে কেউ দেখে ফেললেও বিপদ। ধারণা করে নেবে খুনটা সেই করেছে। তাড়াতাড়ি সরে যাওয়া দরকার এখান থেকে।

কিন্তু চিঠিটা কোথায়? যেটা প্যাসিয়ানোকে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল এদিথ?

পাওয়া গেল ওটা। ওর হাতের কাছে পড়ে আছে। রক্ত লেগে গেছে তাতে। কোণের দিকে রেমন কোম্পানির ঠিকানা। পনেরো দিনের মধ্যে জানাতে বলেছিল ভ্যালেন্তি, ওরা জানিয়েছে।

তুলে নিয়ে রক্ত মুছে সেটা পকেটে ভরল ওমর। ভেতরে কি লেখা জানার প্রয়োজন বোধ করল না। উঠে দাঁড়াল।

কে খুন করল মেয়েটাকে? প্রথমেই মনে এল ভ্যালেনসিয়ার কথা। প্রচণ্ড ঈর্ষাই খুনের দিকে ঠেলে দিয়েছে ওকে। প্যাসিয়ানো আর তার মাঝে এদিথ যাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে সরিয়ে দিয়েছে চিরতরে। যুক্তিসঙ্গত হলেও এটা বিশ্বাস করতে পারল না ওমর। মনে হতে লাগল মেয়েটাকে খুন করার পেছনে অন্য কারও হাত, অন্য কোন কারণ আছে।

কে খুন করেছে, সেটা পরেও চিন্তা করা যাবে। লাশটাকে নিয়ে কি করবে আপাতত সেটা ভাবা দরকার। তিনটে কাজ করা যেতে পারে। সোজা কেটে পড়তে পারে। কাউকে কিছু জানাবেই না। কিন্তু সারারাত বনের মধ্যে মেয়েটার মৃতদেহ পড়ে থাকবে, হয়তো শেয়াল বা অন্য কোন বুনো জানোয়ারে ছিঁড়ে খাবে, সেটা অমানবিক মনে হলো ওর কাছে। দ্বিতীয় কাজটা করতে পারে, যেহেতু ক্যাসা কারাদোনার কাছে এই খুন হয়েছে, ওই বাড়ির লোকদের গিয়ে জানানো যায়। তারপর ওরা যা করার করবে। কিন্তু এটাও মনঃপূত হলো না ওর। তৃতীয় যে কাজটা করতে পারে, সেটা হলো এখনই ইনতেনদেন্তেকে গিয়ে খবর দেয়া। তাতে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে হয়তো। তবু এটাই করা উচিত বলে মনে হলো ওর।

দেরি না করে সোজা রওনা হলো শহরে।

থানায় পৌঁছে ডিউটিরত এজেন্তের কাছে শুনল ইনতেনদেন্তে শুয়ে পড়েছেন। বিছানা থেকে ডেকে আনা হলো তাঁকে।

ওমরকে দেখে অবাক হলেন, 'কি ব্যাপার?'

'একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে, সেনর।'

'কি?'

'গরমে ঘুম আসছিল না বলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। চলে গিয়েছিলাম বনের দিকে। দেখি রাস্তার ওপর একটা মেয়ে খুন হয়ে পড়ে আছে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ইনতেনদেন্তে, 'চিনতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। ভ্যালদেজ হোটেলের রিসেপশনিস্ট এদিথ।'

'ওই নিরীহ মেয়েটাকে আবার মারতে গেল কে?' বিড়বিড় করলেন ইনতেনদেন্তে। ওমরের দিকে তাকালেন, 'খুনীকে দেখেছেন?'

'দেখিনি বললে ভুল হবে। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি ছুটে গেল। চিনতে পারিনি।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন পুলিশ অফিসার, 'নাহ্, আমার আর শান্তি নেই। ঠিক আছে, সেনর, আপনি যান। যা করার আমি করছি। খবরটা জানানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

হোটেলে ফিরে ওমর দেখল তিন গোয়েন্দা ঘুমায়নি, তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মুখ দেখেই সন্দেহ করে ফেলল কিশোর, 'কি হয়েছে?'

'এদিথ খুন হয়েছে।'

চিত হয়ে শুয়ে ছিল মুসা, ঝটকা দিয়ে উঠে বসল। 'খাইছে!'

স্থির হয়ে গেল কিশোরের পাশে বসা রবিন।

'কি করে?' জানতে চাইল কিশোর।

সব কথা খুলে বলল ওমর।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিশোর বলল, 'শেষ পর্যন্ত খুনের সঙ্গে জড়ালাম! সাবধান করে দিয়েছিলেন মিস্টার সাইমন!' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে সন্দেহ হয় আপনার? ভ্যালেনসিয়া?'

'প্রথমে ওর কথাই মনে আসে, তবে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না। চিঠিটা পুলিশকে দিয়েছেন?'

'না।'

'ভাল করেছেন। প্যাসিয়ানোর কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ হলো।'

'মানে?'

'কাল সকালে ওটা নিয়ে যাবেন ওর কাছে। চিঠি দেখিয়ে বলবেন, ভ্যালেন্তিকে দিতে চান। জিজ্ঞেস করবেন, ও কোথায় আছে। চিঠিটা তার প্রয়োজন। আমার মনে হয় না জানাতে অস্বীকার করবে সে।'

'করলে চিঠিটা দেব না। বাধ্য হয়ে তখন স্বীকার করবে।'

'এদিথ যে খুন হয়েছে,' রবিন বলল, 'বোকোকে জানানো দরকার না?'

'দরকার তো। কিন্তু পাব কোথায় ওকে? সকালে দেখা হলে তখন বলব।'

'যদি ততক্ষণে অন্য কারও কাছ থেকে না জেনে গিয়ে থাকে সে,' কিশোর বলল।

এগারো

সকালটা সুন্দর। আকাশ নীল। মাটি থেকে ওঠা হালকা বাষ্প আরেকটা গরম দিনের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

সকালে উঠেই ক্যাসা কারাদোনায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো ওমর। মুসা আর রবিন দুজনেই জিজ্ঞেস করেছে কিশোরকে, ওরা যাবে কিনা। মানা করেছে কিশোর। প্রয়োজন নেই। বেশি লোক গেলে ঝামেলা হতে পারে। এ কাজের জন্যে ওমরভাই একাই যথেষ্ট।

ওরা তিনজনেই হোটেলে থাকবে। বোকো কিংবা ইনতেনদেন্তে এলে তাদের সঙ্গে কথা বলবে।

'আমার কথা জিজ্ঞেস করলে কোথায় গেছি বলবে?' জানতে চাইল ওমর।

'বলে দেব একটা কিছু। আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। চলে যান।'

হোটেল থেকে বেরিয়েই যাকে দেখল, এত সকালে তাকে আশা করেনি ওমর। বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোকো। হাসিখুশি মুখ দেখে বুঝে নিল, দুঃসংবাদটা এখনও শোনেনি সে। ওমরকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'বুয়েনস দিয়াস, সেনর। কোথায় যাচ্ছেন?'

'তুমি এখানে কি করছ?'

'এদিথের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

দ্বিধা করে ওমর বলল, 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, বোকো। ও আর কোনদিনই আসবে না।'

অবাক হয়ে গেল বোকো, 'আসবে না মানে?'

'তুমি পুরুষ মানুষ, মনকে শক্ত করো। এদিথ মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

'কাল রাতে। খুন করা হয়েছে।'

শুনে বোকোর যা চেহারা হলো জীবনে ভুলবে না ওমর। হাসিটা যেন মুহূর্তে জমাট বেঁধে গেল। সাদা দাঁতগুলোর ওপর আঠা দিয়ে লাগানোর মত সেঁটে বসল হাসিতে ছড়ানো পাতলা হয়ে যাওয়া ঠোঁট। ধীরে ধীরে খুলল আর বন্ধ হলো হাতের মুঠো। ওমরের ভয় হলো তার ওপরই না ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটা।

ভয়ঙ্কর গলায় প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বোকো, 'কে করেছে কাজটা?'

মাথা নাড়ল ওমর, 'আমি জানি না।'

'ভ্যালেনসিয়া?'

'সত্যিই জানি না।'

'তাহলে প্যাসিয়ানো। ও-ই করেছে। দুই মহিলার ঝামেলা কাটানোর জন্যে।'

চুপ করে রইল ওমর। মন্তব্য করল না।

'আপনাকে কে বলল?'

'কাল রাতে ক্যাসা কারাদোনার দিকে গিয়েছিলাম। রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখেছি লাশটা। পিঠে ছুরি বেঁধা।'

'কে মেরেছে দেখেননি?'

'না। অন্ধকারে কে যেন ছুটে গেল, চিনতে পারিনি।'

'তারপর?'

'ইনতেনদেন্তেকে খবর দিলাম।'

'লাশটা এখন কোথায়?'

'পুলিশের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা। ম্যাচেটির বাঁটে হাত চলে গেল বোকোর। ভারী গলায় বলল, 'ওকে আমি ছাড়ব না, সে যেই হোক!' বড় বড় দুই ফোঁটা পানি জমল ওর চোখের কোণে। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

কিছু টাকা বের করে ওর হাতে দিল ওমর। 'নাও, খানিকটা বিয়ার খেয়ে নাওগে। শক্ত হওয়ার জন্যে এখন ওটা তোমার প্রয়োজন।'

টাকাটা নিয়ে নীরবে হোটেলে ঢুকে গেল বোকো।

রাস্তায় নেমে এল ওমর।

এ সময়ে ভিড় নেই। দুই রাস্তার মাথায় এসে দেখল একেবারে নির্জন। সতর্ক রয়েছে। বলা যায় না, কেউ অনুসরণ করতে পারে। বনের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে এসে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়াটাও অসম্ভব নয়। খুনীর তালিকায় হয়তো এদিখের পরের নামটাই ওর।

মেয়েটা যেখানে খুন হয়েছে সেখানে এসে থামল। লাশটা নেই। রক্ত পড়ে আছে। দ্রুত চোখ বোলাল একবার। কোন সূত্র পেল না।

ক্যাসা কারাদোনার গেটে এসে দাঁড়াল সে। এগিয়ে এল বিশালদেহী, কুৎসিত চেহারার এক ফিরিঙ্গি। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'সেনর প্যাসিয়ানোর কাছে এসেছি।'

'তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

'আমার সঙ্গে করবেন। একটা দুঃসংবাদ আছে। তাঁকে গিয়ে বলো, একটা চিঠি দিতে এসেছি।'

সন্দিহান চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। যাবে কি যাবে না মনস্থির করতে পারছে না। আচমকা বলল, 'দাঁড়ান।'

ঘরের দিকে চলে গেল সে। খানিক পর ফিরে এসে নিঃশব্দে গেট খুলে দিল। ইশারা করল ওর সঙ্গে যেতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্যাসিয়ানো। সিগারেট টানছে। কাশতে শুরু করল। কাশি থামলে জিজ্ঞেস করল, 'কার চিঠি?'

'আপনার। আমেরিকা থেকে রেমন্ড কোম্পানি পাঠিয়েছে।'

অবাক হলো প্যাসিয়ানো, 'আপনাকে দিয়ে?'
'না, ঘটনাক্রমে চলে এসেছে আমার হাতে। শুনতে চান?'
সাধারণ আসবাব দিয়ে সুন্দর করে সাজানো একটা বসার ঘরে ওমরকে নিয়ে গেল প্যাসিয়ানো। 'বসুন। কিছু খাবেন?'
'নো, থ্যাংকস। এইমাত্র নাস্তা সেরে এলাম। কথা বলার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম ওমর শরীফ। সেজউইক বুমারের নাম শুনেছেন?'
'অর্কিড ব্যবসায়ী?'
মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'তার ওখানে মেহমান হয়েছি আমরা চারজন। ক্রুজোয়াড়োতে বেড়াতে এসেছি। আমার বাকি তিন সঙ্গী এখন হোটেলে।'
'আপনাকে মনে হয় সেদিন বারে দেখলাম?'
'হ্যাঁ। বার লুজিয়ানোতে।'
'ঠিক। একটা ছেলেও ছিল আপনার সঙ্গে।'
আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল যেন ওমর, 'ভ্যালদেজ হোটেলের রিসেপশনিস্ট এদিথ খুন হয়েছে কাল রাতে, জানেন সেখবর?'
চমকে গেল প্যাসিয়ানো, 'না তো!'
'লাশটা কাল রাতে আমিই প্রথম দেখেছি। হাঁটতে বেরিয়ে রাতে বনে ঢুকলে কেমন লাগে দেখার জন্যে চলে এসেছিলাম এদিকে। হঠাৎ শুনি একটা চিৎকার। এগিয়ে দেখি মেয়েটা মরে পড়ে আছে। হাতের কাছে একটা চিঠি। এ বাড়ির কাছাকাছিই ঘটনাটা ঘটেছে। আমার মনে হলো এখানেই কাউকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে আসছিল সে। নইলে এত রাতে আসার আর কি কারণ? যাই হোক, লাশ দেখে প্রথমেই মনে এল, পুলিশকে জানানো দরকার।'
'জানিয়েছেন?'
'কাল রাতেই।'
'চিঠিটা?'
'তুলে নিয়েছিলাম। পুলিশকে বলতে ভুলে গেছি। হোটেলে গিয়ে পকেটে দেখে মনে পড়ল। বের করে দেখি, আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছে, পল ভ্যালেন্তি নামে একজনের নামে।'
'পল আমার বন্ধু,' তাড়াতাড়ি বলল প্যাসিয়ানো, 'মাঝে মাঝে এসে থাকে এখানে।'
'ও, আপনি তাহলে ভ্যালেন্তি নন?'
'না,' আরেক দিকে তাকিয়ে জবাব দিল প্যাসিয়ানো। 'তবে চিঠিটা আমার কাছে দিয়ে যেতে পারেন। পৌঁছে দেব ওকে?'
'কোথায় থাকে ও?'
'ঠিকানা জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হলে তখন দিতে পারব।'
পকেট থেকে খামটা বের করল ওমর।
প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিল প্যাসিয়ানো। রক্তের ছোপ লেগে আছে। ঠিকানাটা এক নজর দেখেই পকেটে ভরে ফেলল।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সেনর শরিফ। নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই চিঠির সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আপনি জানেন নাকি খুনটা কেন হয়েছে?'

'না না, জানি না! আমি জানব কোত্থেকে?' তাড়াতাড়ি জবাব দিল প্যাসিয়ানো। 'আসল কথাটা খুলেই বলি। শহরে গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে চিঠিপত্র আনতে ভাল লাগে না আমার। তাই এদিথকে বলে দিয়েছিলাম, আমার কিংবা আমার বন্ধুর কোন চিঠি থাকলে নিয়ে আসতে। মুফতে কাজ করাতাম না, টাকা দিতাম। ও আসলে আমার পোস্টউওম্যান হিসেবেই কাজ করত। আর কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাই?'

কাশতে আরম্ভ করল আবার প্যাসিয়ানো। আঙুলের ফাঁকে ধরা পুড়ে যাওয়া গোড়াটা ফেলে দিয়ে আরেকটা সিগারেট বানানোর জন্যে কাগজ আর তামাক বের করল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে ওমর। আঙুলে আঙটি নেই। দিনের আলোয় দাড়িগোঁফ দিয়েও আসল চেহারাটা আর ঢেকে রাখতে পারল না। এই লোকই যে ভ্যালেন্তি, কোন সন্দেহ রইল না ওমরের।

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে জানতে চাইল ভ্যালেন্তি, 'খুনীকে দেখেছেন?'

'এদিথের চিৎকার শোনার পর পরই একজনকে ছুটে যেতে দেখেছি। মনে হলো কোন মহিলা। অবশ্য গায়ে চাদর কিংবা কম্বল জড়ানো থাকলে অন্ধকারে পুরুষকেও মহিলা মনে হতে পারে। যাই হোক, চিনতে পারিনি। সে-ই খুনী কিনা তাও জানি না।'

'সে আপনাকে দেখেছে?'

'মনে হয় না।'

'ইনতেনদেন্তেকে বলেছেন এ সব কথা?'

'না।'

'কেন?'

'ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'বুদ্ধিমানের কাজ। আমি আবার বলছি, এই চিঠির সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই। দয়া করে যদি ইনতেনদেন্তেকে এটার কথা না বলেন, কৃতজ্ঞ হব। বললেই এসে নানা রকম প্রশ্ন শুরু করবে। আমিও ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'বুঝেছি। বলব না।'

'থ্যাংক ইউ,' উঠে দাঁড়াল ভ্যালেন্তি। বুঝিয়ে দিল, কথা শেষ হয়েছে, এবার ওমর যেতে পারে।

ওমরও উঠে দাঁড়াল। সন্তুষ্ট। যা জানতে এসেছিল—অর্থাৎ প্যাসিয়ানোই ভ্যালেন্তি কিনা—জানা হয়ে গেছে। দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে এই সময় কথা কাটাকাটির শব্দ হলো বাইরে। কয়েক সেকেণ্ড পর গুলির শব্দ। দৌড়ে এসে বারান্দায় উঠল কেউ। ভারী পায়ের শব্দ হলঘর পেরিয়ে এসে ঢুকল বসার ঘরে।

নেলসন! হাতে উদ্যত পিস্তল।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন!' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল সে। ওমরের দিকে তাকাল, 'উল্টোপাল্টা কিছু করবেন না। বেঁচে যাবেন।' ভ্যালেন্তির দিকে ফিরল, 'ফর্মুলাটা কোথায়? জলদি দিয়ে দিন। নইলে কপালে দুঃখ আছে আপনার ওই চাকরটার মত।'

খোলা জানালার দিকে তাকাল ভ্যালেন্তি।

'লাভ নেই,' মাথা নাড়ল নেলনস, 'জানালার কাছে যাওয়ার আগেই গুলি খাবেন। বেরিয়ে যাবেনই বা কোথায়? আপনার নৌকার তলা ফুটো করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।'

বিমূঢ় হওয়ার ভান করল ওমর, 'এ সব কি ঘটছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমিও না,' ভ্যালেন্তি বলল, 'এই লোকটা নিশ্চয় পাগল।'

চমৎকার অভিনয় করে ভ্যালেন্তি, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না ওমর।

'জলদি করুন!' ধমকে উঠল নেলসন। 'সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

নড়ল না ভ্যালেন্তি।

'আর পাঁচ সেকেন্ড সময় দেব,' শীতল স্বরে বলল নেলসন। 'এরপরও যদি না বের করেন, প্রথমে গুলি করে মারব আপনাকে। তারপর দরকার হলে আপনার বাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে হলেও বের করব ফর্মুলাটা। এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, জানি আমি।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল ভ্যালেন্তি। 'আনছি।'

'কোথায় রেখেছেন?'

'শোবার ঘরে।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে ওমরের মাথায়। নেলসনকে ঠেকাতে হবে। না পারলে ফর্মুলাটা নিয়ে চলে যাবে সে।

'এগোন। আমি আপনার পেছনেই আছি। চালাকির চেষ্টা করলেই মরবেন। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি না আমি।'

ভ্যালেন্তির দিকে তাকাল ওমর। ছাই হয়ে গেছে লোকটার মুখ। দরদর করে ঘামছে।

ওমরের দিকে তাকাল নেলসন। 'আপনিও সামনে থাকবেন আমার। ওর সঙ্গে যাবেন। আমি বেরিয়ে গেলে তারপর যেখানে খুশি যেতে পারবেন।'

শোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গেল ভ্যালেন্তি, এই সময় বাইরে আবার শোনা গেল পদশব্দ। একজন সহকারী নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ইনতেনদেন্তে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে ওই লোকটাকে গুলি করল কে?'

চোখের পলকে পিস্তল পকেটে ভরে ফেলল নেলসন। কিন্তু দেখে ফেললেন ইনতেনদেন্তে। চাবুকের মত হিসিয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ, 'আপনি?'

নিরীহ মুখভঙ্গি করে ফেলল নেলসন। 'আমি মানে?' যেন কিছুই জানে না

সে।

'ওই খুন করেছে জেমসকে!' চিৎকার করে উঠল ভ্যালেন্তি। 'আমাদেরকেও গুলি করার হুমকি দিচ্ছিল!'

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না ওখানে নেলসন। ইনতেনদেন্তে বা তাঁর সঙ্গী কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদৌড়ে তাঁদের পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে ওমর দেখল ঢালু জমি দিয়ে নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে নেলসন। সঙ্গে দাঁতপড়া লোকটা। পাড়ে বেঁধে রাখা একটা ক্যানূতে উঠে পড়ল।

ইনতেনদেন্তে বা তাঁর সহকারীও দাঁড়িয়ে নেই। ছুটে বেরিয়ে গেছেন। লোকগুলোকে ধরতে পারবেন না বুঝে পিস্তল তুলে গুলি করতে শুরু করলেন। কিন্তু দূরত্ব অনেক। লাগাতে পারলেন না। নদীর বাঁকে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল ক্যানূটা।

ঘরে ফিরে এলেন ইনতেনদেন্তে।

একটা গেলাসে মদ ঢালছে ভ্যালেন্তি। হাত কাঁপছে। ওমরকেও খেতে অনুরোধ করেছিল। মানা করে দিয়েছে সে।

সন্দিগ্ধ চোখে একবার ওমর একবার ভ্যালেন্তির দিকে তাকাতে লাগলেন ইনতেনদেন্তে। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কি? কি ঘটছে এখানে?'

ভ্যালেন্তির দিকে তাকাল ওমর, 'আপনিই সব বলুন।'

কাশতে শুরু করল ভ্যালেন্তি।

ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ইনতেনদেন্তে, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'কাল রাতে লাশ দেখে গেলাম। সকালে উঠে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। এক ধরনের কৌতূহল টেনে নিয়ে এল। আপনি পুলিশ অফিসার, মানুষের এ সব উদ্ভট আচরণের কথা নিশ্চয় অজানা নয়।'

হ্যাঁ-না কিছু বললেন না ইনতেনদেন্তে। 'সেনর প্যাসিয়ানোকে আগে থেকেই চিনতেন নাকি?'

'না, আজই পরিচয় হলো। আমাকে গেটের কাছে দেখে এগিয়ে এলেন। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছি। বললাম, বেড়াতে। বিদেশী লোক বলে ভেতরে ডেকে খাতির-যত্ন করতে চাইছিলেন, এই সময় ঢুকল ওই ডাকাতটা।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকালেন ইনতেনদেন্তে। 'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আমি সেনর প্যাসিয়ানোর সঙ্গে কথা বলছি।'

আবার কোন্ বেফাঁস প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলে দেন তাকে ইনতেনদেন্তে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওমর। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা রওনা হলো শহরে।

বারো

হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ওমর। খানিক আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা নিয়ে মনে একটা খুঁতখুঁতি রয়েই গেছে। তবে সন্তুষ্টও হয়েছে কিছু কিছু ব্যাপারে। কুয়াশা অনেকখানি কেটে গেছে চোখের সামনে থেকে।

প্যাসিয়ানোই যে ভ্যালেন্তি, আর কোন সন্দেহ নেই। ওমর নিজে দেখার পর যাও বা একটু ছিল, সেটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে নেলসন। আর নেলসনও যে অন্য কোম্পানির এজেন্ট, সেটাও পরিষ্কার। ওদের মত একই উদ্দেশ্যে এসেছে ক্রুজোয়াড়োতে। ভ্যালেন্তিও বুঝিয়ে দিয়েছে ফর্মুলাটা বাড়ির মধ্যেই কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে সে।

এখন যেটা চিন্তার ব্যাপার, সেটা হলো এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও কি ফর্মুলাটা ওখানেই থাকবে? ভ্যালেন্তি আর ও বাড়িতে থাকার সাহস পাবে? নিতান্ত ভাগ্যক্রমে একবার বেঁচে গেছে হঠাৎ করে পুলিশ আসাতে, কিন্তু পরের বার? ফর্মুলাটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত নেলসন থামবে না, আবার যাবে, একেবারে নিশ্চিত। আরও একটা বড় প্রশ্ন, এ সব ঘটনা কেন ঘটেছে—ইনতেনদেন্তেকে কি জবাব দেবে ভ্যালেন্তি? একটা ব্যাপার শিওর, ঘটনাবলী এখন শেষের পর্যায়ে, আর দীর্ঘায়িত হবে না।

হোটেলে ফিরে দেখল বারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কোকাকোলা খাচ্ছে। ওদেরকে সব কথা জানাল ওমর।

শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে! যতবারই যাচ্ছেন ওদিকে, ততবারই একটা করে খুন!'

'মনে হচ্ছে কিছু একটা করা উচিত এখন আমাদের।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি করব?'

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর, 'কিছু একটা তো করতে হবেই, এবং দ্রুত। নেলসন আপাতত পালিয়েছে, তবে যে কোন সময় আবার আসবে। ভয় পাচ্ছি ভ্যালেন্তির জন্যে। পুলিশ ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেও না পালিয়ে যায়। একবার পালালে আবার ওকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

'আমার মনে হয় না নেলসন এত তাড়াতাড়ি আসবে। গুলি করে মানুষ খুন করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে না?'

'তাও আসবে, রাতের বেলা, নদীপথে। ফর্মুলাটা আদায় না করে তার শান্তি নেই।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' কিশোরকে বলল ওমর, 'তোমাকে কে বাড়ি মেরেছে, সে প্রশ্নের জবাবও পেয়েছি। জেমস। আজ ক্যাসা কারাদোনায় ঢুকতে গিয়ে গেটের কাছের নরম মাটিতে ওর জুতোর দাগ পড়তে দেখেছি। ঠিক একই দাগ দেখেছিলাম তোমাকে যেখানে মেরেছে সেখানে।'

'তাহলে তো ভালই হয়েছে,' মুসা বলল। 'উচিত সাজা হয়েছে শয়তানটার। এদিথকে মেরেছিল কে? ও-ই?'

'সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ভ্যালেনসিয়াই হবে। এদিথের ওপর ওর ছাড়া আর কারও আক্রোশ নেই। ঈর্ষা ছাড়া সাধারণ ওই মেয়েটাকে খুনের আর উদ্দেশ্যও নেই। যাই হোক, আমি ভাবছি ভ্যালেন্তি ইনতেনদেন্তেকে কি কাহিনী শোনাবে? আর যাই বলুক, ফর্মুলাটার কথা মরে গেলেও বলবে না সে। ইনতেনদেন্তে বেরিয়ে আসার পর পরই ওটা বের করে পালানোর চেষ্টা করবে।'

'কোথায় রেখেছে কিছু অনুমান করতে পারেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'জায়গা তো অনেকই আছে···'

'অনেক জায়গায় তো আর রাখবে না। বিশেষ কোন জায়গা। যেখানে রাখলে কেউ সহজে ভাববে না যে ওখানে আছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল ওমর। 'নেলসন ফর্মুলা দেয়ার জন্যে চাপ দিতে থাকলে বার বার দেয়ালের একটা ছবির দিকে তাকাতে দেখেছি ভ্যালেন্তিকে। ছবিটা ছোট। তবে তার আড়ালে দেয়ালে একটা আয়রন সেফ লুকিয়ে রাখা যায় সহজেই।'

'তারমানে ওই ঘরটায় ঢুকতে হবে আমাদের।'

'তুমি যাচ্ছ নাকি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'নাহ্। যেতে পারলে ভাল হত। ফর্মুলাটা খুঁজতে পারতাম। কিন্তু আবার আমাকে ওদিকে যেতে দেখলে সন্দেহ করে বসবেন ইনতেনদেন্তে। মাথায় আঘাত নিয়ে কেন গেলাম জিজ্ঞেস করলে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব না। একই কথা আপনার বেলায়ও খাটে। পর পর দুবার ওদিকে গেছেন, দুবারই দুজন মানুষ খুন হয়েছে, তৃতীয়বার যদি যান আর এড়াতে পারবেন না ইনতেনদেন্তেকে। তাঁর প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতেই হবে, অর্থাৎ বলে দিতে হবে ফর্মুলাটার কথা। তাছাড়া আমার বিশ্বাস ক্যাসা কারাদোনা থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আসবেনই তিনি। সেসময় আপনার এখানে উপস্থিত থাকা দরকার।'

'তাহলে কে যাচ্ছে?' রবিনের প্রশ্ন, 'আমি?'

'তুমি আর মুসা। একা আর কারও যাওয়া ঠিক হবে না। ভয়ঙ্কর খুনীর আনাগোনা ওদিকে। কাউকে রেহাই দিচ্ছে না দেখছ না? তবে আপাতত তোমরা গিয়ে ক্যাসা কারাদোনায় ঢুকবে না। বাইরে থেকে নজর রাখবে। দেখবে ভ্যালেন্তি কি করে।'

'বেরিয়ে যদি পালানোর চেষ্টা করে,' মুসা বলল, 'ব্রাজিলে চলে যায়?'

'তা যেতে পারবে না। ওর নৌকাটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে নেলসন। আরেকটা নৌকা জোগাড় করতে হলে তাকে শহরে আসতেই হবে। মাথা খারাপ না হলে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে পালানোর কথা কল্পনাও করবে না।'

'যদি শহরে আসে?'

'একজন বসে বসে ওর বাড়ির দিকে চোখ রাখবে। বাড়িতে যদি কেউ আর না থাকে পারলে ভেতরে ঢুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে ফর্মুলাটা। আরেকজন পিছু নেবে।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'রবিন, ওঠো।'

হাত তুলল কিশোর, 'শোনো, এক কাজ করো, কাপড় বদলে যাও। আমি আর ওমরভাই সেদিন কিনেছি। এখানকার পোশাক। সুবিধে হবে। রাস্তায় কেউ নজর দেবে না তোমাদের দিকে। ওমরভাইয়েরটা লাগবে তোমার। আমারটা রবিনের।'

কয়েক মিনিট পর ওপরতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মুসা আর রবিন। মুসাকে দেখে কারও চেনার সাধ্য নেই ও আমেরিকা থেকে এসেছে। স্থানীয় পোশাকে এক্কেবারে এদেশী হয়ে গেছে।

হেসে বলল ওমর, 'বাহ্, তুমি তো ল্যানারো হয়ে গেছ হে! গিয়ে কোনও গরুর খামারে চাকরি চাইলেই এখন পেয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, খেয়েদেয়ে কাজ নেই আমার, শেষে গিয়ে গরুর রাখাল হই। কিশোর, গেলাম।'

'বাড়িটা খুঁজে বের করতে পারবে তো? দাঁড়াও, দেখিয়েই দিই।' রবিনের কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে কিভাবে যেতে হবে নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিল কিশোর।

কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা, 'রবিন, ওঠো।'

'কতক্ষণ পাহারা দেব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দুপুর পর্যন্ত দাওগে,' কিশোর বলল। 'তারপরও যদি না আসো, ভাবব আটকে গেছ, আমি যাওয়ার চেষ্টা করব। ওমরভাইয়ের আর কোনমতেই ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'ইনতেনদেন্তে দেখে ফেললে কৈফিয়তটা কি দেব?'

'সহজ। বনে ঢুকেছ বনের পশুপাখি দেখতে। অর্কিড খুঁজতে। আর কোন প্রশ্ন?'

মাথা নাড়ল রবিন।

'খুব সাবধানে থাকবে,' কিশোর বলল। 'অহেতুক কোন ঝুঁকি নিতে যাবে না, খবরদার।'

বেরিয়ে গেল দুজনে।

দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'বোকো এসেছিল?'

'হ্যাঁ। ও বলল, এদিথ যে খুন হয়েছে সেকথা আপনি জানিয়েছেন ওকে।'

'কি রকম দেখলে?'

'মনের অবস্থা খুবই খারাপ। বার বার বলছিল, এর জন্যে শাস্তি ভোগ করতেই হবে একজনকে। ভ্যালেন্তিকেই দোষ দিচ্ছিল ও। ওর যুক্তি, ভ্যালেন্তি এদিথের দিকে হাত বাড়িয়ে ভ্যালেনসিয়াকে উত্তেজিত করেছে বলেই খুন করেছে ভ্যালেনসিয়া। সুতরাং শাস্তি যদি কারও পেতে হয়, ভ্যালেন্তিকেই

পেতে হবে। গলা পর্যন্ত আগুয়ারদিয়েন্তে গিলে ওর আর কোন হুঁশ নেই।'

আঁতকে উঠল ওমর, 'সর্বনাশ! ওই বিষ গিলেছে!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কতক্ষণ আগে এসেছিল?' জানতে চাইল ওমর।

'এই তো আধঘণ্টা আগে।'

'কোথায় গেল ও? আজকে তো অর্কিড ভিলায় ফিরে যাবার কথা।' দাঁড়াও, দেখে আসি। ঘোড়াটা যদি থাকে, তাহলে বুঝব শহরেই আছে। না থাকলে চলে গেছে।'

বেরিয়ে গেল ওমর। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, আস্তাবলেই বাঁধা আছে ঘোড়াটা।

'চিন্তার কথা!' কিশোর বলল। 'ও যে কি করে বসে কোন ঠিক নেই।'

'অত ভেব না। বেশি গিলে হয়তো কোথাও পড়ে এখন নাক ডাকাচ্ছে। আগুয়ারদিয়েন্তে খেলে বেশিক্ষণ সজাগ থাকা যায় না।'

'না থাকলেই ভাল!'

আলোচনা আর এগোতে পারল না ওদের। ঘরে ঢুকলেন ইনতেনদেন্তে। সঙ্গে সেনর আরমিজো।

'আবার দেখা হয়ে গেল, সেনর,' ওমরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন ইনতেনদেন্তে।

'ওদিকের কি খবর?' কিছুটা ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল ওমর।

এদিথের খুনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এ কথা হোটেলের মালিক ভ্যালদেজকে জানাতে এসেছেন তিনি। যেহেতু তার এখানেই কাজ করত মেয়েটা, তার জানার অধিকার আছে।

ভ্রূকুটি করল ওমর, 'কে খুন করেছে?'

'ভ্যালেনসিয়া। বার লুজিয়ানোতে নাচে যে। খুনের কারণ প্রেম ঘটিত ঈর্ষা, আর কিছুই না।'

'কি করে বুঝলেন সে-ই করেছে?'

'ও স্বীকার করেছে। তবে প্রথম সূত্রটা আপনিই দিয়েছিলেন। খুনের পর একজন মেয়েমানুষকে ছুটে যেতে দেখেছেন। আজ সকালে সেনর প্যাসিয়ানোর কাছে শুনলাম বাকিটা।'

'উনি জানলেন কি করে? খুন করতে দেখেছেন?'

'না। তবে তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল, ভ্যালেনসিয়াই খুনটা করেছে।'

'সন্দেহের কারণ?'

'কিশোর যে-রাতে মাথায় আঘাত পায়, সে-রাতে ভ্যালেনসিয়া নাকি হুমকি দিয়েছিল এদিথকে খুন করবে সে। যে ছুরিটা দিয়ে খুন করা হয়েছে ওটা ভ্যালেনসিয়ার। ওর জামার হাতায়ও রক্তের দাগ লেগে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ও নিজ মুখেই সব স্বীকার করেছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে আর ভাবছে কিশোর। কোথায় যেন একটা খটকা আছে। বোকোর সঙ্গে ভাব দেখেছে এদিথের। সুতরাং ভ্যালেন্তির

সঙ্গে তার প্রেম থাকার কথা নয়। ক্যাসা কারাদোনায় যেত নেহায়েত কাজের জন্যে। ঈর্ষাটা কেন জাগল ভ্যালেনসিয়ার? নিশ্চয় এটা ওর মাথায় ঢুকিয়েছে ভ্যালেন্তি। কিন্তু তার স্বার্থটা কি? ইনতেনদেন্তেকে প্রশ্ন করল, 'প্রেম ঘটিত ঈর্ষা, বুঝলেন কি করে?'

'সেনর প্যাসিয়ানো আর ভ্যালেনসিয়া দুজনেই বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'সেনর প্যাসিয়ানো বলেছেন, তাঁর দিকে নাকি খুব বেশি ঝুঁকে পড়েছিল এদিথ। বার বার মানা করেও এড়াতে পারেননি। সেকথা নাকি জানিয়েছেনও ভ্যালেনসিয়াকে, কারণ তিনি ওকেই ভালবাসেন। সেনরের সঙ্গে এদিথের মেলামেশার ব্যাপারটা ভ্যালেনসিয়ার চোখেও পড়ে গিয়েছিল। কয়েকবার মানাও করেছে এদিথকে। এদিথ নাকি ওকে বলেছে, ওসব কিছু না, আসলে একটা বিশেষ কাজ করে দিচ্ছে সে সেনর প্যাসিয়ানোর। কাজটা কি, গোপন রেখেছিল এদিথ। আর তাতেই সন্দেহ বেড়েছে ভ্যালেনসিয়ার। তারপর সে-রাতে গিয়ে তো প্যাসিয়ানোর বাড়িতে দুজনকে বাগানে একসঙ্গেই দেখে ফেলেছে। এরপর আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি ভ্যালেনসিয়া। খুন করে বসেছে এদিথকে।'

আরমিজো আর ইনতেনদেন্তেকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল ভ্যালদেজ।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'কি বলে গেল শুনলে?'

'শুনলাম তো।'

'ভ্যালেন্তিটা মানুষ না। উফ্, কত্তবড় শয়তান! নিজে বাঁচার জন্যে একটা মেয়েকে খুন করাল, আরেকজনকে ফাঁসিয়ে দিল খুনের দায়ে। এখন বুঝতে পারছি ভ্যালেনসিয়াকে উসকে দিয়ে ভ্যালেন্তিই এদিথকে খুন করিয়েছে। যেই বুঝেছে এদিথকে আর বিশ্বাস করা যায় না, ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, ভ্যালেনসিয়াও ঝামেলা পাকাচ্ছে—নিশ্চয় বিয়ে করতে চাপ দিচ্ছিল; দুজনকেই কায়দা করে সরিয়ে দিল ও। নিশ্চয় ওর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার কথা কোনভাবে জেনে ফেলেছিল এদিথ, ও অপরাধী বলে সন্দেহ করে বসেছিল, ব্ল্যাকমেল আরম্ভ করেছিল ভ্যালেন্তিকে। কায়দা করে তাই ওর মুখ বন্ধ করে দিল চিরতরে। খুনের দায়ে আরেকজনকে ঘাড়ে চাপিয়ে জেলে পাঠিয়ে ঝামেলামুক্ত হলো।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'এক ঢিলে বহু পাখি মেরেছে সে। ইনতেনদেন্তেকে কোনভাবে বোঝাতে হবে সেটা।'

'কি করে? কিছু বলতে গেলেই আমরা যাব ফেঁসে। ওই ফর্মুলার কথা বলতেই হবে।'

'নাহয় বললামই। কি হবে? আমার মনে হচ্ছে না আর বেশিক্ষণ কথাটা চেপে রাখা যাবে তাঁর কাছে। আর দরকারই বা কি? যে ভয় পাচ্ছিলাম, ফিসফাস কানাকানি হতে হতে ভ্যালেন্তির কানে চলে যাবে আমাদের আসার

উদ্দেশ্য, ও ডুব দেবে, সে ভয় তো আর নেই। নেলসন একটা উপকার করেছে আমাদের—আটকে দিয়ে গেছে ইবলিসটাকে। পালানোর ইচ্ছে থাকলেও নৌকার অভাবে আর সহজে সেটা পারছে না সে।'

'তা বটে। সব কথা বলে দিলেও মেয়েটাকে জেলখাটা থেকে বাঁচানো যাবে না, তবে ওর শাস্তির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। ইনতেনদেন্তেকে এখন বলব না, আরও পরে, আগে ফর্মুলাটা আমাদের হাতে আসুক।'

তেরো

সহজ ঠিকানা। ক্যাসা কারাদোনা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না মুসা আর রবিনের। জেমস মারা গেছে। তার জায়গায় নতুন আরেকজনকে খুঁজে বের করে বসাতে সময় লাগবে ভ্যালেন্তির। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় সেটা পারেনি। তারমানে বাড়িতে একাই আছে সে। আক্রান্ত হওয়ার ভয় অতটা নেই, তবু সাবধান রইল দুই গোয়েন্দা।

বাড়ির কাছে এসে ভালমত দেখতে লাগল। সামনেও দরজা, পেছনেও দরজা। নদীপথে পালালে সামনে দিয়ে বেরোবে ভ্যালেন্তি। ক্যানূটা ডুবিয়ে দিয়েছে নেলসন। আরেকটা জোগাড় করতে হলে শহরে যেতে হবে। যদি যায় ভ্যালেন্তি, তাহলে সামনের কিংবা পেছনের যে কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতে পারবে। এমনও হতে পারে, হয়তো নিজে সে শহরে যাবেই না, ইনতেনদেন্তেকে অনুরোধ করেছে শহরে গিয়ে তিনি যাতে লোক দিয়ে একটা ক্যানূ পাঠিয়ে দেন। অনুরোধ রক্ষা করতে যদি রাজি হয়ে থাকেন তিনি, তাহলে যে কোন সময় উজানের দিক থেকে ক্যানূ আসতে পারে।

তবে যেটাই ঘটুক, দেখতে হলে সামনে-পেছনে দুদিকেই নজর রাখতে হবে। এক জায়গায় থেকে সেটা সম্ভব নয়। রবিনকে তাই নদী আর সামনের দরজার দিকে চোখ রাখতে বলে পেছন দিকে রওনা হলো মুসা। কিছুদূর এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। ভালমত দেখা যায় না দরজাটা। ওর নজর এড়িয়ে কেটে পড়তে পারবে ভ্যালেন্তি। চিন্তা-ভাবনা করে শেষে ঘুরে বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু ভাবা এক, আর করা সম্পূর্ণ আরেক, বনে ঢোকার পর হাড়ে হাড়ে অনুভব করল মুসা। জঙ্গল এত ঘন, কেটে কেটে পথ করে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্যিস ল্যানারোর পোশাক পরে এসেছিল। কোমরে একটা ম্যাচেটিও গোঁজা আছে। সেটা খুলে নিয়ে ঝোপঝাড়, লতাপাতা কেটে এগোতে শুরু করল।

বিশাল সব দানবীয় বৃক্ষ যেন আকাশ ছোঁয়ার জন্যে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। বড় বড় শেকড়গুলোকে দেখতে লাগছে প্রকাণ্ড গিরগিটির পায়ের মত। সবখানে লিয়ানা লতার ছড়াছড়ি। গাছপালাকে জড়িয়ে ধরে মোটা মোটা লতা ওপরের দিকে উঠে গেছে সূর্যের আলো পাওয়ার আশায়। আরও

নানা জাতের লতা আছে, সেগুলোও লিয়ানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওপরে উঠেছে। মাটি যেন কাদাপানিতে মাখামাখি অদ্ভুত এক জলাভূমি। পা ফেললে কোথায় যে কতখানি দাববে বলা মুশকিল। মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে। টেনে তুলতে গেলে আঁকড়ে ধরে রাখে আঠাল কাদা। শ্বাসরুদ্ধ করা গরম। পচা পাতার ভয়াবহ দুর্গন্ধ। সেই সঙ্গে পোকামাকড়ের অকল্পনীয় অত্যাচার। নানা প্রজাতির, নানা আকারের, নানা ধরনের পোকামাকড় ইচ্ছেমত এসে গায়ে বসছে, কোনটা সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কোনটা রক্ত খাওয়ার জন্যে কামড়াচ্ছে, কোনটা শুধু শুধুই কামড়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে। জ্বালা করছে চামড়া। সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হলো লাল পিঁপড়ের কামড়।

রাস্তা থেকে নেমে কিছুদূর এগোনোর পরই বুঝে গেল মুসা, কি সাংঘাতিক ভুল করে বসেছে। কাদা আর লতার বাধা তো আছেই, সেই সঙ্গে মশা ও পিঁপড়ের কামড়। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। এমন এক জায়গায় চলে এসেছে, ফিরে যেতেও ইচ্ছে করল না। যতখানি এগিয়েছে আর প্রায় ততখানি এগোলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। ফিরে যাওয়া আর এগোনোতে সমান কষ্ট। সুতরাং এগোনোই ভাল।

গাছের ফাঁক দিয়ে নদী চোখে পড়ছে। আশা করল, সামনে জঙ্গল বোধহয় কিছুটা পাতলা। সেই ভরসাতেই এগোল। বুঝতে পারল কেন এখন আর জঙ্গলে নিজে অর্কিড খুঁজতে যান না মিস্টার বুমার, কেন বুনো অর্কিডের এত দাম।

ঝুপঝাপ শব্দ কানে আসতে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। জঙ্গলে একা নয় সে। কে শব্দ করছে? মানুষ, না জানোয়ার? ভাল করে দেখার জন্যে বড় একটা শেকড়ে চড়ে দাঁড়াল। পলকের জন্যে দেখল একজন নিগ্রো নদীর কিনারের একটা ঝোপের ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে। পাতার ফাঁক দিয়ে শুধু পিঠটা চোখে পড়ল।

শেকড় থেকে নেমে এসে আবার এগোল বাড়ির দিকে। অনেক পরিশ্রম করে প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে এসে দেখে, রাস্তা থেকে যতখানি দেখা যায়, এখান থেকে ততটাও চোখে পড়ে না পেছনের দরজা। সামনে বাঁশবন। এত দুর্ভেদ্য, ওর ভেতর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লতাপাতা কিংবা গাছের ডালের মত নরম নয় বাঁশ যে ম্যাচেটি দিয়ে কেটে এগোবে। তেতো হয়ে গেল মন। এত কষ্ট করে কোনই লাভ হলো না। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও আতঙ্ক হলো। বরং একপাশ ধরে সামনে এগিয়ে নদীর পাড়ে চলে যাওয়াটা অনেক সহজ মনে হলো তার কাছে।

এগোতে শুরু করল। বিচিত্র একটা শব্দ কানে এল। লোকটা কি ফিরে এসেছে? না, মানুষ চলার আওয়াজ নয়। কেমন যেন তীক্ষ্ণ হিসহিসানি। বানরেরা অনেক সময় চাপা শিস দেয় ওরকম করে। গাছের ডালে ওগুলোর অভাব নেই। পাখিও প্রচুর। কিন্তু সব রয়েছে মাথার ওপরে। শব্দটা আসছে নিচ থেকে।

অনেকটা কৌতূহলের বশেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। চোখের

সামনে থেকে ঘন পাতাওয়ালা একটা ডাল সরাতেই স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। বরফের মত জমে গেল যেন সে।

একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মনে হচ্ছে কাঁচের তৈরি। লকলকে একটা জিভ কুৎসিত মুখের ভেতর ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। মাথার নিচে কুণ্ডলী পাকানো বিরাট শরীর, মুসার উরুর সমান মোটা দড়ির একটা স্তূপ পড়ে আছে যেন।

অ্যানাকোন্ডা সাপ!

কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। ভয়ঙ্কর এই প্রাণীটির সঙ্গে ভালমত পরিচয় আছে ওর। আমাজনে জন্তু-জানোয়ার ধরতে এসে মুখোমুখি হয়েছিল অ্যানাকোন্ডার। ভয়াল সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে এখনও রোম দাঁড়িয়ে যায়।

অ্যানাকোন্ডার বিষ নেই। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে মারে, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেয়, তারপর আস্ত গিলে খায় অন্যান্য অজগরের মতই।

তাকিয়ে আছে মুসা। ধীরে ধীরে ঘাড় বাঁকা করে মাথা পেছনে নিয়ে যাচ্ছে সাপটা। স্প্রিঙের মত উল্টোদিকে পেঁচিয়ে বিস্ময়কর রকম দ্রুত খুলে নিচ্ছে কুণ্ডলী। এই ভঙ্গি চেনা আছে ওর। ছোবল মারার পূর্বাভাস। প্রথমে মাথা কামড়ে ধরবে, তারপর শরীর দিয়ে পেঁচাতে থাকবে।

বিদ্যুৎ ঝলকের মত ছুটে এল মাথাটা।

একপাশে কাত হয়ে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল মুসা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল এক বাহুতে। ফড়ফড় করে মোটা কাপড়ের শার্ট ছেঁড়ার শব্দ হলো। কাত হয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ছোবল, সাপটার দাঁত লেগে শার্ট ছিঁড়েছে।

হ্যাঁচকা টানে হাতটা সরিয়ে নিল সে। সাপের দাঁতে আটকে রয়ে গেল অনেকখানি কাপড়।

দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলতে গিয়ে পারল না মুসা। নড়াতেই পারছে না। মাটিতে শেকড় গেড়ে গেছে যেন পা'টার। তাকিয়ে দেখে ওটাতে সাপের লেজের ডগা পেঁচানো।

একবার ছোবল মেরে ব্যর্থ হয়ে আর সে চেষ্টা করল না ওটা। থুঁতনি নামিয়ে বুকে হেঁটে এগোল নদীর দিকে। টানতে টানতে নিয়ে চলল মুসাকে। এর অর্থও ওর জানা।

ব্যাঙের মতই উভচর প্রাণী এই অ্যানাকোন্ডা। জলে-ডাঙায় সমান বিচরণ। বাসা বাঁধে নদীর তীরে। তবে সেই বাসার মুখ থাকে পানির নিচে। ডুব দিয়ে গিয়ে বাসায় ঢোকে ওরা। কোন জানোয়ারকে ডাঙায় ঠিকমত কাবু করতে না পারলে ধরে নিয়ে যায় পানিতে, চুবিয়ে মারে। তারপর গিলে ফেলাটা অতি সহজ কাজ। মুসার বেলাতেও সেটাই করার ইচ্ছে অ্যানাকোন্ডার।

ঠেকানোর চেষ্টা করল সে। থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল লতা। পটপট

করে ছিঁড়ে যেতে লাগল লতা। না ছিঁড়লে হাত ছিঁড়ত। মুক্ত পা দিয়ে খুঁটি গাড়তে গিয়ে বুঝল সেটা আরও বিপজ্জনক। টান লেগে চিত হয়ে পড়ে যাবে। আরও সহজে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে তখন সাপটা। কাদা আর শেওলার মধ্যে ওর শরীরটা হিঁচড়ে যেতে থাকলে যন্ত্রণার একশেষ হবে। বাধা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াটাই বরং ভাল। তা-ই করল সে। কিন্তু কতক্ষণ? এক না একসময় নদীতে পৌঁছে যাবেই ওটা।

সাপটা প্রায় পানির কাছে পৌঁছে গেছে ঠিক এই সময় মুসার হাত ঠেকল কোমরে গোঁজা ম্যাচেটির বাঁটে। আরে, এই তো পাওয়া গেছে! উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিল এটার কথা। টান দিয়ে কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিল। ধাঁ করে কোপ মারল ওর পায়ের কয়েক ইঞ্চি দূরে লেজ সই করে। দুই টুকরো হয়ে গেল। টিকটিকির লেজ ছিঁড়ে গেলে যেমন দাপাতে থাকে কাটা লেজটাও তেমন করতে লাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল সাপের গা থেকে। থরথর করে কেঁপে উঠল কাটা লেজের গোড়া।

সাপটা কি করে দেখার জন্যে দাঁড়াল না আর মুসা। মুক্তি পেয়েই ঘুরে দিল দৌড়, কাদা-জলা মাড়িয়ে প্রাণপণে ছুটে চলল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারপর থামল। ধপ করে গড়িয়ে পড়ল পথের ওপর।

কয়েক মিনিট পর হাঁপানো বন্ধ হলে দেখতে লাগল শরীরের কতটা ক্ষতি হয়েছে। মশা আর পিঁপড়ের কামড়ের দাগ এবং দৌড়ে আসার সময় ডালের খোঁচার আঁচড় বাদে আর তেমন কোন জখম হয়নি। শার্টের একপাশে প্রায় অর্ধেকটাই নেই। এর জন্যে দুঃখিত না হয়ে বরং খুশি হলো সে। ভাগ্যিস ছিঁড়েছিল। সাপটা ওর মাথা কামড়ে ধরলে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারত না।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠে হাঁটতে শুরু করল মুসা। চলে এল রবিনের কাছে।

ওর অবস্থা দেখে চোখ কপালে উঠল রবিনের। 'একি! গণ্ডারের সঙ্গে মারামারি করে এসেছ নাকি?'

'না, অ্যানাকোন্ডা।'

'সর্বনাশ! বাঁচলে কি করে?'

'দিয়েছি মেরে কোপ। লেজ হারিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে বাছাধনকে।'

'কত বড়?'

'পঞ্চাশ গজ!'

'ঠাট্টা নয়!'

'বিশ ফুটের কম হবে না।'

'বড় বাঁচা বেঁচেছ। কোথায় ধরল?'

কি করতে গিয়েছিল, খুলে বলল মুসা।

গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল রবিন, 'বোকামি করেছ। কি করতে চাও এখন?'

'আর কি। রাস্তায় লুকিয়ে পেছনের দরজার ওপর নজর রাখা। তুমি কাউকে দেখেছ?'

'নাহ্। একটিবারের জন্যে দরজায়ও বেরোয়নি ভ্যালেন্তি। তুমি?'

'বনের মধ্যে একজন নিগ্রোকে দেখলাম এক পলকের জন্যে। আমাকে বোধহয় দেখেনি।'

'কি করল?'

'কিছুই না। নদীর দিকে চলে গেল।'

আবার রবিনের কাছ থেকে সরে এল মুসা। আর কোথাও বসে চোখ রাখা যায় কিনা ভাবতে ভাবতেই একটা গাছের দিকে নজর পড়ল। নিজের মাথায় নিজে বাড়ি মারতে ইচ্ছে করল। ইস্, এই সহজ কথাটা মনে হয়নি কেন তখন? গিয়েছিল বনে ঢুকে মরতে! ডালে চড়ে বসলেই হয়।

গাছে চড়ে পাতার আড়ালে বসল সে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পেছনের দরজা।

দুপুর নাগাদ কিশোর এল। মুসার গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় শিস দিয়ে ডাকল মুসা। নেমে এল গাছ থেকে। কিশোরকে নিয়ে এগোল রবিন যেখানে বসে আছে।

কি কি ঘটেছে শোনার পর কিশোর বলল, 'দুই জায়গায় বসে পাহারা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে না ভ্যালেন্তি। বলেছি না তখন, বুনোপথ ধরে হেঁটে যাওয়ার কথা কল্পনাই করবে না ও।' মুসাকে বলল, 'তুমি একটুখানি ঢুকেই তো দেখে এসেছ বনের অবস্থা। পালাতে চাইলে ও নদী দিয়েই পালাবে। তাই শুধু এদিকটাতে নজর রাখলেই চলত।'

'দুজনে দুদিকে রেখেছি,' মুসা বলল। 'বলা তো যায় না, অন্য কোন উপায় না দেখে যদি বনে ঢোকারই ঝুঁকি নিয়ে বসে ভ্যালেন্তি?'

তা বটে। পাল্টা যুক্তি দেয়ার আর চেষ্টা করল না কিশোর।

'ওমরভাই কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'হোটেলে। একবার দেখা করে গেছেন ইনতেনদেন্তে। আবার আসার সম্ভাবনা আছে। তাই আর হোটেল থেকে বেরোচ্ছে না ওমরভাই। যাকগে, অনেক বেলা হলো। খেয়ে নাও। আমি খেয়ে এসেছি।' হাতে করে আনা খাবারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল কিশোর।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে মুসা। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

রবিনেরও খিদে পেয়েছে বেশ। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে খবর কি?'

জানাল সব কিশোর। মুসা আর রবিনও তার সঙ্গে একমত হলো, ভ্যালেনসিয়াকে উসকে দিয়ে এদিথকে খুন করিয়েছে ভ্যালেন্তি।

'ভাল কথা,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'বোকো কোথায়?'

'চলে গেছে। তোমরা থাকতেই সেই যে বেরিয়ে গেল, ফিরল কয়েক ঘণ্টা বাদে। আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি। আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেছে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করেছিল ইনডিয়ান ছেলেটা। বলল, অর্কিড ভিলায়।'

'আশ্চর্য!' রবিন বলল, 'তোমাদেরকে কিছু না বলেই চলে গেল? সারাটা

সকাল ও ছিল কোথায়?'

'দেখা হলে তবে তো জিজ্ঞেস করতাম। আমারও অবাক লেগেছে!'

চোদ্দ

বিকেল শেষ হয়ে এল। দিনের গরমটা কমতে শুরু করেছে। পশ্চিম দিগন্তে সোনালি বলের মত ডুবতে বসেছে সূর্য। কিশোররা কি করছে দেখার জন্যে গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে এগোল মুসা। খাওয়ার পর ফিরে এসে আবার উঠেছিল গাছে। ঠায় বসেছিল বাড়ির দিকে তাকিয়ে। কাউকে বেরোতে দেখেনি। কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি।

আগের জায়গাতেই বসে আছে কিশোর আর রবিন।

'কিছু ঘটল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল কিশোর।

'কাউকে দেখোনি?'

'না। মরে আছে যেন বাড়িটা।'

'আমার কাছেও অমনই লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখব নাকি?'

'আমি দেখে এসেছি। দুবার। ভেতরে ঢোকার সাহস পাইনি। অবাক লাগছে আমার। ভ্যালেন্তির কি হলো? সকালে ইনতেনদেন্তে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই পালাল নাকি?'

'আরেকবার গিয়ে দেখে আসব?'

'রাত হোক। অন্ধকারে যাব। এমনও হতে পারে, রাতের অপেক্ষায় বসে আছে সেও।'

'হতে পারে। রাত হলে কিন্তু সমস্যা হবে, খেয়াল করেছ? অন্ধকারে এখান থেকে দরজাটা দেখা যাবে না।'

'ঠিকই বলেছ। কাছে যেতে হবে। এগিয়ে গিয়ে বসতে হবে।'

আরও আধঘণ্টা পর পুরোপুরি ডুবে গেল সূর্য। কালো চাদরের মত ঝুপ করে হঠাৎ নেমে এল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের রাত। জোনাকি বেরোল। ঝিঁঝি ডাকতে লাগল। ক্রোঁক ক্রোঁক করে উঠল নিশাচর ব্যাঙ। দিনের বেলাতেও মশার আক্রমণ ছিল, সেটা বেড়ে গেল শতগুণ। চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের ওপর।

উঠল তিন গোয়েন্দা। সাবধানে এগোল বাড়িটার দিকে। কাছে এসে এমন জায়গায় বসল যাতে দুটো দরজাই চোখে পড়ে। দিনের বেলা হলে এত কাছাকাছি বসা যেত না। বাড়ির ভেতর কেউ থাকলে সহজেই দেখে ফেলত।

তাকিয়ে আছে ওরা। আলো জ্বলল না। কোন জানালায় আলো দেখা গেল না।

'এত অন্ধকারেও আলো জ্বালছে না, ব্যাপারটা জানি কেমন লাগছে আমার!' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'হয় কোন একটা ঘাপলা হয়েছে,

নয়তো আমরা আসার আগেই পালিয়ে গেছে ভ্যালেন্তি। শুধু শুধু এতক্ষণ বসে কষ্ট করলাম।'

'অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর না,' মুসা বলল, 'ঘরে গিয়ে দেখা দরকার।'

বাধা দিল কিশোর, 'দাঁড়াও। আর একটু। সময় তো নষ্ট হয়েছেই, তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না।'

'মানে?'

'এমন হতে পারে, রাতের অপেক্ষাতেই ছিল ভ্যালেন্তি। আশেপাশে নেলসন কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে গুলি খাওয়ার ভয়ে দিনের বেলা দরজাতেও উঁকি দেয়নি। পালানোর ইচ্ছে থাকলে এখন বেরোবে। আর নেলসনেরও ঢোকার ইচ্ছে থাকলে যে কোন মুহূর্তে এখন এসে হাজির হতে পারে।'

কিশোরের যুক্তি খণ্ডন করতে পারল না মুসা। বাধ্য হয়ে বসে পড়ল আবার।

আরও সময় গেল। চাঁদ উঠল। রূপালী করে দিল নদীর পানিকে। সব কিছুই চুপচাপ, শান্ত, সুন্দর। বাড়ির সাদা দেয়ালে রহস্যময় ছায়া ফেলেছে পাম গাছগুলো।

'নাহ্, আর পারব না!' আবার ধৈর্য হারাল মুসা। 'আর বসে থাকলে মশায়ই খেয়ে ফেলবে। তোমরা যাও আর না যাও, আমি গেলাম। না দেখে আর পারব না। যা হবার হবে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। কান পাতল। শব্দ নেই।

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।

'চলো, ভেতরে ঢুকি,' মুসা বলল।

'যদি ভেতরে থাকে লোকটা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'যা করার তাই করব। অত ভয় পেলে চলবে না। ধরে বাঁধব ওকে। জেনেই তো গেছি ও ভ্যালেন্তি। জিজ্ঞেস করব, ফর্মুলাটা কোথায় রেখেছে। না দিলে সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজব।'

কিশোর কিছু বলার কিংবা বাধা দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল মুসা। ভেতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। একটা টর্চ পেলে ভাল হত।

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করে জ্বালল কিশোর। আলোয় দেখা গেল ছোট একটা করিডর। শেষ মাথায় দরজা। হাঁ হয়ে খুলে আছে।

'ওপাশে মনে হয় বসার ঘর,' কানের কাছে বলল মুসা।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। আস্তে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে। কাউকে দেখল না। পা রাখল ঘরের মধ্যে।

আলো নিভিয়ে দিয়েছে কিশোর। একপাশের জানালা খোলা। সেটা দিয়ে বসার ঘরে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় পথ দেখে এগোল মুসা।

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই কিসে যেন হোঁচট লাগল। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। দম বন্ধ করে ফেলল সে।

কি হয়েছে দেখার জন্যে নিজের অজান্তেই টর্চের বোতামে চাপ লেগে গেল কিশোরের।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা লোক। তাতে হোঁচট খেয়েছে মুসা। টর্চের আলোয় একনজর দেখেই আঁতকে উঠল, 'খাইছে!'

রবিন আর কিশোরও দেখল। পড়ে থাকা লোকটা ভ্যালেন্তি। গলা দুই ফাঁক। রক্ত জমাট বেঁধে আছে মেঝেতে।

পুরো আধমিনিট বিমূঢ় হয়ে থাকার পর কথা বলল রবিন, 'বলেছিলাম না, কিছু একটা হয়েছে এ বাড়িতে!'

'ভ্যালেন্তি খুন হয়ে যাবে কল্পনাই করিনি!' মুসা বলল।

'না করার কি হলো? ওকে তো নেলসন মারতেই এসেছিল। ইনতেনদেন্তে চলে আসাতে তখন বেঁচে গিয়েছিল। তিনি যাওয়ার পর পরই নিশ্চয় ফিরে এসে খুন করে রেখে গেছে।'

'আমার মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ও হলে গুলি করে মারত। এ তো জবাই করেছে, সম্ভবত ম্যাচেটি দিয়ে। আর নেলসন হলে খুন করার পর ফর্মুলাটা খুঁজত, তছনছ হয়ে থাকত জিনিসপত্র। সেরকম কিছুই ঘটেনি। সব ঠিকঠাক আছে।'

'তাহলে কে?'

'মনে হয় অনুমান করতে পারছি।'

'কে?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।

'বোকো!'

'কি বলছ?' বিশ্বাস করতে পারল না রবিন।

'ঠিকই বলছি। সারা সকাল ধরে আগুয়ারদিয়েন্তে গিলেছে। প্রতিশোধের নেশায় এমনিতেই আগুন হয়ে ছিল মেজাজ, সেটাকে আরও গরম দিয়েছে ওই মদ। আন্দাজ করে নিয়েছে কে খুন করেছে এদিথকে, কিংবা করিয়েছে। সোজা এসে জবাই করেছে ভ্যালেন্তিকে। তারপর ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে অর্কিড ভিলায়। আমাদের সাথে দেখা না করে যাওয়ার তার এটাই কারণ।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'ঠিক, এই কাজই করেছে। বনের মধ্যে তখন বোকোকেই দেখেছিলাম আমি। শুধু পিঠ দেখেছি বলে চিনতে পারিনি।'

'যা হবার হয়েছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না আমাদের। ফর্মুলাটা খুঁজে বের করে নিয়ে কেটে পড়া দরকার।'

কোন্ ছবিটার কথা বলেছিল ওমর, সেটা খুঁজে বের করল কিশোর। ধাতব ফ্রেমে বাঁধানো। তিন বাই দুই ফুট। সরাতে গিয়ে দেখল বেশ ভারী। পেছনের দেয়ালে কোন আয়রণ সেফ দেখা গেল না। ফাঁপা কিনা ঠুকে দেখল। কোন রকম লুকানো দরজা আছে কিনা, তাও খুঁজল। নিরেট দেয়াল। ছবির পেছনের দেয়ালে বড় খাম লুকানোর মত কোন জায়গা নেই।

এখানে তো নেই। তাহলে? আর কোথায় থাকতে পারে?

টর্চের আলো ফেলে দেখল কিশোর। একটা স্প্যানিশ রাইটিং-ডেস্ক চোখে পড়ল। ছবিটা যেখানে ছিল তার নিচে। ওটার ড্রয়ারগুলোতে খুঁজল। চোরকুঠুরি আছে কিনা দেখল। পাঁচ মিনিটেই বোঝা হয়ে গেল, এখানেও কোথাও লুকানো নেই খামটা।

একধারে একটা কেবিনেট আছে। চারটে ড্রয়ার। এগিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়ার ধরে সবে টান দিয়েছে, এই সময় খুট করে একটা শব্দ শোনা গেল। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল সে সেদিকে। টর্চের আলো ফেলল।

একসঙ্গে লোকটাকে দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। উদ্যত পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে নেলসন।

'থামলে কেন? চালিয়ে যাও,' বলল সে, 'আমার অনেক কষ্ট বাঁচিয়ে দিচ্ছ তোমরা।'

না চেনার ভান করল কিশোর, 'কে আপনি?'

'অবান্তর প্রশ্ন।' মেঝের দিকে চোখ পড়ল নেলসনের। 'আরে, ও কে পড়ে আছে? ভ্যালেন্তি নাকি? পিটিয়ে বেহুঁশ করেছ তোমরা?'

'এর জবাব আপনিই ভাল দিতে পারবেন,' বলে পড়ে থাকা মৃতদেহের ওপর আলো ফেলল কিশোর।

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নেলসন। তারপর পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে ছুঁড়ে দিল মুসার দিকে, 'বাতিটা ধরাও।'

টেবিলে রাখা একটা লণ্ঠন ধরাল মুসা।

মুসার কোমরের ম্যাচেটিটার দিকে তাকাল নেলসন, 'তুমি জবাই করেছ ওকে?'

'আ-আমি! কি বলছেন? আমি খুন করতে যাব কেন ওকে?'

ফিকফিক করে হাসল নেলসন, 'যে জিনিসটা তোমরা খুঁজছ, সেটার জন্যে?'

গম্ভীর গলায় কিশোর বলল, 'দেখুন, মিথ্যে সন্দেহ করছেন আমাদের। আমরা ঢোকার অনেক আগেই মারা গেছে লোকটা। দেখছেন না রক্ত জমাট বেঁধে গেছে?'

দেখল নেলসন। মাথা ঝাঁকাল। 'যে খুশি মারুক। আমার কি? মেরেছে বরং ঝামেলা চুকেছে। আমি ফর্মুলাটা পেলেই খুশি। নাও, দেরি কোরো না আর, খোঁজা শুরু করো।'

কিন্তু নড়ল না কিশোর। নেলসনের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ঘুরে দেখুন।'

হাসল নেলসন, 'ঘুরে দেখতে যাই আর বাড়ি মেরে আমার পিস্তলটা ফেলে দাও। ওসব পুরানো চালাকি, খোকা, নতুন কিছু করো।'

'পুরানো না, নতুনই,' পেছন থেকে বলে উঠল ওমর।

ঝট করে মাথা ঘোরাল নেলসন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। এক থাবায় টেবিলে রাখা ভারি ছবিটা তুলে নিয়ে বাড়ি মারল নেলসনের হাতে। পিস্তলটা উড়ে গিয়ে খটাশ

করে পড়ল মেঝেতে। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল রবিন। দুহাতে চেপে তুলে ধরল নেলসনের দিকে।

পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকল ওমর। মুসাকে বলল, 'দড়ি খুঁজে নিয়ে এসো। বাঁধো ওকে।'

দু-দুটো পিস্তলের মুখে পড়ে চুপ করে থাকল নেলসন। দড়ি দিয়ে ওকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হলো, কিছুই করল না। জানে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

ফর্মুলাটা আবার খুঁজতে আরম্ভ করল কিশোর। ওকে সাহায্য করল অন্য তিনজন।

জিনিসটা এ বাড়িতে আছে কি নেই, নিশ্চিত নয় ওরা। কেবল অনুমান। কতবড়, তাও জানে না। যেহেতু ফর্মুলা, আশা করছে বড় একটা খামে ভরার মত কয়েক পাতা কাগজ হবে। আলো বেশি থাকলেও এককথা ছিল। অন্ধকারে একটা বাড়ি থেকে একটা খাম খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। এমনও হতে পারে, দেয়ালের কোনখানে গর্ত করে তাতে ভরে ওপরটা আবার প্ল্যাস্টার করে দিয়েছে ভ্যালেন্তি। তাহলে ও ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ও তো মৃত। কে বলে দেবে কোনখানে ভরেছে?

প্রথমে বসার ঘরে খোঁজা শেষ করল ওরা। তারপর ঢুকল বেডরুমে। ওখানেও পাওয়া গেল না। বাকি ঘরগুলোতে খুঁজতে লাগল তখন। অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। বসার ঘরে ফিরে এল চারজনে।

'কোন লাভ হলো না,' নেলসনের দিকে তাকিয়ে বলল ওমর। 'মনে হচ্ছে অহেতুক সময় নষ্ট করেছি আমরা। তোমাকে কি করা যায় এখন, বলো তো?'

চুপ করে রইল নেলসন।

'কি আর করবেন?' মুসা বলল, 'থাক এখানেই। ইনতেনদেন্তেকে গিয়ে খবর দেব। জেমসকে খুনের দায়ে এসে ধরে নিয়ে যাবে।'

'তা মন্দ বলোনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'কিন্তু আমরা এতরাতে এখানে কি করছিলাম, জিজ্ঞেস করবেন না তিনি? ভ্যালেন্তিকে কে খুন করেছে সেটা নিয়েও একটা সন্দেহের সৃষ্টি হবে।'

কিশোর বলল, 'ফর্মুলার কথা তাঁকে জানাতেই হবে এখন। সব খুলে বলব। আমাদের পক্ষে মিস্টার বুমার আছেন। তেমন কোন অসুবিধেয় পড়ব না আমরা।'

মাথা দোলাল ওমর, 'হুঁ, এটাই একমাত্র পথ। চলো, যাই।' নেলসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসে থাকো চুপচাপ। বেশি নড়াচড়া করে জাগুয়ার কিংবা অ্যানাকোণ্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ কোরো না। এসে কোঁৎ করে গিলে ফেললে আমাদের কোন দোষ নেই।'

এবারও জবাব দিল না নেলসন। আরেক দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে অবশ্য দরজা বন্ধ করে শেকলটা তুলে দিল ওমর, যাতে ভ্যালেন্তির রক্তের গন্ধ পেয়ে কোন বুনো জানোয়ার ঘরে ঢুকতে না পারে।

পনেরো

হোটেলে যখন পৌঁছল ওরা, রাত আর বেশি বাকি নেই। সোজা যার যার ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। যতটা ঘুমানো যায়, লাভ।

শহরে ঢুকে ইনতেনদেন্তেকে খবর দিতে যায়নি ওরা। আসার পথেই ঠিক করেছে কিশোর, পুলিশকে খবর দেয়ার আগে ভোরবেলা আবার যাবে ক্যাসা কারাদোনায়। দিনের আলোয় শেষবারের মত আরও ভাল করে খুঁজে দেখবে ফর্মুলাটা পাওয়া যায় কিনা। না পেলে ওদের মিশন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সবার আগে কিশোরের ঘুম ভাঙল। ডেকে তুলল সবাইকে। আবার রওনা হলো ক্যাসা কারাদোনায়।

ভোর হয়নি পুরোপুরি, সবে হচ্ছে। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলো তখনও জেগে আছে, তবে অনেক মলিন হয়ে গেছে আলো। ওদের রাত করে হোটেলে ফেরা, আবার ভোর না হতেই বেরিয়ে যাওয়া—এই যে আসা-যাওয়া, সবই লক্ষ করেছে ভ্যালদেজ। অবাক হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কোন মন্তব্যও করেনি। লোকটা অতিমাত্রায় ভদ্র।

ক্যাসা কারাদোনায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। ধূসর আলো ফুটেছে বনের ভেতর। বাষ্পের মত হালকা কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। মৃত্যুপুরীর মত খাঁখাঁ করছে। দরজাটা যেমন লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওরা, তেমনি আছে।

দরজা খুলে বসার ঘরে ঢুকেই স্থির হয়ে গেল ওমর। নেলসনকে যে চেয়ারে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেটা খালি। দড়িটা খুলে পড়ে আছে পায়ার কাছে। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাটা পালিয়েছে!'

ওমরের পেছনে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। তুলে নিল ছবির ভাঙা, বাঁকাচোরা ফ্রেমটা। মুসা বাড়ি মারার পর বেঁকে গিয়েছিল, ভাঙেনি। ওমরের দিকে ফিরে বলল, 'কি ঘটেছে বুঝতে পারছেন!'

'ওই ছবির নিচে মলাটের পরতে লুকানো ছিল খামটা!' তিক্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'নিয়ে পালিয়েছে নেলসন!'

'কিন্তু দড়ি খুলল কি করে?' মুসা বলল, 'খুব শক্ত করে বেঁধেছিলাম। খুলতে পারার কথা তো নয়!'

'নিশ্চয় তার কোন সহকারী আছে। বাইরে বসেছিল কোথাও, সম্ভবত ক্যানূতে। নেলসন ফিরতে দেরি করায় দেখতে এসেছিল কি হয়েছে। বাঁধন খুলে দিয়েছে। খামটা নিয়ে পালিয়ে গেছে দুজনে,' চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের। 'ইস্, আমি একটা গাধা! একবারও মনে হলো না ছবিটার ভেতরে দেখার কথা!'

'সারাদিন বসে বসে করেছ অপেক্ষা,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল ওমর, 'ঘরে ঢুকে দেখেছ জবাই করা লাশ; তার ওপর নেলসনের যন্ত্রণা, এবং তার ওপর অন্ধকার—মাথা কত আর ঠিক থাকে? নেলসন ব্যাটা তো কোন পরিশ্রমই করেনি, চুপচাপ বসে বসে শুধু ভেবেছে। ওরকম ভাবার সময় পেলে তুমিও বুঝে ফেলতে কোথায় আছে খামটা।'

'কিন্তু এখন উদ্ধার করতে হবে ওটা! যে ভাবেই হোক!'

'কি ভাবে?'

'নৌকা করে নদীপথে গেছে সে, কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল। 'নদীতে যা স্রোত এখন, উজানের দিকে যেতে পারবে না। গেলে একমাত্র ভাটির দিকে। সময়ও খুব বেশি পায়নি, বেশিদূর যেতে পারেনি এখনও। আমার ধারণা পুয়ের্তো ভেকোর দিকে গেছে সে। সেখানে স্টীমার ধরে চলে যাবে ম্যানাওতে। প্লেন নিয়ে তাড়া করলে সহজেই ধরে ফেলতে পারব ওকে।'

'কিন্তু প্লেন তো রয়েছে অর্কিড ভিলায়,' মুসা বলল।

'সেখানেই যাব। জলদি চলো। হোটেল থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে এখুনি রওনা হতে হবে।'

ঘর থেকে ছুটে বেরোল চারজনে। প্রায় দৌড়ে চলল শহরের দিকে। ভাগ্য ভাল, এত ভোরে শহরের পথ একেবারে নির্জন। অনেক রাতে ঘুমিয়ে ভ্যালডেজেরও ঘুম ভাঙেনি। সুতরাং আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো বের করে নেয়ার সময় কেউ দেখল না ওদের, কাউকে কৈফিয়ত দিতে হলো না।

বনের ভেতর দিয়ে অর্কিড ভিলায় ফেরাটা আসার দিনের চেয়ে সহজ হলো। কারণ, বৃষ্টি নেই, রাস্তায় কাদা নেই, মাটি অনেক শক্ত।

বন পেরোতে কতক্ষণ লাগল, হিসেব রাখল না কেউ। তবে কিশোরের অনুমান, ঘণ্টা দুয়েক।

অর্কিড ভিলায় পৌঁছে দেখে আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছেন বুমার। সঙ্গে বোকো। শ্রমিকেরা কাজ করছে। এত সকালে ওদের দেখে অবাক হলেন তিনি। কিন্তু কথা বলল না ওমর। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমেই দৌড় দিল বিমানের দিকে।

তিন গোয়েন্দাও ছুটল তার পেছনে।

পায়ারে বাঁধা আছে বিমানটা। ককপিটে চড়ল ওমর। তিন গোয়েন্দাও যতটা সম্ভব দ্রুত যার যার সীটে বসে সীটবেল্ট বেঁধে নিল।

ট্যাক্সিইং করে খোলা নদীতে বের করে আনা হলো বিমান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশে উড়ল।

এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেল মুসা, 'মিস্টার বুমার ভাববেন আমরা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি।'

'ভাবলে খুব একটা ভুল হবে না,' বলল রবিন।

কিশোর কোন মন্তব্য করল না, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

ভাটির দিকে উড়ে চলল ওমর। হিসেব মত নেলসন এখন ওদিকেই আছে। অর্কিড ভিলা পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। নদীতে যা স্রোত, তাতে নৌকার গতি অনেক। কয়েক মিনিট পর বলল, 'নিচে চোখ রাখো। কোন ক্যানূতে দুজন লোক দেখলেই বলবে।'

নদী এখানে বেশ চওড়া, প্রায় আধমাইল। নানা ধরনের নৌকা দেখা যাচ্ছে। মাল বোঝাই বড় নৌকা থেকে শুরু করে বালসা কাঠের ভেলা, ছোট্ট ক্যানূ, সবই আছে। স্রোত পেয়ে ভাটিতে চলেছে সবাই। যার যা কাজ সেরে নেবে এই সুযোগে। তবে ভেলাই বেশি, স্রোত কিংবা ঢেউ ওগুলোর তেমন ক্ষতি করতে পারে না। ছোট ক্যানূ খুব কম। ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে যাওয়ার ভয় আছে বলে মাঝনদীতে যাচ্ছে না ওগুলো, কিনার ধরে চলছে। ওমরও তাই নদীর কিনার ঘেঁষেই উড়ছে।

কিছুদূর এসে নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই পুয়ের্তো ভেকো নজরে এল। কিন্তু নেলসনের নৌকাটা কই?

কিশোর বলল, 'ওই পাড় ধরে যাচ্ছে না তো?'

বিমানের নাক ঘুরিয়ে দিল ওমর। নদী পেরিয়ে চলে এল অন্য পাড়ে। ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। একটা ক্যানূতে দুজন লোককে দেখা গেল। একজনের পরনে দেশী পোশাক, আরেকজনের বিদেশী।

কাছে এসে বিমান আরেকটু নামাল ওমর।

'ওরাই!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'ওই যে নেলসন!'

সঙ্গের যে লোকটা ক্যানূ বাইছে, তাকেও চিনতে পারল কিশোর। সেই দাঁতপড়া। দড়ি খুলে দিয়ে নেলসনকে বের করে এনেছে নিশ্চয় ও-ই।

'হয় ফর্মুলা উদ্ধার করব, নয়তো রিও হুরারা নদীর তলদেশ দেখাব আমি ব্যাটাদের,' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল ওমর।

ক্যানূর কয়েক ফুট ওপর দিয়ে বিকট গর্জন তুলে উড়ে গেল সে। নৌকার আরোহীদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল, সক্ষম হলো। বাড়ি খাওয়ার ভয়ে মাথা নুইয়ে ফেলল দুজনে।

কিছুটা উড়ে গিয়ে নাক ঘোরাল ওমর। নদীতে নামাল বিমান। ট্যাক্সিইং করে ছুটে এল। নৌকায় ধাক্কা লাগে লাগে এই সময় শাঁ করে আবার নাক ঘুরিয়ে দিল বিমানের। অল্পের জন্যে নৌকায় ধাক্কা লাগল না, পাশ কাটিয়ে এল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'ভাল চাও তো ফর্মুলাটা দাও, নইলে দেব ডুবিয়ে!'

জবাবে নেলসনও আরেকটা দাঁড় তুলে নিয়ে পানিতে ফেলল। প্রাণপণে বাইতে শুরু করল দুজনে।

'বেশ,' দাঁতে দাঁত চাপল ওমর, 'সাবধান করেছি, শোনোনি। এবার বোঝাব মজা!'

পঞ্চাশ গজমত এগিয়ে ঘুরল সে। ক্যানূর দিকে ছুটল আবার। এবার সত্যি সত্যি ধাক্কা মেরে উল্টে দেয়ার ইচ্ছে। নৌকার কয়েক গজের মধ্যে পৌঁছে যেতেই কাণ্ডজ্ঞানীয় ঘটনা ঘটল। স্রোতের টানে হঠাৎ সামনে এসে

পড়ল একটা ভাসমান মরা গাছ। চিৎকার করে উঠল মুসা, 'খাইছে! ওমরভাই, দেখে চালান!'

ওমরও দেখেছে গাছটা। বিমানের তলা বাঁচানোর জন্যে শাঁই করে ডানে কাটল। তাতে একপাশে অতিরিক্ত কাত হয়ে গেল বিমান। ওই পাশের ডানা লেগে আরেকটু হলে মাথা আলগা হয়ে যেত ক্যানূর দুই আরোহীর। মাথা বাঁচানোর জন্যে নৌকার তলায় ডাইভ দিয়ে পড়ল ওরা। নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল নৌকা। পাশ থেকে আঘাত হানল স্রোত। এত নড়াচড়া, তার ওপর ঢেউ আর স্রোতের ধাক্কা সামলাতে পারল না ছোট্ট ক্যানূ, গেল কাত হয়ে উল্টে। পানিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করল দুই আরোহী। সাঁতার জানে দুজনেই, কিন্তু পানিতে ডুবে মরার ভয়ে নয়, চিৎকার করছে অন্য কারণে। আমাজন নদীর ভয়াবহ অধিবাসীদের কথা জানা আছে ওদের—মারাত্মক পিরানহা, অ্যালিগেটর আর বৈদ্যুতিক বান তেমব্লাদোরেস।

জানালা দিয়ে আবার মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল ওমর, 'খামটা দাও। আমি তোমাদের তুলে নেব।'

এবার আর প্রতিবাদ করল না নেলসন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে খামটা বের করে মাথার ওপর তুলে ধরল।

মুসাকে বলল ওমর, 'আমি কাছে নিয়ে যাচ্ছি। খামটা নিয়ে নাও আগে। তারপর তুলব।'

দরজা দিয়ে শরীর বের করে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে বসল মুসা। নেলসনের কাছাকাছি আসতে হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল খামটা।

'রবিন, পিস্তলটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

পকেট থেকে নেলসনের পিস্তলটা বের করল রবিন, আগের রাতে যেটা কেড়ে নিয়েছিল।

'ওদের দিকে তাক করে রাখবে,' বলল ওমর।

'যদি কোন চালাকির চেষ্টা করে?'

'গুলি কোরো না, শুধু ভয় দেখাবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ধাক্কা মেরে আবার ফেলে দেবে পানিতে।'

কিন্তু কোন রকম চালাকি করল না নেলসন। ওর সহকারী দাঁতপড়া লোকটা তো নয়ই। পিস্তল দেখে কুঁকড়ে গেছে। ভেজা কাপড়ে জবুথুবু হয়ে বসে রইল।

ট্যাক্সিইং করে নদী পার হয়ে গিয়ে অন্যপাড়ে পুয়ের্তো ভেকোর কাছে কাদাপানিতে দুজনকে নামিয়ে দিল ওমর।

কটমট করে তাকিয়ে রইল নেলসন। অসহায় ক্ষোভ দেখানো। কিছুই করার নেই আর তার।

আবার আকাশে উড়ল ওমর।

অর্কিড ভিলার কাছে ল্যাণ্ড করে পায়ারের দিকে এগোতেই দৌড়ে এলেন বুমার।

বিমান থেকে নেমে ক্লান্ত স্বরে ওমর বলল, 'আপনাকে টেনশনে রাখার জন্যে দুঃখিত। ঘরে চলুন, সব বলছি।'

ঘরে এসেও তখুনি সব শোনার জন্যে চাপাচাপি করলেন না বুমার। ওদের অবস্থা বুঝতে পেরে আগে গোসলের ব্যবস্থা করলেন। তারপর নাস্তা।

বসার ঘরে কফি খেতে খেতে সব কথাই বলল তাঁকে ওমর। ভ্যালেন্তিকে খুনের ব্যাপারে ওরা যে বোকোকে সন্দেহ করেছে, এ কথাটা কেবল বাদ দিয়ে।

'হুঁ, ওই ভ্যালেন্তি লোকটা ছিল বিষাক্ত অর্কিডের মত,' আপন মনে বিড়বিড় করলেন বুমার। 'অপূর্ব সুন্দর হয় কিছু কিছু অর্কিড, দারুণ সুগন্ধ, কিন্তু বিষে ভরা। ভ্যালেন্তিরও চেহারা সুন্দর, বুদ্ধিও ছিল, কিন্তু মনটা কুটিলতা আর শয়তানিতে ভরা।... যাকগে,' ওমরের দিকে মুখ তুললেন তিনি, 'এবার তাহলে কি করবেন?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি ফিরে যাব। তবে তার আগে আরেকবার ক্রুজোয়াড়োতে যেতে হবে, হোটেলের বিল চুকাতে আর আমাদের মালপত্রগুলো আনতে। ইনতেনদেন্তেকেও আর অন্ধকারে রাখতে চাই না।'

'আপনাদের যাওয়ার আর দরকার নেই,' হাত নেড়ে বললেন বুমার। 'চুপচাপ ঘুমানগে। সব ব্যবস্থা আমি করছি। বোকোকে পাঠাচ্ছি এখনই।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার বুমার। অনেক সাহায্য করলেন।'

বোকোকে ডেকে পাঠালেন বুমার।

ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল বোকো। যতক্ষণ থাকল ওঘরে, মাথা নিচু করে রইল। ওমর কিংবা তিন গোয়েন্দার কারও দিকে তাকাল না। ওরাও কিছু বলল না। এমন কোন ইঙ্গিত করল না যাতে বোকো বুঝে যায় ভ্যালেন্তিকে খুনের ব্যাপারে ওকেই সন্দেহ করছে ওরা।

খুনের রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব এখন ইনতেনদেন্তের। ওদের কাজ শেষ।

সোনার খোঁজে

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

'বসো,' ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার বললেন।

তাঁর ডেস্কের সামনে চেয়ার টেনে বসল কিশোর।

'কাল তোমাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম, ও নিয়ে ভেবেছ কিছু?'

'ভেবেছি।'

'কি মনে হলো?'

'এর পেছনে বড় ধরনের কোন ব্রেন কাজ করছে। আর্মির লোক হতে পারে, তা-ও ছোটখাট কেউ নয়, কমপক্ষে জেনারেল। ভালমত ট্রেনিং দিয়ে কোন দল গড়া কেবল এ ধরনের লোকের পক্ষেই সহজ।'

'কেন?'

'কারণ বিপজ্জনক কাজ করার জন্যেই তৈরি করা হয় এদের। যারা শত্রুর এলাকায় ঢুকে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায়, তাদের জন্যে ব্যাংকে ঢুকে অস্ত্রের মুখে ডাকাতি করা কিংবা রাতের বেলা ব্যাংকের ভল্ট ভাঙা কোন ব্যাপারই নয়। ব্যাপারটাকে মজার খেলা হিসেবেও নিতে পারে এরা।'

'মানে?'

'অস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কাটে এদের সারাজীবন। শত্রু না পেলে বোর হয়ে যায় অনেকেই। তখন উত্তেজনা আর আনন্দের জন্যে শত্রু খুঁজে বেড়ায়। শত্রু তৈরিও করে নেয় অনেকে।'

'বলে যাও।'

'ইচ্ছে করে অপরাধ করে ওরা। পুলিশ বাহিনীকে শত্রু বানিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে শুরু করে।'

'এই অদ্ভুত কথাটা মনে হলো কেন তোমার?'

'হলো, তার কারণ, একজন জেনারেলের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়—অন্তত খাওয়াপরার জন্যে ডাকাতি করে টাকা কামানোর মানসিকতা তার হবে না। তাহলে কি জন্যে করল? একটাই জবাব—ঝুঁকি নেয়ার জন্যে। আর ঝুঁকি মানেই বিপদ, উত্তেজনা এবং লড়াইয়ের আনন্দ। পুলিশকে শত্রু বানিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে। সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে এখানেই তার তফাত। এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস যোগ হতে পারে অবশ্য—টাকার নেশা। ড্রাগের মত এ নেশাটা রক্তে ঢুকে যায় এই ধরনের মানুষদের। উত্তেজনা আর টাকা, টাকা আর উত্তেজনা! এবং এই দুটো জোগাড়ের জন্যে দুনিয়ার হেন কুকর্ম নেই, যা এরা করতে পারে না।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। ড্রয়ার থেকে প্যাকেট বের করে

সিগারেট ধরালেন। 'আমিও ঠিক এ রকম করেই ভেবেছি। যাকগে। এখন প্রশ্ন হলো, ওকে ধরব কিভাবে?'

কাঁধ উঁচু করল কিশোর। 'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বাড়তে বাড়তে একদিন এমন পর্যায়ে চলে যাবে লোকটা, নিজের কবর নিজেই রচনা করবে।'

'আর কত বাড়বে?'

'নিশ্চয় বাড়ার আরও বাকি আছে তার। আত্মবিশ্বাসে যখন অন্ধ হয়ে যাবে, তখনই করবে ভুল এবং ধরাটা পড়বে।'

'আর ততদিনে পাবলিক আমাদের তুলোধুনো করে ছেড়ে দিক। অতদিন অপেক্ষা করা যাবে না।'

'সেটা আপনাদের ব্যাপার, স্যার। আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, জানালাম। এর বেশি কিছু করার নেই আমার।'

'তাই কি?'

'কেন আপনার সন্দেহ আছে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে ঝুঁকে বসল কিশোর।

চুপচাপ সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ইচ্ছে করলেই কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে পারো তুমি, আই মীন, তোমরা।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর, 'আমরা মানে?'

'তুমি, মুসা, রবিন। তিন গোয়েন্দা।'

'লোকটাকে খুঁজে বের করার পরামর্শ দিচ্ছেন নাকি?'

মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'সোনাগুলো নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। কোথায় আছে ওগুলো, অনুমান করতে পারো?'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'একশো কোটি টাকার সোনা, স্যার, মুখের কথা নয়। কোথায় লুকিয়েছে কিভাবে বলব? এ ছাড়া বাকি যে সব সোনাদানা আর অলঙ্কার ছিনতাই করেছে রাস্তা থেকে, সেগুলোর কথা নাহয় বাদই দিলাম। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, লোকটার মগজ আছে। টাকা আছে। এ দুটো জিনিস থাকলে দুনিয়ার অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। আমাদের গাধা বানিয়ে ছেড়েছে সে, ঘোলাপানি খাইয়ে দিয়েছে।'

'এবং তাতেই তার আনন্দ।'

'সেই আনন্দটা মাটি করার জন্যেই তোমাদের সাহায্য নিতে চাইছি। তার নজর সোজা পুলিশের দিকে, আর কারও দিকে নয়। সময় থাকতে থাকতে সেই সুযোগটাই নিতে চাই আমি। এই দায়িত্বটা আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিতে চাই।'

'দায়িত্বটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না, স্যার?'

'ছোট দায়িত্ব তো অনেকই পালন করেছ, এবার নাহয় বড়টাই করলে। বয়েসও তো বাড়ছে। আগে চালাতে সাইকেল, এখন চালাও গাড়ি।...শুরু করে দাও, পারবে।'

'ভরসা দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, আমি রাজি। মুসা আর রবিনের সঙ্গে আলাপ করে নিই। ওরা রাজি হলে জানাব আপনাকে।'

'হবে,' টোকা দিয়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'এক কাজ করো না। ওমরের সাহায্য নাও।'

'বলে দেখব। হাতে কোন কাজ নেই ওমরভাইয়ের। রাজি হয়েও যেতে পারে।'

আরও দুবার টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন।

বুঝল, যাবার সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ঠিক আছে, স্যার, চলি। ফোন করব।'

মাথা কাত করে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আচ্ছা।'

থানা থেকে বেরোল কিশোর। স্ট্যান্ড থেকে মোটরসাইকেলটা নামিয়ে নিয়ে রওনা হলো ওকিমুরো করপোরেশনের অফিসে। হ্যাঙ্গার আর একটা প্রাইভেট রানওয়ে ভাড়া নিয়ে সেখানে অফিস এবং ওঅর্কশপ দুইই করেছে ওরা।

পাওয়া গেল তিন রত্নকে—মুসা, রবিন আর ওমর। কাজকর্ম কিচ্ছু নেই। অলস সময় কাটানো। কাগজ দিয়ে খেলনা বিমান বানিয়ে কে কতটা বেশি সময় ধরে ওড়াতে পারে সেই খেলা চলছে। বড়ই ছেলেমানুষী খেলা। কিন্তু ওই যে, হাতে নেই কাজ তো খই ভাজ।

কিশোরকে দেখে মুখ তুলল ওমর, 'কোথায় গিয়েছিলে? ভোররাত থেকেই নাকি নিখোঁজ?'

'ভোররাত নয়, সকাল আটটা। নাস্তা করতে বসলাম, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের ফোন এল। জরুরী কথা বলার জন্যে ডেকেছেন।'

হাতের খেলনাটা ছুঁড়তে গিয়ে থেমে গেল ওমর, 'পুলিশের বড়কর্তা!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। একটা চেয়ার টেনে বসল।

'খাইছে!' হাঁ হয়ে গেল মুসা। 'এই সাতসকালে তোমাকে খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন কেন?'

খেলনা বিমানের কথা ভুলে গেল সবাই। টেবিল ঘিরে বসে কিশোরের দিকে তাকাল।

'একটা প্রশ্নের জবাব চাই,' এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল কিশোর, রবিনের ওপর স্থির হলো দৃষ্টিটা। 'একশো কোটি টাকার সোনার বার হাতে দিয়ে যদি লুকিয়ে ফেলতে বলা হয় তোমাকে, এমন কোথাও, কেউ যাতে খুঁজে না পায়, কোথায় লুকাবে?'

'এটা কি কোন খেলা?'

'না।'

'ধাঁধা?'

'না। এটা খুব সিরিয়াস প্রশ্ন। ভেবেচিন্তেই জবাব দাও। তবে বেশি সময় নিয়ো না।'

প্রায় মিনিট দুয়েক চুপচাপ ভাবল রবিন। তারপর বলল, 'বড় দেখে বাড়ি কিনব একটা, যেখানে বাগানে পুকুর আছে, তাতে পদ্মফুল আছে। সোনাগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে পানিতে ফেলে দেব। প্রচুর হাঁস ছেড়ে দেব যাতে সারাক্ষণ ঘোলা করে রাখে পানি, পুকুরের তলা দেখা না যায়। জবাবটা কেমন হলো?'

'কিছুই হলো না,' মুখ বাঁকাল কিশোর। 'এটা অনেক পুরানো বুদ্ধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা ঢুকে পড়লে অনেক লোকই তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র বাঁচানোর জন্যে ওরকম করে পানিতে ফেলে দিয়েছিল। ফ্রান্সের অনেক লোক আজও তাদের পুরানো মদের বোতল খুঁজে বেড়ায় পুকুরে। আরও ভালমত ভাব। নতুন কিছু বের করো।'

মুসা বলল, 'মাটির নিচে ঘর আছে এমন একটা বাড়ি কিনব আমি। কয়েক টন কয়লার নিচে লুকিয়ে ফেলব সোনাগুলো।'

'এটাও হলো না। কয়েক টন কয়লা গোপনে একা বয়ে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। শ্রমিকেরা রাখতে গেলে সন্দেহ করবে। এই গ্যাসের যুগে অত কয়লা দিয়ে বাড়িতে কি করবে তুমি ভেবে অবাক হবে। আর ওদের সন্দেহ হওয়া মানেই এককান, দুকান থেকে তিনকান, তারপর পুলিশ। অন্য কিছু বলো।'

'বেশ। বাগানে গুহা আছে, এরকম একটা বাড়ি কিনব। গুহায় লুকাব সোনাগুলো।'

'বাগানে গুহাওয়ালা ওরকম বাড়ি তুমি কোথায় পাবে?'

'নিশ্চয় আছে কোথাও।'

'খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগবে। ততদিন ডাকাতি করে আনা সোনাগুলো রাখবে কোথায়? রাস্তায় কিংবা বাড়ির সামনে স্তূপ করে ফেলে রাখতে পারবে না। আরও ভাল কিছু ভাব।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

সিগারেট ধরাল ওমর। 'সোনাগুলো হাতে পাওয়ার আগেই লুকানোর জায়গাটা রেডি করে রাখতে হবে, নাকি পাওয়ার পর?'

কিশোর বলল, 'পাওয়ার আগেই রেডি করে ফেলতে হবে। কারণ আপনি শিওর হয়ে গেছেন পাওয়া যাবেই।'

'তাহলে খুব সহজ,' গলগল করে নাকমুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল ওমর। 'শহর থেকে দূরে একটা খামারবাড়ি কিনব। পুরানো টিন দিয়ে একটা ছাউনি তুলে পুরানো একটা মালবওয়া ঘোড়ার গাড়ি ঢোকাব তাতে। সোনাগুলো গাড়িতে রেখে গরুর গোবর দিয়ে ঢেকে দেব, যাতে কেউ ওদিকে চোখ তুলেও না তাকায়।'

'তারপর কিছুটা সোনা বের করতে চাইলে কি করবেন? বার বার গরুর গোবরে হাত ঢোকাবেন? নোংরা হয়ে যাবে না? পুলিশ যদি সন্দেহ করে ওই ঘরে ঢুকে পড়ে কোন কারণে, নিশ্চয় চোখ পড়বে গাড়িতে রাখা গোবরের স্তূপ। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তো বটেই, উদ্ভটও লাগবে ওদের কাছে—

ঘোড়ার গাড়িতে গোবর কেন? বের করতে কি আর সময় লাগবে তখন?'

'তাই তো! একথাটা তো ভাবিনি,' না ভাবার ক্ষতি পূরণের জন্যেই যেন কষে এক টান লাগাল সিগারেটে। 'তাহলে অন্য কিছু রাখব গাড়িতে—খড়, বাঁধাকপি, মূলা, মটরশুঁটি...'

'তারজন্যে প্রথমে ওগুলোর চাষ করতে হবে আপনাকে। বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। অত তরকারি একসঙ্গে কেউ কেনে না, দোকানদারেরই সন্দেহ হবে, অন্য কারও কথা বাদই দিলাম। তারপরেও সমস্যা আছে। গাড়িতে ফেলে রাখলে পচতে সময় লাগবে না। পুলিশ তাতেও সন্দেহ করবে। এতগুলো সব্জি একটা গাড়িতে রেখে পচানো হলো কেন?'

'দুঃখিত। তাহলে আর পারলাম না,' মাথা নাড়ল ওমর।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এই ধাঁধার প্রোগ্রাম শুরু করার পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে নাকি তোমার?'

'আছে।'

'তাহলে ভুল ধরে ধরে আমাদের মোটা মাথাগুলোকে আরও ঘোলা না করে তুমিই এর জবাব দিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'দেব কি,' হাসল কিশোর, 'আমি নিজেও জানি না।'

'অন্য কেউ জানে?'

'জানে।'

'কে সে?'

'জানি না।'

'ওফ্,' খুলি আঁকড়ে থাকা চুলগুলো খামচে ধরল মুসা, 'মাথা ধরে যাচ্ছে! রহস্য করে কথা বলাটা থামাও না দয়া করে!'

'শোনো, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। একশো কোটি টাকার সোনা ব্যাংক থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে কেউ একজন। কে সে, কোথায় লুকিয়েছে, জানার জন্যে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে পুলিশেরও। কিছু করতে না পেরে শেষে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন ক্যাপ্টেন। বলেছেন, যে করেই হোক বের করে দিতে হবে সোনাগুলো।'

দুই

'সোনাগুলো রকি বীচের আশেপাশেই আছে, এ রকম ধারণা কেন হলো ক্যাপ্টেনের?' জানতে চাইল ওমর।

'এত তাড়াতাড়ি কোথায় সরাবে?' কিশোর বলল, 'যেখানে সেখানে বিক্রি করা যায় না সোনার ইঁট। যদি কোন বিদেশী ক্রেতার কাছে বিক্রি করে, মাল হাতে পাওয়ার আগে টাকা দেবে না। এত সোনা পাচার করা একটা বিরাট ঝক্কি। সোনার ওজন এত বেশি যে একজন মানুষ হাতে একটা বা

দুটোর বেশি ইঁট বয়ে নিতে পারবে না। শহর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিটি পথের ওপর পুলিশের কড়া নজর রয়েছে। ওদের চোখ এড়িয়ে কোনমতেই বের করা যাবে না ওগুলো। তারপর রয়েছে টাকা লেনদেনের প্রশ্ন। কোন ক্রেতা যদি আগেভাগে টাকা দিয়েও ফেলে কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে জমা করতে গেলে ভুরু উঁচু করে ফেলবেন যে কোন ব্যাংকের ম্যানেজার। এত টাকা কোত্থেকে এল, প্রশ্ন তুলবেনই। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, সোনাগুলো কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে।'

'উদ্ধার করতে কি প্লেন লাগবে?'

'জানি না। লাগতে পারে।'

'আমাদের কাছে এখন যেগুলো আছে, ব্যবহার করলে নিশ্চয় ভাড়া পাওয়া যাবে?'

'শুরুতেই একেবারে পেশাদারি চিন্তাভাবনা,' হেসে ফেলল কিশোর। 'যাবে। ভাড়া না দিলে দেব কেন?'

'তদন্ত করতে গেলে যে খরচ হবে, সেটা দেবে কে?'

'অবশ্যই ব্যাংক। একশো কোটি টাকার সোনা, সোজা কথা নয়। উদ্ধারের আশা দেখলে দুহাতে খরচ করতে রাজি হয়ে যাবে ওরা।'

'আমাদের পারিশ্রমিকও নিশ্চয় পাওয়া যাবে?'

'যাওয়া তো উচিত। যদি আমরা নিই।'

'না নেয়ার কি হলো? তোমরা শখের গোয়েন্দা, বাপের হোটেলে খাও, তোমরা বিনে পয়সায় করে দিলে দাওগে। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে, জমিদারি বেচে শার্লক হোমসগিরি এখন আর পোষায় না। আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে রাজি নই।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'একটু আগে যে খেলনা প্লেন ওড়াচ্ছিলেন?'

'একে সময় নষ্ট বলা যাবে না। বিনোদন। আর বিনোদনও বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। সময় খরচটাকে পয়সার হিসেবে মেপে নিলেই...'

'পারিশ্রমিক পেলে কাজটা করতে রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, পাবেন। বলব ক্যাপ্টেনকে। এখন কাজের কথায় আসা যাক। ধরে নিলাম সোনাগুলো রকি বীচের আশেপাশেই কোথাও আছে। কোথায় রেখেছে সেটা নিয়ে প্রথমে মাথা না ঘামিয়ে বরং কোন্ ধরনের লোকের কাজ হতে পারে এটা, সেটা ভাবা যাক। সূত্র মেলার সম্ভাবনা আছে। ধরা যাক, দলের নেতা একজন সংগ্রাহক।'

'তা তো বটেই। নইলে সোনার বার সংগ্রহ করার শখ হবে কেন?'

'আমি সোনার কথা বলছি না, ও একজন আসল সংগ্রাহক। মানে, অ্যানটিক জিনিসপত্র, ছবি, এ ধরনের জিনিস সংগ্রহের বাতিক আছে।'

'হুট করে সেটাই বা মনে হলো কেন তোমার? অলঙ্কার, সোনাদানা এগুলোর সঙ্গে পুরানো অ্যানটিকের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আছে বলেই বলছি। গত কয়েকদিনে কয়েকটা মিউজিয়াম থেকে দামী

অনেক অ্যানটিকও চুরি গেছে। ব্যাংক ডাকাতি, রাস্তাঘাটে অলংকার ছিনতাই আর এই অ্যানটিক চুরির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। তারমানে ধরে নেয়া যায় অপরাধগুলো বিশেষ কোন একটা দলের।'

'বেশ, ধরলাম। তাতে লাভ কি?'

'একটা ঘটনার কথা বলি। পত্রিকায় পড়েছিলাম। একবার মার্থা হ্যামিলটন নামে এক মহিলার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। পুলিশ সন্দেহ করল, ডাকাতির পেছনে বড় ধরনের কোন লোকের হাত রয়েছে, আমাদের এ কেসটার মত। নজর রাখতে শুরু করল ওরা। গোয়েন্দা মোতায়েন করল। চোরাই মালের লিস্ট দেখে অবাক হলো গোয়েন্দা। দামী দামী গহনার সঙ্গে একটা কম দামী জিনিসও নিয়ে গেছে চোর। একটা সাধারণ ফুলদানি।'

'ফুলদানি?'

'হ্যাঁ। ভাবতে আরম্ভ করল গোয়েন্দা, এত সাধারণ একটা জিনিস চুরি করার কারণ কি? নিশ্চয় লোভ। এ ধরনের জিনিসের প্রতি কার লোভ হয়? সংগ্রাহকের। ওই সূত্র ধরে এগোতে গিয়ে ওই এলাকায় কয়জন সংগ্রাহক আছে, সেটা আগে খুঁজে বের করল সে। তাদের ওপর নজর রেখে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলল আসল অপরাধীকে। শুনতে সহজ মনে হলেও কাজটা অত সহজ ছিল না।'

'কোনখানে গিয়ে চিনল তাকে? নিশ্চয় নীলাম হাউসে চোখ রেখেছিল গোয়েন্দা।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আমাদের এই অপরাধীকে ধরার জন্যেও তাহলে অকশন হাউসে নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছ তুমি?' এতক্ষণে কথা বলল রবিন।

'দিচ্ছি। তবে এই লোক আর তার দল শুধু অ্যানটিকই চুরি করে না, রাস্তাঘাটে ছিনতাইও করে বেড়ায়। সেজন্যে তাদের ধরার জন্যে ফাঁদ পাতার কথাও ভাবছি আমি।'

'কিভাবে?'

'বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কিউ শিপের কথা নিশ্চয় শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। জার্মান সাবমেরিনকে ফাঁদে ফেলার জন্যে ব্যবহার করা হত।'

'আমি শুনিনি,' মুসা বলল।

তার দিকে চোখ ফেরাল রবিন। 'শোনোনি? বাণিজ্যতরীর ছদ্মবেশে সাগরে ছেড়ে দেয়া হত বড় বড় জাহাজ। জার্মান সাবমেরিনের লোকেরা ভাবত, ওগুলো সাধারণ জাহাজ। আক্রমণ করার জন্যে কাছে চলে যেত। বাগে পেলেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত সাধারণ চেহারার জাহাজগুলো। রাশি রাশি কামান আর ডেপথচার্জ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত সাবমেরিনের ওপর। পালানোর পথ থাকত না আর সাবমেরিনের।'

'খাইছে! ডাকাত ধরতে এখন যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করা লাগবে নাকি?'

'আরে না না,' হাত নাড়ল কিশোর, 'আমরা ব্যবহার করব গাড়ি। দামী

একটা গাড়িতে করে—ধরা যাক, একটা রোলস রয়েসে করে বেড়াতে বেরোল কোন দেশের রাজকুমারী। তার কাছে অনেক দামী গহনা রয়েছে। রাস্তার কোন নিরালা জায়গায় থেমে গাড়িতেই সেগুলো রেখে হোটেলে খাবার খেতে ঢুকল রাজকুমারী। এই সুযোগে বাথরুম সারতে চলে গেল তার শোফার। বড় জোর দুতিন মিনিট লাগবে ওর। ফিরে এসে দেখবে গাড়ির মধ্যে বাক্সটা আছে কিনা।'

'যদি না থাকে?'

'আমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।'

'আবারও সেই রহস্য করে কথা বলা!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'খুলে বলো না ছাই কি বলতে চাও?'

হাসল ওমর। 'লোভ দেখিয়ে তাকে সামনে নিয়ে আসার বুদ্ধি করেছ? হুঁ, মন্দ না। রাজকুমারী কে সাজবে, তুমি? তোমার শোফার নিশ্চয় মুসা?'

কপাল চাপড়াল মুসা। 'নাহ্, এরা একদিন ঠিক ঠিক পাগল করে দেবে আমাকে! আরে বাবা, একটু সহজ করে বললে কি সাংঘাতিক কোন ক্ষতি হয়ে যায় তোমাদের?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'হ্যানসনের সাহায্য নিতে হবে আমাদের। রেন্ট-আ-রাইড অটো কোম্পানিতে টেলিফোন করে বলব, কয়েকদিনের জন্যে রোলস রয়েসটা আমাদের চাই। হ্যানসন ওটা নিয়ে এলে তাকে বুঝিয়ে বলব সব।'

'কি বলবে?'

'বলব একজন ডাকাতকে ধরার জন্যে গাড়িটা দরকার আমাদের। তবে সেকথা যেন কোম্পানিকে না জানায়। গাড়িটা ড্রাইভ করব আমরা, মানে তুমি—বিশ্বাস করে আমাদের ওপর গাড়ির ভার ছেড়ে দিয়ে সে যেন ওই কদিন চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে, কিংবা যা খুশি করে। তখন আমি সাজব ভারতীয় প্রিন্সেস, তুমি সাজবে শোফার। মেরিচাচীকে দিয়ে গসিপ পত্রিকায় একটা খবর ঘন ঘন ছাপার ব্যবস্থা করব—প্রিন্সেস···কি নাম দেয়া যায়?···হ্যাঁ, সালমা, সালমা কুরুগান···'

'ভারতের কোন এলাকার?' প্রশ্ন করল রবিন।

'যেখানকারই হোক, কে অত মাথা ঘামাতে যায়। ইনডিয়ান প্রিন্সেস, ব্যস, হয়ে গেল। আমেরিকা দেখতে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে কোটি কোটি টাকার অলঙ্কার। সেগুলো সবসময় তার সঙ্গেই থাকে, পরনে, অথবা বাক্সে। আমি শিওর, শিকার খোঁজার জন্যে এ জাতীয় পত্রিকাগুলোতেই চোখ বোলায় ডাকাতের সর্দার লোকটা। তার চোখে পড়ে গেলে আমাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা।'

'কিন্তু ওই লোক নিশ্চয় নিজে ডাকাতি করতে আসবে না,' রবিন বলল। 'তার কোন অ্যাসিট্যান্টকে পাঠাবে। চুনোপুঁটি ধরে লাভ কি?'

'কে ধরে? পিছু নিয়ে গিয়ে শুধু দেখে আসব কোন্ বাড়িতে ঢোকে।'

'আর যদি ছিনতাই করতে না আসে?'

'শিওর হয়ে যাব, এ ভাবে টোপ দিয়ে বের করে আনা যাবে না ওকে। অন্য চিন্তা করব তখন।'

তিন

ছবিসহ একটা খবর ছাপা হলো রকি বীচ উম্যান পত্রিকার গসিপ কলামে—ভারত থেকে বেড়াতে এসেছেন প্রিন্সেস সালমা কুরগান। উঠেছেন প্যাসিফিক গ্রীন হোটেলে। তারপর থেকে তিনি কোন্ দিন কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, সব বিস্তারিত লিখে ছাপা হতে লাগল কাগজে। চতুর্থ দিনের খবরে বেরোল, আগামী দিন পিজমো বীচে বেড়াতে যাচ্ছেন প্রিন্সেস। সঙ্গে থাকবে শুধু তাঁর নিগ্রো শোফার হুজুম বারকুন্ডা।

সেদিন বিকেলে হোটেলের গ্যারেজের বাইরে একটা ঝাড়ন দিয়ে রাজকীয় রোলস রয়েসটার ধুলো পরিষ্কার করছে হুজুম বারকুন্ডা ওরফে মুসা আমান। পরনে শোফারের পোশাক। চমৎকার এই পোশাকটা জোগাড় করে দিয়েছে হ্যানসন।

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে মুসার কাজ দেখছে আরেকজন শোফার। সুদর্শন, বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। দেখেও দেখল না মুসা।

এগিয়ে এল লোকটা। 'দারুণ গাড়ি তো!'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল মুসা।

'প্রিন্সেস সালমার গাড়ি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ,' কথা বলতে ইচ্ছে করছে না যেন মুসার।

'শুনলাম আগামী কাল পিজমো বীচ দেখতে যাচ্ছেন প্রিন্সেস?'

'কার কাছে শুনলেন?'

'পত্রিকায় পড়লাম।'

'হ্যাঁ।' একটা নেকড়া বের করে গাড়ির গা ডলতে শুরু করল মুসা।

'কোক খাবে? আনাই?'

'না, ধন্যবাদ। এখন আমি ব্যস্ত,' সতর্ক হলো মুসা।

একটা মুহূর্ত চুপ থেকে লোকটা বলল, 'বেড়ানোর জন্যে ভাল জায়গা বেছেছেন প্রিন্সেস। আবহাওয়া ভাল থাকলে আনন্দ পাবেন।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার জন্যে দায়িত্বটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।'

'মানে?'

'কোন বডিগার্ড নিচ্ছেন না। সঙ্গে থাকছ শুধু তুমি। এত দামী দামী অলঙ্কার সব পাহারা দেয়ার ভার একা তোমার। আগামীকালই তো রওনা হচ্ছ?'

জবাব দিল না মুসা।

'প্রিন্সেস লাঞ্চ করবেন কোথায়? সান্তা বারবারা, নাকি গ্যাভিওটায়?'

'অত বকবক করছেন কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। অভিনয়টা খারাপ

করছে না।

'কখন রওনা হচ্ছ তোমরা?'

কাজ থামিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল মুসা। 'আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো?'

লোকটা হাসল। 'উদ্দেশ্য তো আমার একটাই।'

'দেখুন,' বরফের মত শীতল গলায় বলল মুসা, 'কিছু বলার থাকলে বলে বিদেয় হোন। আমাকে কাজ করতে দিন।'

'কোণের কফিশপটায় আজ সন্ধ্যায় দেখা কোরো আমার সঙ্গে। আটটায়। প্রিন্সেস তখন ডিনারে থাকবেন, আসতে নিশ্চয় অসুবিধে হবে না তোমার।'

'আমি কোথাও দেখা করতে পারব না।'

'একটা প্রস্তাব আছে। শুনলে হয়তো ভাল লাগবে তোমার।'

'না, লাগবে না।'

ভুরু উঁচু করল লোকটা। 'ঘটনাটা কি তোমার? এমন রুক্ষভাবে কথা বলছ কেন?'

'আপনি এবার বিদেয় হোন।'

'দেখো, তোমার বয়েস কম। একেবারেই ছেলেমানুষ। তারপরেও তোমাকে কেন পছন্দ হয়েছে রাজকুমারীর, বুঝতে পারছি। তোমার চেয়ে অনেক ঘাগু মানুষকে পটাতেও এত কথা বলা লাগে না। জীবনে উন্নতি চাইলে এখন থেকেই শুরু করো। হাজার পাঁচেক ডলার যদি ফাউ পেয়ে যাও, কেমন লাগবে?'

'ভিক্ষে নিতে আমার ভাল লাগে না।'

'যদি কোন কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়?'

'কাজটা কি? আপনার আদেশে কবরে যেতে হবে নাকি? এত টাকা দেবেন কেন নইলে?'

'না না, খুব সহজ কাজ। ধরতে গেলে কিছুই করতে হবে না তোমাকে। লাঞ্চের সময় বাথরুমের ছুতো করে মিনিটখানেকের জন্যে গাড়িটার কাছ থেকে সরে যেতে হবে শুধু।'

'ও, এই ব্যাপার,' কঠিন হাসিতে শক্ত হয়ে গেল মুসার ঠোঁট, 'এ সব আমার জানা আছে।'

'বড় লোকের শোফারি করো, থাকবেই।'

'যান এবার।'

'তারমানে টাকাগুলো তোমার দরকার?'

'যেতে বললাম না!' ধমকে উঠল মুসা।

হাসি মুছল না লোকটার। 'কথাটা ভেবে দেখো। এক মিনিটের জন্যে গাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়া মানে কড়কড়ে পাঁচটি হাজার ডলার।'

জবাব দিল না মুসা।

আরও এক মিনিট অপেক্ষা করল লোকটা। যাওয়ার আগে স্বগতোক্তির

মত করে বলে গেল, 'চলি। আশা করি কাল দেখা হবে।'

চোখের কোণ দিয়ে দেখল মুসা, গাড়ির ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা সবুজ জাগুয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। আবার মন দিল গাড়ি মোছায়। মনে মনে খুশি। এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে ভাবেনি। কিছুক্ষণ পর ওমরকে ফোন করে জানাল খবরটা।

'ভেরি গুড,' ওমর বলল। 'কাল রওনা হয়ে যাও। আমি তোমাদের পেছনেই থাকব।'

যখন তখন রাজকুমারীর কাছে যাওয়া মানা, লোকের সন্দেহ হতে পারে। তাই অপেক্ষায় রইল মুসা। প্রথম সুযোগেই খবরটা কিশোরকে জানিয়ে দিল।

শনিবার সকালে হোটেল থেকে প্রিন্সেসের মালপত্র এনে গাড়িতে তুলল সে। ব্যাগ-স্যুটকেস সব বয়ে আনল। রাজকুমারীবেশী কিশোরের হাতে শুধু একটা দামী চামড়ার পার্স। গত কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় তার খবর যারা পড়েছে, তারা দেখলেই অনুমান করে নেবে ছোট ওই ব্যাগটার মধ্যেই রয়েছে কোটি কোটি টাকার অলঙ্কার। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পার্সটা দোলাতে দোলাতে গিয়ে গাড়িতে বসল প্রিন্সেস। সসম্মানে পেছনের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল হুজুম বারকুডা। গাড়ি বের করল হোটেলের মেন গেট দিয়ে।

'বড়লোকের শোফারি করেও ভাল ইনকাম করতে পারবে তুমি,' হেসে বলল কিশোর। 'সেই সঙ্গে চোরবাটপাড়দের সঙ্গে যদি হাত মেলাও, তাহলে দুদিনেই বড়লোক।'

'এবং তিনদিনের দিন পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে দেবে ধোলাই। এরপর জেলের ঘানি টানা। থাক বাবা, আমার ওসবের দরকার নেই। খুব ভাল আছি। শোফারি করে সৎ পয়সা উপার্জন, ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে শান্তির সংসার...'

হাসতে লাগল কিশোর।

মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় উঠে বলল মুসা, 'তুমিও ভাল রাজকুমারী সেজেছ। মহাসুন্দরী। লোকে যে ভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সত্যি সত্যি তুমি মেয়েমানুষ হলে একলা তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়ানোর দুঃসাহস স্বপ্নেও করতাম না।'

'কিন্তু লোকে তো আর জানে না আমি পুরুষমানুষ। এখনও যদি ধরে? হাইজ্যাক করতে চায়?'

'তাতে তো আর আমার মাথাব্যথা থাকবে না। তুমি একাই যথেষ্ট। দেবে জুডোর এক প্যাঁচ কষে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে-মানুষকে হঠাৎ ওরকম লড়াকু পুরুষ হয়ে যেতে দেখে এমন হাঁ করাই করবে, চোয়ালের জোড়া আটকে যাবে লোকটার। বেচারার জন্যে তখন মায়াই হবে আমার।'

হোটেল থেকে বেরোনোর পর থেকেই চোখ রেখেছে মুসা। গতকালের লোকটাকে কোথাও দেখতে পেল না। সবুজ জাগুয়ারও গায়েব। ওমরের

পুরানো নীল টয়োটাটাও নেই।

রকি বীচ থেকে বেরিয়ে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে গাড়ি চালাল মুসা। একপাশে সাগর, অন্যপাশে কোথাও পাহাড়, কোথাও সমতল। পথ কখনও খাড়াই বেয়ে উঁচু হয়ে উঠে গেছে, কখনও ঢালু। বসন্তের সুন্দর সকাল। মনের আনন্দে গাড়ি চালাচ্ছে সে। এমন রাজকীয় গাড়ি, চালিয়েও শান্তি। কিশোরও উপভোগ করছে প্রকৃতির রূপ।

সান্টা বারবারা পেরিয়ে এল ওরা।

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়নি। মুসাকে এগিয়ে যেতে বলল কিশোর।

গ্যাভিওটায় পৌছে লাঞ্চের জন্যে থামল সে। পার্সটা পেছনের সীটে ফেলে রেখে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঢুকল হোটেলে।

পেছনের দরজায় তালা লাগাল মুসা। চারপাশে তাকিয়ে দেখল সবুজ জাগুয়ারটা আছে কিনা। নেই। পার্কিং লটে আরও কয়েকটা গাড়ি আছে। মালিকরা কেউ নেই। সবাই হোটেলে ঢুকেছে। সান্টা বারবারার পর থেকে একটা ধূসর মার্সিডিজ ওদের পিছে পিছে আসছিল। সেই গাড়িটা ঢুকল এখন পার্কিং লটে। গাড়ি থেকে নেমে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ড্রাইভার। মুসার সঙ্গে যে কথা বলেছিল, এ সে লোকটা নয়। কখনও দেখেনি একে। সুতরাং ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে কোল্ড ড্রিংকস আর কিছু প্যাকেট খাবার আনার জন্যে একটা ফাস্ট ফুড শপে ঢুকল মুসা। ভেতরে ঢুকে কি ভেবে ফিরে তাকাল। কাঁচের দরজা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল দ্রুত রোলস রয়েসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ধূসর গাড়ির লোকটা। মাস্টার কী বের করে পেছনের দরজার তালা খুলল। পেছনের সীট থেকে তুলে নিল পার্সটা। দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল নিজের গাড়ির কাছে। ওর ক্ষিপ্রতায় তাজ্জব হয়ে গেল মুসা।

অন্য সময় হলে দৌড়ে গিয়ে ধরার চেষ্টা করত লোকটাকে। এখন সেসব কিছু করল না। প্ল্যান করাই আছে। কোনও গাড়ি রোলস রয়েসের পিছু নিলে পেছন থেকে সেটার ওপর নজর রাখবে ওমর। পার্স চুরি করে নিয়ে গেলে অনুসরণ করবে। দেখে আসবে কোথায় যায়।

এঞ্জিন বোধহয় চালু করেই রেখে গিয়েছিল লোকটা। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। আরও একটা ঘটনা ঘটল। লোকটা পার্স তুলে নিয়ে তার গাড়ির কাছে যাওয়ার সময় লাল রঙের একটা পিকআপ ট্রাক এমন ভাবে রোলস রয়েসের সামনে এসে ওটার পথরোধ করে দাঁড়াল, দৌড়ে গিয়ে মুসা এখন গাড়িতে উঠে মার্সিডিজটার পিছু নিতে চাইলেও পিকআপটাকে কাটিয়ে বেরোতে পারবে না।

ডাকাতদলের দুজনকে দেখেছে, তৃতীয়জন, অর্থাৎ পিকআপের ড্রাইভারকেও দেখার জন্যে দোকান থেকে বেরিয়ে এল মুসা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'গাড়ির সামনে রেখেছেন কেন? বেরোব কিভাবে?'

'চাঁদি গরম করা লাগবে না।' একটা পেটফোলা খাম জানালা দিয়ে বের করে দিল পিকআপের ড্রাইভার, 'তোমার পাওনা।'

খামটা মুসার হাতে ফেলে দিয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না সে। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

রাস্তার দিকে তাকাল মুসা। মার্সিডিজটা দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করলেও এখন গিয়ে আর ওটাকে ধরতে পারবে না। মেইন রোড থেকে অনেক শাখাপথ এদিক ওদিক চলে গেছে। কোনটা দিয়ে ঢুকে পড়েছে কে জানে। বড় হুঁশিয়ার এই ডাকাতের দল। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে এতদিন টিকে আছে এ কারণেই।

খামটার দিকে তাকাল মুসা। টেপ দিয়ে মুখ আটকানো। ছিঁড়ে ভেতরে দেখল। কি আছে, জানে। তবু দেখল। কড়কড়ে অনেকগুলো নোট। কেন তাকে দিল এগুলো? সে তো মার্সিডিজের শোফারকে বলেই দিয়েছিল এ কাজে উৎসাহী নয় সে। বুঝতে সময় লাগল না। ওরা আশা ছাড়েনি। পিছু নিয়ে এসে দেখতে চেয়েছিল সে গাড়ি ফেলে কোথাও যায় কিনা। যদি যায়, তাহলে বুঝবে লোভ সামলাতে না পেরে ওদের কথায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছে। পার্সটা তুলে নিয়ে তখন তাকে টাকা দিয়ে যাবে। এবং তা-ই করেছে।

ফাস্ট ফুড শপে আর না ঢুকে হোটেলে ঢুকল মুসা। ডাইনিং রুমের এককোণে বসে খাচ্ছে কিশোর। মুসার চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল। 'নিয়ে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। রাজকুমারীর সামনে তার বসা বারণ। বসতে দেখলে লোকের সন্দেহ জাগবে। দাঁড়িয়ে থেকেই নিচুস্বরে বলল, 'টাকাও দিয়ে গেছে।'

'উল্টোপাল্টা কিছু করে বসোনি তো?'

'না।'

'গুড। লাঞ্চ প্যাকেটের অর্ডার দিয়ে রেখেছি। ওটা নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি। গাড়িতে বসে শুনব।'

'আর কিছু করার নেই আমাদের?'

'না। বাকিটা ওমরভাই করবে।'

'আমরা কি করব?'

'রকি বীচে ফিরে যাব। আর এগোনোর কোন প্রয়োজন নেই।'

চার

ঘণ্টাখানেক পর। রকি বীচে ফিরে চলেছে ওরা। এখনও রাজকুমারীর ছদ্মবেশ ছাড়েনি কিশোর। বোঝা যাচ্ছে না, ডাকাতেরা যখন দেখবে পার্সে কয়েকটা কাঁচের পাথর আর নকল অলঙ্কার, তখন কি করবে? হয়তো দ্বিধায় পড়ে যাবে ওরা। যদি বোঝে ইচ্ছে করে ঠকানো হয়েছে, রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার

জন্যে ওদের পিছু নিতে পারে আবার। তখন যদি দেখে ছদ্মবেশ ছেড়ে দিয়ে দিব্যি আবার গোয়েন্দা সেজে বসে আছে ওরা, রাগের মাথায় কি করে বসবে কোন ঠিকঠিকানা নেই।

ডাকাতেরা কি করবে, এর জবাব বেলা চারটের মধ্যেই পেয়ে গেল ওরা। একটা সমতল অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলেছে তখন রোলস রয়েস। এই সময় রিয়ারভিউ মিররে একটা স্পোর্টস কারকে ছুটে আসতে দেখল মুসা। ড্রাইভারের পাশে আরেকজন লোক বসে আছে। গাড়িটা তীব্র গতিতে পাশ কাটানোর সময় জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা পিস্তলের নল। গুলির শব্দ হলো। ভেঙে গেল রোলস রয়েসের একপাশের উইন্ডস্ক্রীন। ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল মুসা। কানের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট।

চোখের পলকে মেঝেতে বসে পড়ল কিশোর। তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল দ্বিতীয় গুলিটা।

আর গুলি করার চেষ্টা করল না লোকটা। গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে চলে গেল সামনের দিকে।

'চলে যাচ্ছে!' চিৎকার করে বলল মুসা, 'পিছু নেব নাকি?'

'না,' সীটে উঠে বসল কিশোর। 'ধরার চেষ্টা করলে গুলি খেতে হবে। তোমার লেগেছে?'

'অল্পের জন্যে বেঁচেছি। শয়তানের দল! যেই বুঝেছে ঠকিয়েছি, রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে গুলি করে মারার জন্যে ছুটে এসেছে।'

'সাবধান থাকো। রাগটা নিশ্চয় যায়নি এখনও ওদের। আবার ফিরে আসতে পারে।'

তবে আর এল না ওরা। নিরাপদেই রকি বীচে ঢুকল গাড়ি। ওকিমুরো করপোরেশনের অফিসে চলল ওরা। ওখানেই ওমর আর রবিনের সঙ্গে দেখা করার কথা।

অফিসের সামনে ওমরের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো দুজনে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল?

ভেতরে ঢুকে দেখে মুখ গোমড়া করে বসে আছে ওমর। চুপচাপ সিগারেট টানছে। এককোণে চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে রবিন।

'উফ্, এই মেয়েমানুষের পোশাক পরতে পরতে জান অস্থির হয়ে গেছে! বাতাস ঢোকে না কিছু না!' একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। 'খুলতে পারলে বাঁচি!' ওমরের দিকে তাকাল, 'আপনি এমন মুখ কালো করে রেখেছেন কেন?'

'তোমাদের কাজ তো তোমরা ঠিকমতই করেছ, আমি করেছি ভণ্ডুল।'

'কেন, পিছু নেননি মার্সিডিজটার?'

'নিয়েছি। ডাকাতদের বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেছি আমরা। আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'হয়েছে কি?' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। 'আপনার পচা গাড়ি ওদের মার্সিডিজের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি?'

'তাও পেরেছে। কিন্তু ওরা যে হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল?' সিগারেটে জোরে জোরে দুটো টান দিয়ে গোড়াটা অ্যাশট্রেতে পিষে যেন গায়ের ঝাল মেটাল ওমর। 'সান্টা মনিকার কয়েক মাইল আগে একটা মোড়ের কাছে গিয়ে থেমে গেল মার্সিডিজ। পাশের মাঠে হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল। একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। পার্সটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মুহূর্ত দেরি করল না মার্সিডিজের ড্রাইভার। আবার ছুটতে শুরু করল।'

'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসেছে রবিন। ম্যাগাজিন রেখে দিয়েছে বহু আগেই। বোঝা গেল, এ সব কথা ওমর তাকে কিছু বলেনি।

'দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কার পিছু নেব? মার্সিডিজের পিছে গিয়ে লাভ নেই। ওই লোক আর সর্দারের বাড়িতে যাবে না, কারণ মাল পাচার করে দিয়েছে। যার কাছে দিয়েছে সে পার্সটা হাতে পেয়েই দৌড়াতে আরম্ভ করল। আমি কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই গিয়ে উঠে পড়ল কপ্টারে। আর কি ধরা যায়? অবশ্য ধরার চেষ্টাও করিনি। আমি যে ওদের পিছে লেগেছি, শুরুতেই ওটা বুঝিয়ে দেয়াটা বোকামি হত। তাতে আরও সতর্ক হয়ে যেত দলের সর্দার। তলিয়ে যেত আরও গভীর পানিতে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'শুধু টাকার জোর থাকলেই অপরাধীকে ধরা কঠিন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রেন। অত সহজে তাকে পাকড়াও করা যাবে, এটা আশাও করিনি আমি।'

'কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে, সময় নষ্ট করে লাভটা কি হলো আমাদের? স্রেফ কলা দেখিয়ে দিল,' মুসা বলল।

'আমরা দেখিয়েছি আরও বড় কলা,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'কপ্টারে উঠেই নিশ্চয় পার্সটা খুলে দেখেছে ওরা। যেই বুঝেছে, নকল জিনিস, অমনি ফোন করে দিয়েছে স্পোর্টসকারঅলাদের। যাতে আমাদের একটু শাসিয়ে দিয়ে যায়।'

'খুন করতে চায়নি বলছ?'

'না, চায়নি। আমরা নিরস্ত্র। নির্জন রাস্তা। খুন করার ইচ্ছে থাকলে সামনে গাড়ি রেখে আমাদের আটকে দিয়ে গুলি করে মারতে পারত। আসলে আমাদের পরিচয় সম্পর্কে শিওর হতে পারেনি ওরা। পার্সে কেন নকল জিনিস রাখলাম, বুঝতে পারেনি, অবাক লেগেছে ওদের কাছে। ভাগ্যিস ছদ্মবেশ খুলিনি। তাহলে ঠিক বুঝে ফেলত। তখন আর বাঁচতে দিত না।'

রাস্তায় কি ঘটেছে ওমর আর রবিনকে সব খুলে বলল কিশোর। তারপর রবিনের দিকে তাকাল, 'তোমার কি খবর?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিন বলল, 'অদ্ভুত কাণ্ডটা কি হয়েছে জানো? আমিও একটা হেলিকপ্টার দেখেছি।'

'কোথায়? অকশন হাউসে?'

'না। হলিউডের বাইরে, একটা বাড়িতে।'

'ও। এটা আর এমন কি? হলিউডে অনেকেই কপ্টার আর প্লেনের

মালিক।'

'জানি। কিন্তু আমি যেখানে দেখেছি, ওমরভাইয়ের কপ্টারের সঙ্গে ওটার মিল থাকতেও পারে।'

'কি করে বুঝলে?'

'সব শুনলে তোমাদেরও ওরকমই মনে হবে।'

'তাহলে আর দেরি করছ কেন? বলো না?' হাত নাড়ল মুসা। 'রহস্য করে কথা বলা শিখে গেছে আজকাল সবাই!'

'তোমরা তো গিয়ে মহাসুখে কাটিয়েছ প্যাসিফিক গ্রীন হোটেলে...'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল মুসা, 'আমি কাটাইনি! কাটিয়েছে কিশোর। আমার তো চাকর-বাকরদের ঘরে রাত কাটিয়ে আর গাড়ি মুছতে মুছতে জান কাবার হয়েছে। অভিযোগ থাকলে ওকে বলো,' কিশোরকে দেখিয়ে দিল সে।

'আমিও ইচ্ছে করে আরাম করিনি। তদন্তের স্বার্থে...'

'দূর, কিসের মধ্যে কি!' বাধা দিল ওমর। 'রবিন, বলো তো।'

'সাতদিন ধরে অ্যানটিক শপগুলোতে ঘোরাঘুরি করেছি। রোজ গিয়েছি অকশন হাউসে। নীলামের মত নিরস একটা অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে বসে থেকে স্নায়ুর ওপর যাচ্ছেতাই অত্যাচার করেছি। তবে কষ্ট করার ফলও পেয়েছি। আজকে। নীলামে এমন সাধারণ একটা জিনিস এত বেশি দাম দিয়ে কিনলেন এক ভদ্রলোক, রীতিমত চমকে গেছি।'

'কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'জনৈক ডুগান!'

'জনৈক বলছ কেন?'

'কারণ, তাঁকে চিনি না।'

'নামটা শুনিনি কখনও।'

'আমিও না। চালচলনে মনে হলো বিরাট ধনী। হলিউডে এ রকম একজন মানুষ আছেন, অথচ পত্রিকায় কখনও তাঁর নাম দেখলাম না, ব্যাপারটা কৌতূহল জাগাল আমার।'

'কি কিনলেন তিনি?'

'একটা চীনামাটির ডিশ, দুটো বাঁকা খুঁটির ওপর বসানো। বহুবছর আগে নাকি ফ্রান্সের কোন্ এক অখ্যাত গ্রামে তৈরি হয়েছিল ওটা।'

'তা কিনতেই পারেন। নিশ্চয় ছিটানোর টাকার তাঁর অভাব নেই।'

'কিন্তু তাই বলে পঞ্চাশ হাজার ডলারে? নিশ্চয় চোরাই টাকা কিংবা স্মাগলিঙের টাকা।'

'অ্যানটিকপাগল মানুষদের কোন জিনিস একবার পছন্দ হয়ে গেলে আর টাকার দিকে তাকায় না। যত দামই হোক, কিনে নেবেই।'

একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'আমার অবাক হওয়ার আরও কারণ আছে। অকশন হাউসে কানাঘুষা হচ্ছিল, জিনিসটার দাম কোনমতেই পাঁচ হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয়। একবারেই ডুগান অত টাকা হেঁকে বসায় সবাই অবাক হয়েছে। আরও একটা কথা জেনে আমার

খটকা লেগেছে, ওই অ্যানটিকটার নাকি একটা টুইন আছে। দুটো মিলিয়ে একটা সেট। বুঝলাম, সেট মেলানোর জন্যে অতিরিক্ত দাম দিয়ে জিনিসটা কিনেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। আমরা যাকে খুঁজছি সে-ও হতে পারে ওই লোক—এ সন্দেহটাও তাড়াতে পারলাম না মন থেকে। স্রেফ কৌতূহলের বশে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাতে গিয়ে পেয়ে গেলাম নামটা। পুরো নাম জেনারেল উইলার্ড ব্রন ডুগান। যেই দেখলাম জেনারেল, সন্দেহ আরও বাড়ল। তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি বলেছ, সোনা-ডাকাতদের সর্দার একজন সামরিক বাহিনীর লোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভাবলাম, একটু উঁকি মেরে আসা যাক ভদ্রলোকের বাড়ির বাইরে থেকে। চলে গেলাম। কোনদিক দিয়ে যেতে হবে, রাস্তায় একজন লোককে জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিল। হলিউডের বাইরে একটা পাহাড়ের ধারে তাঁর বিরাট বাড়ি, ডুগান এস্টেট। বাড়িটার কাছে যাওয়ার আগেই একটা কপ্টার উড়ে আসতে দেখলাম। নামতে শুরু করল ওটা। কোথায় নামল, অতিরিক্ত গাছপালার জন্যে দেখা গেল না।'

'পরে আর উড়তে দেখোনি?'

'না। ওদিকে কোন এয়ারফীল্ড আছে বলে জানি না। আপনি জানেন নাকি, ওমরভাই?'

'কপ্টার নামার জন্যে এয়ারফীল্ড দরকার হয় না। জায়গাটা কোনখানে, ম্যাপে দেখাতে পারবে?'

'মনে হয় পারব।'

'তাহলে বলা যাবে এয়ারফীল্ড আছে নাকি। আগে তোমার কথা শেষ করো।'

'রাস্তা ধরে এগোতে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড। তীরচিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোনদিকে গেলে পাওয়া যাবে ডুগান এস্টেট। তারপর একটু পরপরই সাইনবোর্ড।'

'বিশেষ কোনও জায়গা হলেই কেবল এ ভাবে সাইনবোর্ড দিয়ে মানুষকে বোঝানো হয় যে ওদিকে আছে ওটা,' কিশোর বলল। 'ডুগান এস্টেটটা কি বিশেষ কোন জায়গা?'

হাসল রবিন। 'প্রথমে সাইনবোর্ড দেখে আমারও অবাক লেগেছিল। তবে কাছে গিয়ে বুঝলাম, বাড়িটাকে দর্শনীয় বস্তু বানিয়ে ছেড়েছেন জনাব জেনারেল সাহেব। প্রচুর টাকা আয় করছেন ওখান থেকেও।'

'কিভাবে?'

'টুরিস্টদের পকেট থেকে খসান।'

'কি দেখিয়ে?'

'রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি উঁচু দেয়াল দিয়ে বিশাল একটা এলাকা ঘেরা। দেয়ালে বড় বড় করে সাবধানবাণী লেখা: সাবধান! বিপজ্জনক! ভেতরে বড় বড় জানোয়ার ঘোরাফেরা করছে!'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'চিড়িয়াখানা নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'দেয়ালের পাশের রাস্তা দিয়ে আধমাইল এগোনোর পর একই রকম আরেকটা নোটিশ দেখলাম। তারপর পাওয়া গেল লোহার সিংহদরজা। পাহারা দিচ্ছে দৈত্যের মত এক লোক। আফ্রিকান জুলু যোদ্ধাদের মত করে কোমরে চিতাবাঘের ছাল জড়ানো, এক হাতে অ্যাসেগাই, আরেক হাতে গরুর চামড়ায় তৈরি সাদা রঙ করা ঢাল, এক কানে তামার বড় রিং।'

'শিশুদের খেলার পার্ক বানিয়েছে নাকি?'

'না, প্রাইভেট ন্যাশনাল পার্ক বানিয়েছেন জেনারেল।'

'প্রাইভেট ন্যাশনাল পার্ক!'

'অসুবিধে কি? টাকা আছে। প্রচুর জায়গার মালিক। কয়েক হাজার একর জায়গাকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন। তার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন বুনো জানোয়ার।'

'বাঘ-সিংহ না তো?' ওমর বলল, 'আমি ইংল্যান্ডের এক লর্ডের কথা জানি, যিনি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সিংহ ছেড়ে দিয়ে রাখতেন। চোর-ডাকাত আসা বন্ধ করার জন্যে।'

'না, সিংহ না। জেনারেল ছেড়েছেন মোষ।'

'মোষ! সিংহের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়!'

'বাড়ির মধ্যে নিশ্চয় অনেক পাখির বাসা,' মুসা বলল, 'পোলাপানে ঢুকে ভাঙতে চায়। ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে বুনো মোষ পুষছে।'

মুসার হালকা কথায় কান দিল না কেউ। কিশোর বলল, 'এত ভয়ানক জীব থাকলে ভেতরে টুরিস্ট যায় কি করে?'

'সেটারও ব্যবস্থা করেছেন জেনারেল। আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্কে সাফারিতে যায় যে ভাবে লোকে, তার নকল। পাঁচ ডলার দিলে একটা টিকেট ধরিয়ে দেয়া হবে তোমার হাতে। সাফারির পোশাক পরা একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারির হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। সে ল্যান্ড-রোভারে চড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে আনবে। সঙ্গে সব সময় রাইফেল থাকে তার, অবিকল আফ্রিকান পার্কের পেশাদার হোয়াইট হান্টারদের মত। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে আক্রমণ করে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেজন্যে।'

'তোমার পাঁচ ডলার উসুল হয়েছে?'

'আমি ভেতরে ঢুকিনি। গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে জেনারেলের রাজপ্রাসাদের মত বিশাল বাড়িটা দেখলাম। গাছের নিচে কতগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার মোষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

'আর কি কি জানোয়ার আছে?'

'দেখিনি। জিজ্ঞেসও করিনি পাহারাদারকে। চিড়িয়াখানা দেখেই আগ্রহ চলে গিয়েছিল আমার। পয়সা খরচ করে বন্দি জানোয়ার দেখার শখ চলে গেছে আমার বহুকাল আগেই।'

'বাড়ির ভেতরটা অন্তত দেখে আসতে পারতে, গিয়েছিলেই যখন।'

'সময় ছিল না। তোমরা আবার কখন চলে আসো, আমার জন্যে বসে

থাকবে, এই ভেবে চলে এসেছি। ওমর ভাই আসার কয়েক মিনিট আগে ঢুকেছি আমি।'

'জেনারেলের ওই খুদে আফ্রিকায় নামেনি তো কপ্টারটা?'

'জানি না। নামতেও পারে।'

আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছিল ওমর। অ্যাশট্রেতে সেটাকেও পিষে মারল। নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। 'একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে আমার মনে···যদিও কাকতালীয়···এমন হতে পারে না, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পার্সটা নিয়ে সোজা জেনারেলের বাড়িতে চলে গেছে কপ্টার? ওটা নামার সময় রবিনের চোখ পড়েছে? জেনারেলকে আমাদের ডাকাত-সর্দার ধরে নিলে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। পুলিশের গোয়েন্দা কিংবা গুপ্তচর ঠেকানোর জন্যে একপাল বুনো মোষ কয়েক হাজার বল্লমধারী জুলু যোদ্ধার চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কি বলো, কিশোর?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই মুসা বলে উঠল, 'জেনারেলের মত শত শত কোটি টাকার মালিক একজন লোক মানুষের পার্স হাতিয়ে গহনা লুট করতে চাইবে?'

'চাইতেই পারে,' ওমর বলল। 'মানুষের যে কত রকম রোগ আছে, কল্পনা করতে পারবে না। কোন কাজ না পেয়ে হয়তো স্রেফ একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে এ সব খেলায় মেতে উঠেছেন জেনারেল, এই সন্দেহটা তো আমরা প্রথমেই করেছি। ভাবছি, একবার দেখতে যাব তাঁর অভয়াশ্রম।'

'মোষ?'

'না, মোষ জীবনে অনেক দেখেছি। দেখতে চাই জেনারেলের বাড়িটা।'

'তাহলে কালই চলুন,' রবিন বলল।

'আরে দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি। সরাসরি গিয়ে পাঁচটা ডলার খরচ করে ঢুকলে ওরা যা দেখাবে শুধু তাই দেখে চলে আসতে হবে। নিজের ইচ্ছেমত দেখা হবে না। তুমি যে কপ্টারটার কথা বললে, ওটা যদি ওই বাড়ির মধ্যে কোথাও নেমে থাকে, তো মোষের পালের মধ্যে নামবে না। গুঁতো মেরে নষ্ট করে দেয়ার ভয় আছে। আবার এমন জায়গাতেও নামাবে না যেখানে টুরিস্টদের চোখে পড়বে। অন্য কিছু দেখার চেয়ে ওটা খুঁজে বের করার আগ্রহ আমার বেশি। ভাবছি, কাল প্লেন নিয়ে যাব। আকাশ থেকে দেখব বাড়িটা। ছবি তোলার চেষ্টা করব। তারপর ছবি দেখে সবাই মিলে ঠিক করব, পায়ে হেঁটে কিংবা গাড়িতে করে কোন কোন জায়গায় খুঁজতে হবে। কি বলো, কিশোর?'

'চমৎকার বুদ্ধি! এরচেয়ে ভাল আর হয় না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের ইচ্ছেমত কোথাও যেতে চাইলে বাধা দিতে পারবেন জেনারেল। জোর করে কিছু করতে গেলে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনতে পারবেন। কিন্তু আকাশ তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে।'

'যদি পাসপোর্ট দাবি করে বসেন?' হেসে বলল মুসা। 'খুদে আফ্রিকার ভূমিসহ আকাশটাকেও যদি তাঁর সম্পত্তি মনে করেন?'

'তাহলে ভুল করবেন। এবং শেষে পস্তাতে হবে।'

পাঁচ

পরদিন সকাল দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ডুগান এস্টেটের ওপর বিমান উড়াতে লাগল ওমর। পাশে বসেছে রবিন। মুসা আর কিশোর পেছনে। কিশোরের হাতে ক্যামেরা।

'এটাই,' রবিন বলল।

এক চক্কর দিয়ে ছোট্ট বিমানটাকে এস্টেটের এক হাজার ফুট ওপরে নামিয়ে আনল ওমর। প্রচুর গাছপালা আছে জায়গাটাতে। কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও পাতলা, কোথাও বা একআধটা গাছ নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে।

ঝকঝকে সুন্দর দিন। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। আকাশ থেকে ছবি তোলার জন্যে উপযুক্ত। ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হলো কিশোর।

রবিনের চোখ কপ্টারটাকে খুঁজছে।

এস্টেটের ওপর উড়তে উড়তে ওমর বলল, 'কই, দেখছি না তো।'

'মনে হয় নেই এখানে,' রবিন বলল, 'তাহলে এতক্ষণে চোখে পড়ে যেত।'

'ওই যে বড় ঘরটা,' কিশোর বলল, 'প্রাসাদের বাঁদিকের খোলা জায়গায়, ওটা কিজন্যে বানিয়েছে?'

'কেন, ওরকম ঘর বানানো কি নিষেধ নাকি?' মুসা বলল।

সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে বলল কিশোর, 'ওটা কেন বানিয়েছে জানতে পারলে কাজ হত। নতুন মনে হচ্ছে। আস্তাবল হলে মূল বাড়ির আরও কাছাকাছি থাকত। আস্তাবল ওভাবেই বানানো হয়, সুবিধের জন্যে।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'খোলা জায়গায় বানানো হয়েছে ঘরটা, গাছপালাও নেই ধারেকাছে। এর একটাই কারণ মনে হচ্ছে আমার, ছোট কোন বিমান রাখার ছাউনি ওটা, হেলিকপ্টার তো অনায়াসে রাখা যাবে।'

'কেন, গোয়াল হলেই বা ক্ষতি কি? মোষগুলোকেও অনায়াসেই রাখা যায়। এটা আফ্রিকা নয়, সব সময় গরম থাকে না, শীতকালের প্রচণ্ড শীত সহ্য করতে পারবে না এত গরম অঞ্চলের প্রাণী। নিশ্চয় তখন ভেতরে ঢুকিয়ে বাঁচানো হয় ওগুলোকে।'

'ঘরটা একেবারেই নতুন,' মুসার যুক্তি মেনে নিতে পারল না কিশোর। 'আর বর্গাকার করে বানানো হলো কেন? গোয়াল এ ভাবে বানায় না কেউ। ওগুলো পাশে কম আর লম্বায় অনেক বেশি হয়।'

'তাহলে গুদাম। হয়তো মোষের খাবার রাখে। এই খড়টড় জাতীয় জিনিস।'

ওমরকে বলল কিশোর, 'ওমরভাই, বাঁয়ের ওই বড় ছাউনিটার কাছে নিয়ে

যান তো।'

ঘরটা ওমরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরের মত একই সন্দেহ তারও। নিয়ে এল ওটার ওপরে।

আঙুল তুলে কিশোর বলল মুসাকে, 'ওই দেখো, ঘাসের ওপর দাগ। কিসের বলে মনে হয় তোমার? মোষের খুরের?'

'নাহ, চাকার দাগ বলেই তো মনে হচ্ছে! তবে তাতেও প্রমাণ হয় না যে হেলিকপ্টারের চাকার। ট্রাক্টরের চাকারও হতে পারে। ছাউনি থেকে ট্রাক্টরে করে খাবার নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসা হয় মোষগুলোকে।'

'কেন, ওগুলোর খাবারের কি অভাব নাকি? এত এত রসাল তাজা ঘাস ফেলে শুকনো খড় খেতে যাবে ওরা কোন দুঃখে?'

'আকালের সময়…'

'দূর, ওসব কোন যুক্তিই না,' হাত নেড়ে মুসার কথাকে উড়িয়ে দিল কিশোর। 'কপ্টার ছাড়া আর কিছু রাখার কথা ভাবতে পারছি না আমি। পার্কে অনেক লোক আসে। কারও চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় ওটাকে।'

আর কিছু না বলে ছবি তোলায় মন দিল কিশোর।

হঠাৎ পিস্তলের গুলির মত তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। কয়েক সেকেন্ড পর আবার। তারপর ফটফট ফটফট করে শব্দ হতেই থাকল।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'মিসফায়ার করছে এঞ্জিন! মরেছি!'

টলমল করে উঠল বিমান। ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল, শান্ত রয়েছে ওমর। থ্রটলে চেপে বসেছে আঙুল।

দীর্ঘ একটা চক্কর দিয়ে নাক নিচু করে ফেলল বিমান। মাটির দিকে ধেয়ে চলল।

'কি করছেন?'

'নামা ছাড়া গতি নেই।'

'উফ্, পুরানো জিনিসের এইই সমস্যা! এঞ্জিন গোলমাল করার আর সময় পেল না! বাইরে কোথাও নামানো যায় না?'

'না। অতিরিক্ত গাছপালা, দেখছ না। ল্যান্ড করার জায়গা আশেপাশে কোথাও নেই। এখানেই নামতে হবে।'

'চমৎকার! মোষে গুঁতোতে এলে কি করব?'

'কি আর, গুঁতো খেয়ে মরব। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে সব। দেখি, কপালে কি লেখা আছে!'

'কপালে আছে ভর্তা হওয়া, আর কি! হায়রে খোদা, এ রকম অপঘাতে মরতে হবে, যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম…'

'কথা বোলো না। শেষে গাছের গায়েই গুঁতো লাগিয়ে দেব।'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

এঞ্জিনের ফটফট থেমে গেছে। সেই সঙ্গে এঞ্জিনও বন্ধ। বাতাসে ভর দিয়ে চিলের মত গ্লাইডিং করে ভাসছে এখন বিমান। সাঁ সাঁ করে নেমে

চলেছে।

অসাধারণ দক্ষতায় সমতল মাটিতে বিমান নামিয়ে আনল ওমর। ঘাসে ঢাকা মাটিতে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল। যে ঘরটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সেটার বিশ-তিরিশ গজ সামনে এনে থামাল। মোষগুলো বেশি দূরে নয়। শুয়ে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বিমানটার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ফোঁস ফোঁস করে মাটিতে খুর ঠুকতে লাগল।

ককপিটের দরজা খুলে নামার জন্যে তৈরি হলো ওমর।

ভয় পেয়ে গেল রবিন। 'কি করছেন?'

'এঞ্জিনে গোলমাল হলো কেন দেখে আসি। তোমরা চোখ রাখো। মোষগুলোকে এগোতে দেখলেই ডাক দেবে।'

উত্তেজিত হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'কি দেখছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আরও একটা গোলমাল দেখতে পাচ্ছি ঘরটায়।'

'কি?'

'একটা জানালাও নেই। জানালাশূন্য ইঁটের ঘর, বাতাস ঢুকবে কোনখান দিয়ে? অক্সিজেন ছাড়া বদ্ধ জায়গায় কেবল একটা জিনিসই বাঁচতে পারে।'

'কি?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে মুসা।

'যার প্রাণ নেই।'

'কি আবল-তাবল...ভূ-ভূ...'

'না, ভূত নয়। হেলিকপ্টার!'

'জানালা না থাকলেও স্কাইলাইট আছে, আমি দেখেছি,' রবিন বলল। 'বাড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে মোষগুলোর দিকে তাকাও। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।'

'আমরা খোঁচাতে না গেলে ওরা কিছু করবে না। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনই করতে থাকবে। মানুষ দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে ওদের।'

'কিন্তু যদি খেপে ওঠে, ম্যাচ বাক্সের মত গুঁড়িয়ে ফেলবে প্লেনটাকে।'

'বসে বসে আল্লাহ্‌কে ডাকো,' কাঁপা গলায় বলল মুসা। 'আর কিছু করার নেই এখন।'

খুব সাবধানে নেমে মোষগুলোর ওপর এক চোখ রেখে বিমানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওমর। এঞ্জিন কাউলিং খুলল।

মোষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ওমরকে দেখে জোরে জোরে মাটিতে খুর ঠুকল একটা বিরাট মদ্দা।

'ওমরভাই, জলদি চলে আসুন!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

এল না ওমর। মোষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। এঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে, খানিক পর পরই মুখ তুলে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। বিশাল একমাত্র কাঠের দরজাটার দিকে নজর। বন্ধ। ওটা না খুললে ভেতরে কি আছে দেখা যাবে না।

গাড়ির এঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকাল সবাই। প্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ল্যান্ড-রোভার। তাতে দুজন লোক।

ঝট করে আবার এঞ্জিনের ওপর মুখ নামিয়ে ফেলল ওমর। গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে লাগল।

কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল ল্যান্ড-রোভার। একজন বসে রইল ড্রাইভিং সীটে, অন্যজন লাফ দিয়ে নামল। হাসিমুখে এসে দাঁড়াল ওমরের পাশে, 'এঞ্জিন ট্রাবল?'

লোকটা অনেক লম্বা, চওড়া কাঁধ, ক্লীন শেভড, হাসিমুখ। গায়ে পুরানো টুইডের জ্যাকেট, মাথায় ডিয়ারস্টকার ক্যাপ।

'হ্যাঁ,' বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিল ওমর, 'পুরানো হলে যা হয়।'

'জানালা দিয়ে দেখলাম আপনি নেমে আসছেন। সাহায্য লাগবে?'

'নো, থ্যাংকস। দুতিন মিনিটের বেশি লাগবে না আমার ঠিক করতে। টারমিনালের ওই গাধা মেকানিকটাকে দিয়েছিলাম নাটবল্টুগুলো একটু টাইট দিয়ে দিতে, ঘোড়ার ডিম করেছে। ঢিলাই রেখে দিয়েছে ফাঁকিবাজটা। ভাগ্যিস নামার জায়গা পেয়েছিলাম, নইলে মরতাম আজ।' স্প্যানার দিয়ে খুটুর-খাটুর শুরু করল ওমর।

'আপনি পারবেন? নাকি মেকানিক ডাকতে হবে। আমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারেন।'

'না, লাগবে না, আমিই পারব।'

'তাহলে আসুন, এক গ্লাস শেরি খেয়ে যান। নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে?'

'না না, লাগবে না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' কাউলিংটা লাগিয়ে দিল ওমর। 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়। গোপন করার কিছু নেই। আমি উইলার্ড ব্রন ডুগান।' গাড়িতে বসা লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ও আমার ভাই হ্যারি। হারবার্ট ব্রন ডুগান। আপনাদের নামতে দেখে আমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে ও। মোষগুলোকে চেনে তো।'

'এখনও কিছু করেনি।'

'সুযোগ দিলেই করবে। অপরিচিত কাউকে দেখলেই খেপে যায়। শুধু চেনে ওই পুরানো ল্যান্ড-রোভার, আমাকে আর আমার ভাইকে।'

'ওই দানবগুলোকে রেখেছেন কেন?'

'প্রহরী, প্রহরী,' হাসতে হাসতে জবাব দিল ডুগান। 'কুকুর কিংবা মানুষের চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য। প্রায়ই চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ত আগে। ওগুলোকে আনার পর এক ব্যাটাকে গুঁতিয়ে যখন আধমরা করে দিল, আর কেউ ঢোকে না। লোকটার কপাল ভাল, শিঙে তুলে ছুঁড়ে দেয়ার পর ওপরের একটা ডাল ধরতে পেরেছিল, নইলে ভর্তা করে ফেলত। আদালত দেখিয়ে ছাড়ত আমাকে।'

'হুঁ, সাংঘাতিক প্রহরী!...দেখি, ঠিক হলো নাকি?' ককপিটের দিকে এগোল ওমর।

'হ্যাঁ, দেখুন। মেকানিকের দরকার পড়লে ফোন করে দেয়া যাবে। আসুন না, একটা ড্রিংক খেয়েই যান?'

'সত্যি এখন সময় নেই। একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। অন্য আরেকদিন এসে আপনার মেহমান হয়ে যাব।'

'সানন্দে। যে কোন সময় চলে আসবেন।'

ককপিটে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল ওমর। পেছনে তাকিয়ে মুসাকে দেখতে পেল না।

প্রায় ফিসফিস করে রবিন জানাল, 'ও মেঝেতে। সানগ্লাসটা পড়ে গেছে, খুঁজছে ওটা।'

স্টার্টার টিপে দিল ওমর। মুহূর্তে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। হাত নেড়ে ডুগানকে গুড-বাই জানাল। বিমানের পথ ছেড়ে দিয়ে ল্যান্ড-রোভারের কাছে সরে দাঁড়াল জেনারেল।

আপাতত আর কিছু করা যাবে না এখানে। বিমান নিয়ে আকাশে উড়ল ওমর। পার্কের ওপরে আর চক্কর দেয়ারও কোন মানে নেই। সোজা বাড়ি রওনা হলো।

পেছন থেকে কিশোর বলল, 'আসার আগে এঞ্জিনে গোলমাল করে রেখেছিলেন, না?'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল ওমর। 'না।'

'তাহলে?'

'ওই অদ্ভুত ঘরটা দেখে আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। দিলাম তেল বেশি ছেড়ে কারবুরেটর ওভারফ্লাডেড করে। নিচে নেমে অযথাই খুটুরখাটুর করেছি। জেনারেল না এলে ঘরটাতে ঢোকার চেষ্টা করতাম।'

'তাঁকে খুব ভাল লোক বলে মনে হলো আমার,' রবিন বলল।

'প্রথম দর্শনে তাই মনে হয়।'

'তা হবে কেন? মোষগুলো যাতে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এলেন...'

'উদ্বিগ্নটা তাঁর নিজের জন্যেও হতে পারেন।'

ভুরু উঁচু করল রবিন। 'নিজের জন্যে মানে?'

'ওই ঘরটার ভেতর যাতে উঁকি দিতে না পারি আমরা সেজন্যে।'

'কিশোরের মত আপনারও সব কিছুতে অতিসন্দেহ। এত খাতির করলেন ভদ্রলোক...তারপরেও...'

'ওই অতিখাতিরই আরও বেশি সন্দেহ জাগিয়েছে আমার। এত সাধাসাধির কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের চেনেও না সে। প্রবাদটা শোননি, হাসির কারণ না থাকলেও যারা বেশি বেশি হাসে তাদের ব্যাপারে সাবধান? বহুকাল আগে একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলে গেছেন, না চাইতেই যে লোক তোমার কাছে মুখভর্তি হাসি আর উপহার নিয়ে আসে, তাকে দেখলে সতর্ক থেকো।'

'তা আপনি থাকুনগে। আমার কাছে ডুগানকে খুব ভদ্রলোক মনে হয়েছে।...চোরা চোখে তো বার বার ঘরটার দিকে তাকালেন। দেখলেন কিছু?'

'কি করে দেখব? ইঁটের দেয়ালের ওপাশে মানুষের নজর চলে না। তবে কিশোরের সঙ্গে আমিও একমত, ঘরটা সন্দেহজনক।' ফিরে তাকাল ওমর। সীটে উঠে বসেছে মুসা। 'মেঝেতে লুকিয়েছিলে কেন?'

'ল্যান্ড-রোভারটা দেখে।'

'কেন, ভূতুড়ে মনে হয়েছে?'

'শুনলে চমকে যাবেন। গাড়ির ড্রাইভার কে ছিল জানেন? প্যাসিফিক গ্রীন হোটেলে আমাকে ঘুষ সাধতে আসা শোফার। প্লেনে আমাকে বসে থাকতে দেখলে নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবত—প্রিন্সেসের গাড়ির শোফার এখানে কি করছে? ভাবার সুযোগটা আর তাকে দিলাম না।'

রবিনের দিকে তাকাল ওমর। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলো এখন, তোমার বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির ব্যাপারে এখন কি মন্তব্য করবে?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে রবিন বলল, 'ভাই চোর বলেই যে তিনিও চোর হবেন, এর কোন যুক্তি নেই। হ্যারিই হয়তো চোরের দলের সর্দার। এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না জেনারেল।' কিশোরের দিকে ফিরল সে, 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'আমি ওমরভাইয়ের সঙ্গে একমত,' রায় দিয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান, 'জেনারেল ডুগানকে আমার মোটেও সাধু মনে হয়নি।'

একটু চুপ থেকে ওমর বলল, 'ওই ঘরটাতে আছে মূল্যবান সূত্র। ঢুকে দেখতে হবে।'

'কিভাবে ঢুকবেন?' জানতে চাইল রবিন।

'চলো, অফিসে গিয়ে ভালমত চিন্তাভাবনা করি। বুদ্ধি একটা বেরিয়েই যাবে।'

ছয়

'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল ওমর। 'তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। জেনারেল ডুগানকে সন্দেহজনক লোক মনে হয়েছে আমার। কেন, সেটা ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'আমি এখনও বলব, আমার কাছে খারাপ লাগেনি,' রবিন বলল।

ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিসে বসে আলোচনা হচ্ছে।

'কেন লাগেনি সেটাই বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'মুসা, তুমি শিওর, হ্যারিই শোফার সেজে তোমাকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেছিল?'

'একবিন্দু সন্দেহ নেই আমার তাতে,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা।

'বেশ, তাহলে ধরে নেয়া গেল হ্যারি একজন অপরাধী। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। সে কি করে না করে তার ভাইয়ের নিশ্চয় জানা থাকার কথা। জেনেও যখন ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তারমানে সে নিজেও অপরাধী। হ্যারি আসলেই জেনারেলের ভাই কিনা, সেব্যাপারেও আমার

যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আমার ভাবনা এখন একটাই,' ওমর বলল, 'ঘরটায় কি আছে দেখা।'

'কিভাবে দেখবেন?' ভুরু নাচাল রবিন। 'জানালা নেই, দরজাও লাগানো থাকে।'

'স্কাইলাইট আছে।'

'উঠবেন কি করে সেখানে?'

'কেন, হালকা ধাতু দিয়ে তৈরি এক্সটেনডিং কিংবা টেলিস্কোপিক ল্যাডারের নাম শোননি? বয়ে নিতে খুবই সুবিধে।'

'তারমানে দেয়াল টপকে চলে যেতে চান ভয়ঙ্কর জানোয়ারে ঘিরে রাখা ওই ঘরটার কাছে?'

'যদি এরচেয়ে ভাল আর কোন বুদ্ধি তুমি দিতে না পারো।'

'কখন করতে চান এই পাগলামিটা?'

'দিনের আলোয় করাটা অতিমাত্রায় বোকামি হয়ে যাবে। তাই যেতে হবে রাতের অন্ধকারে। আজ রাতেই চেষ্টা করে দেখতে পারি। গাড়ি নিয়ে চলে যাব। প্লেন নিয়ে যাওয়া যাবে না। ল্যান্ড-করার শব্দ কানে গেলেই ছুটে আসবে তোমার ভদ্রলোক জেনারেল।'

মুসা বলল, 'আপনার সঙ্গে নিশ্চয় আমাদেরও যেতে হবে? নইলে নিচ থেকে মই ধরে রাখবে কে? আরও অনেক সাহায্য-সহযোগিতা লাগবে হয়তো?'

'তা তো লাগবেই,' অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল ওমর। 'তবে তোমাকে নেয়া যাবে না। হ্যারি তোমাকে চেনে। কিশোর আর রবিন যাবে।'

হেসে বলল রবিন, 'চুরি করে না গিয়ে বরং শেরির দাওয়াতটাই কবুল করে ফেলুন না?'

'দাওয়াত কবুল করলে প্রাসাদে নিয়ে যাবে জেনারেল, রহস্যময় ঘরটাতে কি আছে দেখতে দেবে না। দেখতে হলে চুরি করেই যেতে হবে। চুপি চুপি গিয়ে আগে দেখে আসি ঘরটাতে কি আছে। তারপর দিনের বেলা গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে থেকে দেখব আরও কি মহার্ঘ বস্তু প্রাসাদে বোঝাই করে রেখেছেন তিনি।'

'কি সূত্র পাবেন আশা করছেন আপনি?' জানতে চাইল কিশোর।

'তোমার কি মনে হয়?'

'হেলিকপ্টার। ওটা দেখলে আর কোন সন্দেহ থাকবে না, ডুগানই আমাদের লোক। ডাকাতদের দলপতি। ব্যাংকের সোনা লুট, মিউজিয়ামে চুরি আর মহাসড়কে ছিনতাইয়ের নায়ক।'

'ধরা যাক, জানলাম। তারপর?' রবিনের প্রশ্ন।

'চোর কে জানতে পারলে সোনাগুলো কোথায় খুঁজতে হবে সেটাও অনুমান করা যাবে। ডাকাতদলের হাতে হাতকড়া পরাতে তেমন অসুবিধে হবে না তখন।' ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠিকই বলেছেন, আজ রাতেই যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলা যায়, ভাল।'

'সন্ধ্যারাতে যাওয়া ঠিক হবে না,' ওমর বলল। 'ভোরের আগে আগে ঢুকব, চাঁদ যখন ডুবতে থাকবে। সকাল সকাল শুয়ে পড়ে বরং যতটা পারি ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।'

'তা মন্দ হয় না।'

মধ্যরাতের সামান্য পরে ওমরের গাড়িতে রওনা হলো ওরা। রবিন রাস্তা চেনে। পাশে বসেছে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। পেছনে বসেছে অন্য দুজন। প্রায় জোর করে সঙ্গে এসেছে মুসা। সবাই যাবে অ্যাডভেঞ্চারে, বাড়িতে সে একা বসে থাকতে পারেনি। ঠিক করেছে পার্কের বাইরে গাড়িতে বসে থাকবে, ভেতর ঢুকবে না।

ওদের পায়ের কাছে ফেলে রাখা হয়েছে হালকা ধাতু দিয়ে তৈরি মইটা। রেডিওর অ্যানটেনার টুকরো যেভাবে একটার মধ্যে আরেকটা ঢোকানো থাকে, টেনে টেনে লম্বা করতে হয়, মইটাও অনেকটা তেমনি। কিশোরের পাশে সীটের ওপর দুটো শক্তিশালী টর্চ ফেলে রাখা। সঙ্গে নিয়ে ঢুকবে।

সারাটা পথই প্রায় ঘুমিয়ে কাটাল মুসা। এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকুনি লাগার সময় বার দুই ঠোকা খেল মাথার পাশে। একটা ঠোকা তো বেশ জোরে, গোলআলুর মত ফুলে গেছে জায়গাটা। তবে সেটা নিয়ে বিশেষ অনুযোগ করল না সে, ঘুমানো চালিয়ে গেল।

অবশেষে গাড়ি থামাল ওমর। একপাশে পার্কের দেয়াল। অন্যপাশে বড় বড় গাছের মাথা বেরিয়ে আছে।

'ঢুকবেই তাহলে?' পেছন ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেন, এখনও সন্দেহ আছে নাকি তোমার?' জবাব দিল কিশোর। 'এক কাজ করো, তুমি আর মুসা বসে থাকো। বলা যায় না, কোন্ বিপদে গিয়ে পড়ি আমরা। যদি অনেক দেরি হয়, মনে করো আটকা পড়েছি কিংবা খারাপ কিছু ঘটে গেছে আমাদের, সোজা চলে যাবে ক্যাপ্টেনের কাছে।'

'তারজন্যে মুসাই তো যথেষ্ট, আমি আর বসে থাকি কেন?'

'না, থাকো। দুজন একসঙ্গে থাকলে সুবিধে হতে পারে। ঘরটা দেখতে যাওয়ার জন্যে আমি আর ওমরভাইই যথেষ্ট। আরও একটা কারণে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি না, বেশি মানুষ দেখলে মোষগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে।'

'আসলে যে নিয়ে যেতে চাও না, সেটা বলো, অত কৈফিয়তের দরকার কি?' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'ঠিক আছে, নেতার কথাই সই।'

'এখান থেকে নোড়ো না। তাহলে ফিরে এসে আবার খুঁজে বের করতে মুশকিল হয়ে যাবে।'

মইয়ের সাহায্যে দেয়াল টপকাতে অসুবিধে হলো না। গাঢ় অন্ধকার। চাঁদ এখনও ডোবেনি, তবে মেঘে ঢাকা পড়েছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকতে পারছে না মাটিতে। আগাছা নেই। ঝরা পাতা মর্মর করছে পায়ের চাপে।

'মইটা আনতে পারবে?' ওমর বলল। 'আমি আগে আগে থাকছি।

সামনে কেউ পড়ে গেলে সামলানোর চেষ্টা করব। জঙ্গলের মধ্যে যতক্ষণ আছি, টর্চ জ্বালা যাবে।'

পাতা এড়িয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলে এল ওরা বনের কিনারে। ডালপালা এখানে পাতলা। মেঘ সরে গেলেই ফ্যাকাসে চাঁদের হালকা আলো ঢুকছে পাতার ফাঁক দিয়ে। এ জায়গাটাতে প্রচুর ঝোপঝাড় আছে। সামনে একটুকরো ঘেসোজমি।

টর্চ নিভিয়ে আগে বাড়তে যাবে ওমর, হঠাৎ ঝোপের মধ্যে হুড়মুড় করে শব্দ হলো। সর্বনাশ! মোষ না তো! থমকে দাঁড়াল ওমর। ধড়াস করে আছাড় খেল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। আবার টর্চ জ্বেলে ঝোপের দিকে ফেলল ওমর। কিছু নেই। আলোটা নিভিয়ে দিল আবার।

'কিসে করল?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। গলা কাঁপছে।

'বুঝলাম না।'

কয়েক পা এগোতেই কানের কাছে যেন বোমা ফাটাল বিদঘুটে একটা চিৎকার। ভয়ঙ্কর অট্টহাসি।

ওমরের হাত খামচে ধরল কিশোর। 'ও কিসের…' পরক্ষণে ছেড়ে দিল হাতটা। 'হায়েনা! জনাব জেনারেল পুরোপুরি আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্ক বানিয়ে ছেড়েছে জায়গাটাকে। এরপর কি আসবে? চিতা?'

'এলে অবাক হব না। সিংহ নেই যে তাই বাঁচোয়া।'

'অন্ধকারে চিতাবাঘ সিংহের চেয়েও মারাত্মক।'

নিজেকে লুকানোর কোন চেষ্টাই করল না হায়েনাটা। ঝুপঝাপ শব্দ তুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল মাঠের ওপর দিয়ে। হালকা চাঁদের আলোয় কুৎসিত কুঁজো আর কালো দেখাল বাঁকা পিঠটা। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলল, 'মোষগুলোর মত মানুষবিদ্বেষী নয় ওটা, বাঁচা গেছে।'

'চান্স পেলে আস্ত পা কামড়ে কেটে নিয়ে চলে যেত, এটাও ঠিক। আফ্রিকায় শিকার করতে গিয়ে কত শিকারি যে পা হারিয়েছে…'

'সেটা ঘুমন্ত অবস্থায়। জেগে থাকা মানুষকে একা কোন হায়েনা আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে বলে শুনিনি।'

পা বাড়াল ওমর। পেছনে চলল কিশোর। অবশেষে এসে দাঁড়াল বাড়িটার কাছে। পেছনে বড় বড় গাছের জটলা। শিশিরভেজা চাঁদের আলোয় সবকিছু কেমন নীরব, নিথর। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই।

'মোষগুলো কই?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নেই তো ভাল হয়েছে, বাঁচলাম। থাকলে তো বিপদ হত। তবে অত নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। নিশ্চয় গাছের নিচে ঘুমাচ্ছে।'

এগিয়ে চলল ওমর। কয়েক পা যেতে না যেতেই ভয়ানক এক ধাক্কা দিয়ে কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে মাটিতে। তোলার জন্যে দৌড়ে গেল কিশোর।

'চুপ!' উঠে বসল ওমর। 'নোড়ো না! এ জিনিস এখানে থাকবে কল্পনাও

করিনি।'

'কি? তার নাকি?'

'হ্যাঁ, ইলেকট্রিকের তার। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের কৃষকরা দেখেছি গবাদি পশুকে আটকে রাখার জন্যে এ রকম তারের বেড়া দেয়।'

'কিন্তু এখানে কেন?'

'হয়তো মোষগুলোকে আটকানোর জন্যে। রাতে সুইচ অন করে দেয়া হয়। চুরি করে কেউ যদি ঢুকে তারে শক খেয়ে মরে, দোষ দেয়া যাবে না বাড়ির মালিককে। বেআইনীভাবে ঢুকল কেন? ক্রল করে নিচ দিয়ে চলে এসো। সাবধান, মইটায় যেন ছোঁয়া না লাগে।'

'আপনার কিছু হয়নি তো?'

'না। এক পায়ে সামান্য একটু ছোঁয়া লেগেছে কেবল। তাতেই এই...'

তারের অন্যপাশে বেরিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল ওরা। খোলা ঘাসের মাঠ। বাড়িটার কাছাকাছি এসে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গাছের কিনার ধরে সতর্ক হয়ে এগোল।

মইটাকে শক্ত করে বগলে চেপে এগোচ্ছে কিশোর। একটা চোখ রেখেছে মোষের দিকে, কালো বড় কোন ছায়া নড়ে উঠতে দেখলেই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল না। কুয়াশার মত হালকা ভাপ উঠছে মাটি থেকে। কাছাকাছি মোষগুলো থেকে থাকলেও ভাপের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।

বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। মইটা টেনে লম্বা করে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করাল ওমর। চালার কাছে গিয়ে ঠেকেছে শেষ মাথা। কিশোরকে বলল, 'দেখে আসতে আমার দুমিনিটের বেশি লাগবে না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখো। এ সময়ে কেউ পাহারায় আছে বলে মনে হয় না, তবু...নড়াচড়া দেখলেই আমাকে সাবধান করবে।'

মই বেয়ে উঠে গেল সে।

গোড়ায় দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। এত অল্প আলোয় উঁচুনিচু আর অসমতল জায়গাগুলো স্পষ্ট নয়। রঙটাও লাগছে কেমন ধূসর। অনিশ্চিত ওই আজব আলোয় কোন্ দিক থেকে যে অলক্ষে এগিয়ে আসবে বিপদ, বোঝার উপায় নেই।

সাত

টিনের চালায় ওমরের নড়াচড়ার মৃদু খসখস, মড়মড় শব্দ হচ্ছে। শিশিরে ভেজা পিচ্ছিল টিন। বাতাসও ভেজা ভেজা। কনকনে ঠাণ্ডা। মুমূর্ষু চাঁদের আলো আরও ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। তারার উজ্জ্বলতা একেবারে নেই। বেশির ভাগই দিনের আগমনের সাড়া পেয়ে মুখ লুকিয়েছে বিশাল আকাশের আঁচলের নিচে, কেবল অতিরিক্ত বড় আর উজ্জ্বল তারাগুলো এখনও নির্লজ্জের মত টিকে থাকার চেষ্টা করছে কোনমতে।

'দুমিনিট' বলেছিল বটে ওমর, কিন্তু কাজটা সারতে আরও অনেক দেরি

হয়ে গেল, কারণ আপদ এড়ানো গেল না।

` তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোরের শরীর। বিশাল একটা কালো ছায়া যেন বেরিয়ে এসেছে বাষ্পের চাদর ফুঁড়ে। নড়ছে ওটা। বড় হচ্ছে। এগিয়ে আসছে।

মোষটাকে চিনতে সময় লাগল না ওর। বিশাল জানোয়ার। মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই। ধাড়ী মদ্দাটার বিরাট শিংদুটোও দৃষ্টিগোচর হলো। আধোআলোয় ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে গিয়ে আরও বড় দেখাচ্ছে শিঙের অবয়ব। মাথা দোলানোর সঙ্গে সঙ্গে শিংও দুলছে। এখনও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি ওটা, তবে মনে হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই দৃঢ়পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। আশা করছে, এ ভাবে থাকতে পারলে ওকে চোখে পড়বে না মোষটার।

কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। এগিয়েই আসছে দৈত্যটা। মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে হ্যাঁচকা টানে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরছে।

শঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। তাকে আরও ভড়কে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওটা। এই দাঁড়িয়ে যাওয়া, নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ নেয়ার মানে জানা আছে ওর—ওকে দেখে ফেলেছে মোষটা। মাটিতে খুর দাপাল। এগিয়ে আসতে শুরু করল আবার, আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে। নাক দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ বেরোচ্ছে।

আর চুপ থেকে লাভ নেই। হাত নেড়ে ওটাকে থামানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। কেউ শুনে ফেলার ভয়ে চিৎকার করতে পারছে না। সামান্যতম প্রতিক্রিয়া হলো না মোষটার। এগিয়েই আসতে থাকল।

মাথা গরম করল না কিশোর। বড়জোর আর বিশ ফুট দূরে আছে মোষটা। ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে আসতে পারে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কিন্তু দৌড় দেয়া হবে এখন আত্মহত্যার শামিল। কয়েক গজ যেতে না যেতেই ধরে ফেলবে ওকে। অতএব একমাত্র যা করণীয় তাই করল সে। মই বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। চালায় বসে নিচে তাকাল। মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মোষটা। ধরতে না পারার হতাশায় ফোঁসফোঁসানি বেড়েছে ওটার।

এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। কে কোনখান থেকে দেখে ফেলবে। ঢালু চালা বেয়ে ওমরের কাছে স্কাইলাইটের ধারে উঠে চলে এল কিশোর।

মচমচ করে উঠল টিন। ফিরে তাকাল ওমর। 'কি ব্যাপার? আমি তো তোমাকে…'

'থাকতে পারলাম না।'

'কেন?'

'আরেকটু হলেই গুঁতিয়ে আলুভর্তা বানিয়ে দিত।'

'কোথায় ওটা?'

'মইয়ের গোড়ায়। ওদিক দিয়ে নামার আশা বাদ দিন।'

'মরতে আসার আর সময় পেল না শয়তানটা! কিন্তু এখানে তো থাকা

যাবে না বেশিক্ষণ। আলো ফুটলে কেউ এসে যদি মইটা দেখে ফেলে, কোনও জবাব থাকবে না।'

'কয়েক মিনিট বসে থেকে দেখি কি হয়। চলেও যেতে পারে। আপনার কাজ হলো?'

'না।'

'কেন?'

'ঘষা, ঘোলা কাঁচ। টর্চ জ্বেলে চেষ্টা করেছি। কিছুই দেখা যায় না। এখন আর কিছু করারও নেই। পালাতে পারলে বাঁচি।'

'দেখে আসি।' নিচে নামতে শুরু করল কিশোর। মাটি দেখা যেতে থেমে গিয়ে জানাল, 'দাঁড়িয়েই আছে!' ফিরে এল ওমরের কাছে। 'আমাকে দেখে ফেলেছে তো, দুচারটে গুঁতোগাঁতা না দিয়ে যেতে মন চাইছে না।'

'ইচ্ছে করছে চাবকে সিধে করে দিই, মোষের বাচ্চা মোষ!' দিগন্তের দিকে তাকাল ওমর। পরিষ্কার হয়ে আসছে পুবের আকাশ।

'একটা কাজ করা যায়।'

'বলো?'

'মইটা তুলে আনি। চালার অন্যপাশ দিয়ে নেমে যাব। মোষটা দেখতে পাবে না। গন্ধ পেয়ে ছুটে আসার আগেই একদৌড়ে চলে যেতে পারব বনের মধ্যে।'

ভেবে দেখল ওমর। 'কাজ হলেও হতে পারে। তবে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। দেখি আরও দুতিন মিনিট অপেক্ষা করে...'

ঠিক এই সময় কানে এল এঞ্জিনের শব্দ।

'কপ্টার!' রোটরের ঘটঘট ঘটঘট শব্দটা চিনতে ভুল হলো না কিশোরের।

'বাহ্, ষোলোকলা পূর্ণ হলো এতক্ষণে!' আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল ওমর। 'নিচে মোষ, ওপরে কপ্টার, ওদিকে আলো ফুটছে...কপ্টারটা এখন এদিকে এলেই হয়। এত ভোরে শীতের মধ্যে দুজন মানুষকে চালায় শুয়ে থাকার দৃশ্যটা নিশ্চয় চমৎকার লাগবে পাইলটের কাছে। নেমে দৌড় দেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না। দেখো, তাড়াহুড়োয় পিছলে গিয়ে চালা থেকে পড়ে যেয়ো না আবার। আরেক বিপদ বাধাবে।'

হালকা মই, বেয়ে ওঠার চেয়েও নামাটা কঠিন। শুকনো হলেও এক কথা ছিল, ভেজা চালায় হাত যায় পিছলে। আঙুল ছুটে গেলে ধপ্পাস করে বালির বস্তার মত পড়তে হবে কঠিন মাটিতে। মইয়ের ধাপে দ্রুত পা রাখতে গিয়ে আরেকটু হলে ফেলে দিচ্ছিল ওটা কিশোর। শব্দ হয়ে গেল। ঝট করে ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল কিছুদূরে আরেকটা মোষ। নিশ্চিন্তে জাবর কাটছিল, শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গেল। তবে ওর দিকে নজর নেই মোষটার। হেলিকপ্টারের শব্দে কান খাড়া করেছে হয়তো। অবশ্য বলা যায় না কিছুই। ওর গন্ধও নাকে যেতে পারে।

মুহূর্ত পরে আরেক বিপদ। আচমকা ঘাসের মাঠে একসারি আলো জ্বলে

উঠে একটা ইংরেজি L অক্ষর রচনা করল। মইয়ে পা রেখে বিমূঢ়ের মত সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওগুলো কিসের আলো বোঝার বুদ্ধি হয়ে গেছে বহুকাল আগেই, ল্যান্ডিং লাইটস। অন্ধকারে হেলিকপ্টার নামানোর জায়গা নির্দেশ করার জন্যে তৈরি হয় ওরকম আলোকমালা। বিপদের ওপর আরও বিপদ। প্রাসাদের দিক থেকে ভেসে এল গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ।

আবার চালায় উঠে পড়ল কিশোর। শব্দ না করে তুলে আনল মইটা। ঠেলে দিল ওমরের দিকে। ওটা নিয়ে ওমর চলে গেল ঘরের আরেকপ্রান্তে। ডেকে বলল, 'জলদি এসো!'

ভেজা চালায় কয়েকবার করে পিছলে পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে ওমরের কাছে এসে পৌঁছল কিশোর। দুই পাশের দুটো মোষের একটাকেও চোখে পড়ছে না এখান থেকে। তবে ওগুলো যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরে গেলে চোখে পড়ত।

মাটিতে নেমে ওমর বলল, 'এটা ফেলে যাওয়া যাবে না।' ছোট করারও সময় নেই। ওভাবে খোলা অবস্থায় হাতে নিয়েই দৌড় মারল গাছের জটলার দিকে।

ছুটতে ছুটতে কিশোর কান খাড়া করে রেখেছে কখন শুনতে পাবে ঘাড়ের পেছনে খুরের শব্দ। কিন্তু গাছের ভিড়ে ঢুকে যাওয়ার পরেও শোনা গেল না। হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে। ছোটা বন্ধ করে দিল।

'তার দেখে হেঁটো,' সাবধান করল ওমর। ওর চোখেই প্রথম পড়ল ওটা। ক্রল করে পার হয়ে এল নিচ দিয়ে। 'মইটা ঠেলে দাও। লাগিয়ে দিয়ো না কিন্তু।'

কিছুটা সময় পাওয়া গেছে। মই ছোট করে ফেলল কিশোর। তারের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল ওমরের কাছে। তারপর নিজেও ক্রল করে চলে এল অন্যপাশে।

এখনও দেখা নেই কোন মোষের। তারমানে পিছু নেয়নি। আসবে না আর।

সামনে খোলা মাঠ। আলো বাড়ায় ধূসর লাগছে। এঞ্জিনের শব্দে বোঝা যাচ্ছে আরও নিচে নেমে এসেছে কপ্টার, তবে গাছপালার জন্যে দেখা যাচ্ছে না এখনও।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বাড়ি যাব?'

'মাথা খারাপ! এ রকম একটা সুযোগ পাওয়ার পর? শেষ না দেখে যাচ্ছি না আমি। এখানেই থাকব।'

গাছের আড়ালে লুকিয়ে ল্যান্ডিং ফীল্ডের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। প্রাসাদের দিক থেকে আসছে সেই পুরানো ল্যান্ড-রোভারটা।

'প্রতিমুহূর্তেই মজা বাড়ছে,' ওমর বলল। 'এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। কপ্টারের শব্দ শুনেই স্টার্ট নিয়েছে গাড়ি। দেখা করতে আসছে কেউ পাইলটের সঙ্গে। কি মনে হয়? কোন্‌খান থেকে এল কপ্টারটা?'

'ওদিকে তো পীজমো বীচ।'

'তাহলে ওখান থেকেই আসছে।'

'এখানেই নামবে ওটা, কোন সন্দেহ নেই। দামী জিনিস নিয়ে আসেনি তো?'

'নামলেই বোঝা যাবে।'

ঘরের চতুর্থ প্রান্তটার কাছে এসে থামল ল্যান্ড-রোভার, ওই ধারটায় একবারও যায়নি ওরা। একটা মোষকে বেরোতে দেখা গেল। সেই মদ্দাটা, কিশোরের পিছে লেগেছিল যেটা, গাড়ির শব্দে কিংবা তাড়া খেয়ে আগের জায়গা থেকে সরে এসেছে। চলে গেল খোলা মাঠের দিকে। মানুষের গলা শুনে বোঝা গেল গাড়িতে দুজন লোক আছে। বড় দরজাটা খোলার ঘড়ঘড় আওয়াজ হলো। নামার সময় গাছপালার ফাঁক দিয়ে পলকের জন্যে হেলিকপ্টারটা নজরে এল ওমরের। তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের আড়ালে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

'যাক, শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হলো না,' ওমর বলল। 'ঘরেই ঢোকাল কপ্টারটাকে। ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

ছাউনির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।

প্রাসাদের দিকে ফিরে চলল ল্যান্ড-রোভারটা।

'পাইলটকে তুলে নিতে এসেছিল গাড়িটা,' বলল ওমর। 'মোষের ভয় সবার জন্যেই।'

'হ্যারি আর ডুগান বাদে।'

'আমার তা মনে হয় না। তাহলে রাইফেল রাখে কেন সঙ্গে?'

'এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে। মোষের আক্রমণও ঠেকানো যাবে, বাইরে থেকে কেউ চুরি করে ঢুকতে গেলে সেই লোক রাইফেল দেখে ভয় পাবে, ঢোকার আগে দশবার চিন্তা করবে।'

আলো আরও বেড়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। থেকেও লাভ নেই আর। গাছের আড়ালে আড়ালে দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলল দুজনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেয়াল টপকে নেমে এল অন্যপাশে। দ্রুত চোখ বোলাল পথের এদিক ওদিক। কাউকে দেখা গেল না। গাড়িটা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে নেমেছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে মুসা আর রবিন। ওরা কাছে যেতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল মুসা, 'ওমরভাই, আপনি বলেছিলেন বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগবে না?'

'আমি কি করব? কিশোরকে পছন্দ হয়ে গেল একটা মোষের। ওর ওপর শিঙের ধার পরখ করতে এসেছিল। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না কিশোর। নিরাশ করল বেচারাকে।'

'ছাউনিটা কি সত্যি কপ্টারের ঘর?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ।'

আট

বাড়ি ফিরে আগে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল সবাই। তারপর অফিসে গিয়ে আলোচনায় বসল। এরপর কি করা উচিত সেটা নিয়ে প্রত্যেকেরই কোন না কোন পরামর্শ আছে, কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হলো না কিশোরের। যেমন মুসা বলল, 'আমরা তো এখন জেনেই গেলাম জেনারেল ডুগান কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। পুলিশকে বলে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ফেললেই হয়।'

কিশোরের জবাব, 'ডুগান সাধারণ চোরছ্যাঁচড় নয়। হাতকড়া পরাতে হলে তার বিরুদ্ধে জোরাল প্রমাণ দরকার। নইলে শেষে বিপদে পড়তে হবে আমাদেরই।'

রবিন বলল, 'ওদের পাইলটস লাইসেন্স আছে কিনা খোঁজ নেয়া যেতে পারে। যদি না থাকে, হেলিকপ্টার ওড়ানোর অপরাধে কেস ঠুকে দেয়া যায়।'

'তাতেই বা কি হবে? বড়জোর কিছু টাকা জরিমানা দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে চলে আসবে আদালত থেকে। তা-ও দেয়া লাগবে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে হেলিকপ্টার থাকতেই পারে, সেটা দোষের কিছু নয়। সেটা যে হ্যারিই চালায়, প্রমাণ করবে কে? সেজন্যে ওড়ানোর সময় হাতেনাতে ধরতে হবে। আজ ভোরবেলা কপ্টারটাকে কে উড়িয়ে নিয়ে এল, দেখিনি আমরা। হ্যারি না হয়ে পাইলট অন্য কেউও হতে পারে। তার হয়তো লাইসেন্সও আছে। দেখিয়ে দেবে। হেনস্থা করার জন্যে তখন উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই কেস ঠুকে দিতে পারে ডুগান।'

'তাহলে ধরা যায় কি করে ব্যাটাদের? এক কাজ করতে পারি, পার্কের ওপরে প্লেন নিয়ে চক্কর দিয়ে দেখতে পারি হেলিকপ্টারটা নিয়ে বেরোয় কিনা।'

'এটা কোন বুদ্ধিই হলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বাড়ির ওপর প্লেন নিয়ে চক্কর দেবে আর সেটা ওবাড়ির মানুষের চোখে পড়বে না, এ হতেই পারে না। সন্দেহ করবেই। দেখা যাবে তখন আর ছাউনি থেকে বেরই করল না কপ্টারটা।'

'তাহলে বরং,' মুসা বলল, 'পার্কে ঢুকে জঙ্গলে লুকিয়ে বসে থাকি। দেখব কে কপ্টার নিয়ে বেরোয়।'

'তাতেও কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কতদিন বসে থাকবে? কপ্টারটা কবে বের করবে কে জানে? আজ করতে পারে, দুদিন পর করতে পারে, আবার এমনও হতে পারে মাসখানেক বেরই করল না। খুবই অনিশ্চিত। তার ওপর রয়েছে মোষের নাক। দেখা যাবে, গন্ধ পেয়ে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলেছে আমাদের। জঙ্গলে মোষ ছাড়া আর কোন্ জানোয়ার ছেড়ে দিয়ে রেখেছে ডুগান, তা-ও জানি না। বাঘও থাকতে পারে, কে জানে!'

'খালি তো ছিদ্র বের করছ!' রেগে গেল মুসা। 'নিজেই বলে ফেলো না তাহলে কি করা উচিত?'

ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছাতের দিকে মুখ তুলে একের পর এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করে চলেছে সে। 'ওমরভাই, আপনি কি বলেন?'

আস্তে করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওমর। 'তোমার যুক্তিগুলো ঠিকই আছে। আমি বরং ডুগানের দাওয়াতটা নিয়ে ফেলি। দিনের আলোয় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, কথা বলে দেখে আসতে পারি কোন সূত্র বের করা যায় কিনা।'

'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি,' একমত হয়ে বলল কিশোর। 'আপনি রবিনকে নিয়ে চলে যান।'

'আমি কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'মুসা তো যেতেই পারবে না, তাকে চিনে ফেলবে হ্যারি। আমারও যাওয়া ঠিক হবে না। এ ধরনের বড় ক্রিমিনালদের নজর খুব কড়া থাকে, সন্দেহ বেশি। আমি ছদ্মবেশে ছিলাম ঠিক, কিন্তু চেহারার মিল ধরে ফেলতে পারে। বুঝে ফেলবে পুরুষমানুষ মেয়ে সেজেছিলাম। ওইসব রিস্কের মধ্যে যাওয়াই উচিত হবে না।'

সুতরাং সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওমর।

কিশোর আর মুসা অফিস পাহারা দিতে লাগল। চুপচাপ বসে না থেকে ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করে তদন্তের অগ্রগতি কতখানি কি হয়েছে, বিস্তারিত জানাল কিশোর। ক্যাপ্টেনও একমত হলেন, আরও জোরাল প্রমাণ পাওয়া না গেলে সরাসরি গিয়ে হানা দিতে পারবেন না ডুগানের বাড়িতে। নতুন আর কোন ডাকাতি হয়েছে কিনা, খোঁজ নিল কিশোর। অনুরোধ করল, কোথাও ডাকাতি কিংবা ছিনতাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন খবরটা ওদের জানানো হয়।

ওদিকে ডুগান পার্কের সামনের গেটে যখন পৌঁছল ওমরের গাড়ি, বিকেল চারটে বেজে গেছে। গেটে ঝোলানো নোটিশটার দিকে আঙুল তুলল রবিন, 'ওই দেখুন, আজ বিশেষ কারণে সাড়ে চারটায়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পার্ক।'

'তারমানে মাত্র কয়েক মিনিট দেখার সময় পাব,' ওমর বলল। 'দেরিই করে ফেললাম। আরও আগে আসা উচিত ছিল।'

গেট পাহারা দিচ্ছে জুলু যোদ্ধা। ও যে আসলে জুলু নয়, জুলু সেজেছে, সেটা বুঝতে দুবার তাকানো লাগে না। গেটের পাশে তিনটে গাড়ি পার্ক করা। দর্শকদের। ওগুলোর পাশে নিজের গাড়িটা রাখল ওমর। নেমে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

আসেগাই হাতে এগিয়ে এল নকল জুলু। নোটিশটা দেখিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'জেনারেল ডুগানের দাওয়াত পেয়ে ব্যক্তিগত কাজে যদি এসে থাকি, তাহলেও থাকতে পারব না?'

'সেটা, স্যার, জেনারেলের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। নামটা, স্যার, প্লীজ?'

'ওমর শরীফ। গাড়ি নিয়ে ঢুকব?'

'না, স্যার। দর্শকদের প্রাইভেট কার পার্কে ঢোকানো নিষিদ্ধ। অসুবিধে নেই। আপনাকে নিতে গাড়ি আসবে।'

গেটের পাশের একটা ঘরে ফোন করতে চলে গেছে প্রহরী।

ওমরের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'কি মনে হলো? লোকটা জুলু?'

'জুলু না কচু! আস্ত ভাঁওতাবাজি! আফ্রিকান সেজেছে। আফ্রিকান পার্কের নকল বানিয়েছে। এ সব দেখিয়ে বাচ্চাদেরই শুধু মজা দিতে পারে।'

ফিরে এল প্রহরী। 'গাড়ি আসছে, স্যার।' গেট খুলে দিল।

দুটো টিকেট কাটল ওমর। মিনিটখানেকও অপেক্ষা করা লাগল না। গাড়ি আসতে দেখল। সেই ল্যান্ড-রোভারটা। ড্রাইভ করছে স্বয়ং ডুগান। আজ তার পাশে হ্যারি নেই।

হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে এল ডুগান। 'আরি, আপনি! নাম শুনে বুঝতে পারিনি। সেদিন আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'শেরি খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন, মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। আসুন আসুন।' রবিনের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল, 'এসো। গাড়িতে ওঠো।'

'ওর নাম রবিন মিলফোর্ড। আমার বন্ধু।'

'ও তাই নাকি? পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। এসো। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওমর জিজ্ঞেস করল, 'পার্কটা চালানো নিশ্চয় আপনার হবি?'

'নাহ্,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডুগান বলল, 'আজকাল কি আর কোন শখ করার উপায় আছে নাকি মানুষের? ট্যাক্সের যা বোঝা, ঘরবাড়ি দখলে রাখাই হয়ে গেছে মুশকিল। এতবড় একটা জায়গার খালি খালি ট্যাক্স দেব? ভাবতে গিয়ে মাথায় এল বুদ্ধিটা। মনে হলো, জঙ্গল আছে, প্রচুর ঘাস আছে, ছোটখাট একটা নকল ন্যাশনাল পার্কই বানিয়ে ফেলি না কেন? খরচটা তো উঠে আসবে। একজন গার্ড আর একজন টিকেট সেলার রেখে চালু করে দিলাম। কোন কাজকর্ম নেই, বসে থেকে সময় কাটে না, তাই গাইড-কাম-হোয়াইট হান্টারের দায়িত্বটা আমি নিজেই নিয়ে নিলাম। ল্যান্ড-রোভারে করে দর্শকদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেশ আনন্দ পাই।'

'গেটে নোটিশ দেখলাম সাড়ে চারটেয় বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন?'

'সব সময় না। বিশেষ কিছু দিনে। যেদিন আমার জরুরী অন্য কাজ থাকে। দুটো কাজ তো আর একসঙ্গে একা সামলানো সম্ভব নয়।'

'আজ কি তাহলে কিছু বিশেষ দিনের একটা?'

'হ্যাঁ। হ্যারি থাকলেও পার্কটা আরও কিছুক্ষণ খোলা রাখতে পারতাম।

আজ ও নেই। কাজে গেছে।'

বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে গেল গাড়ি। প্রায় দুশো বছর আগের স্টাইলে বানানো পুরানো প্রাসাদ।

গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল ডুগান। 'আসুন। ভেতরের দর্শকদের দলে যাওয়া লাগবে না। ওরা আর থাকবেও না বেশিক্ষণ।'

পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে চলল জেনারেল। সুন্দর আসবাবে সাজানো একটা হল পার করে, করিডর দিয়ে নিয়ে এল বড় বড় ফ্রেঞ্চ উইনডো লাগানো একটা ঘরে। একদিকের বড় দরজা দিয়ে ছোট একটা চত্বরে বেরোনো যায়। এখান থেকে পার্কের বেশির ভাগটাই চোখে পড়ে। পাথরে বাঁধাই ছোট চত্বর, সাদা চুনকাম করা তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ছোট ছোট টবে রাখা কয়েকটা ফুলগাছ। বসে চা খাওয়ার জন্যে চেয়ার-টেবিল আছে।

'বসে পড়ুন। আমি শেরি নিয়ে আসছি। দেরি হবে না।' চেয়ার দেখিয়ে রবিনকেও বসতে বলল ডুগান। 'তুমি তো শেরি খাবে না?'

মাথা নাড়ল রবিন।

'তাড়াহুড়া থাকলে আজ থাক,' ওমর বলল। 'আরেকদিন নাহয় আসা যাবে।'

'আরে না না, বসুন। একদিন কেন, যতদিন খুশি আসবেন। আজ যখন চলেই এসেছেন, বসে যান।'

রূপার ট্রেতে করে শেরির বোতল আর গ্লাস নিয়ে এল ডুগান। রবিনের জন্যে একটা সফট ড্রিংকস। দুটো গ্লাসে শেরি ঢেলে নিয়ে একটা দিল ওমরকে, আরেকটা নিজে। গ্লাস তুলে বলল, 'গুড হেল্‌থ্।...তা জায়গাটা কেমন লাগছে আপনাদের?'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ওমর জবাব দিল, 'ভাল। খুব সুন্দর।'

'এই সুন্দরটা টিকিয়ে রাখতে যে কি কষ্ট করতে হচ্ছে আমার বলে বোঝাতে পারব না। বাপ-দাদাদের আমলে তারা এত কষ্ট করেনি। আমার বাবা যখন মারা গেল, জায়গাটার মালিক হলাম আমি, বকেয়া ট্যাক্সের বহর দেখে তো মনে হলো ফেলে দিয়ে পালাই। যাক নষ্ট হয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে মনকে বোঝালাম, এতবড় একটা জায়গা এ ভাবে নষ্ট হবে? তারচেয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেখি না কেন? হাজার হোক বাপের ভিটা। শেষ বয়েসে আবার কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব? পরীক্ষামূলকভাবে কিছু জানোয়ার এনে দিলাম ছেড়ে। দেখি, ব্যবসা মন্দ না, লোকে আসে দেখার জন্যে। শেষে পুরোদস্তুর পার্কই বানিয়ে ফেললাম। আরও জানোয়ার আনাচ্ছি আফ্রিকা থেকে। আস্তে আস্তে ভরে ফেলব। যত জাতের জানোয়ার আনা সম্ভব, নিয়ে আসব।' হাসল ডুগান।

প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রবিন, কোনভাবেই জেনারেলের হাসি মোছে না, মুখে লেগেই থাকে।

'ভাল বুদ্ধি,' ওমর বলল। 'একদম নতুন আইডিয়া।'

'একদম নতুন বলা যাবে না। প্রাইভেট পার্ক আরও আছে। আর পুরানো

আমলে তো এ রকম ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা বহু রাজাবাদশা আর জমিদারদের ছিল। যদিও পাবলিককে দেখতে দেয়া হত না সেগুলো।'

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রবিনের দিকে তাকাল ডুগান, 'কি বিরক্ত লাগছে? ভাল কথা, তোমাকে আগেও মনে হয় কোথায় দেখেছি?'

'ওই তো সেদিন, প্লেনে, আমিও ছিলাম।'

'প্লেনে যে দেখেছি সে তো মনেই আছে। তারও আগে কোথাও?'

'কি জানি!'

'আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব ভাল। কারও চেহারা একবার দেখলে আর ভুলি না। যাকগে, ভাবলেই বেরিয়ে পড়বে কোথায় দেখেছি।' টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে ওমরের জুতোর ওপর চোখ পড়ল ডুগানের। 'বাহ্, ভারি সুন্দর তো? কোত্থেকে কিনলেন?'

'রকি বীচের একটা দোকান থেকে।'

'বেশি দামী?'

'না না, একেবারেই সস্তা।'

'চামড়ার সোল নাকি?'

'না, রবারের। তলার খাঁজগুলো খুব বড় আর গভীর, যত পিচ্ছিল মাটিই হোক, কামড়ে থাকে। আছাড় খাওয়ার ভয় নেই। এ জন্যেই কিনলাম।' পা ঘুরিয়ে জুতোর তলাটা দেখিয়ে দিল ওমর।

কাত হয়ে ভালমত দেখে মাথা ঝাঁকাল ডুগান, 'হ্যাঁ, ভাল।' ভুরু নাচাল বোতলের দিকে ইঙ্গিত করে, 'দেব আরেক গ্লাস?'

'না না, অনেক ধন্যবাদ।' ঘড়ি দেখল ওমর। 'আজ আলাপ করে গেলাম। আরেকদিন এসে আপনার পার্ক দেখব। সময়ও শেষ। আপনার কাজের ক্ষতি করাটা ঠিক হবে না।'

'যখন খুশি চলে আসবেন। আপনারা আমার স্পেশাল গেস্ট।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডুগান। 'হ্যারিটা তো এল না। চলুন, গেটে দিয়ে আসি আপনাদের।'

প্রাসাদ থেকে বেরোনোর পথে কাউকে দেখা গেল না। সাড়ে চারটার বেশি বাজে। দর্শকরা সব চলে গেছে এতক্ষণে।

নয়

'গাধা মনে হচ্ছে আমার নিজেকে!' রবিন বলল। 'এত ভাল ব্যবহার, এত খাতির-যত্ন, ভদ্রলোকের ওপর যে গুপ্তচরগিরি করছি আমরা এটা ভাবতেই এখন লজ্জা লাগছে।'

'ঠিকই, গাধাই,' গাড়ি চালাতে চালাতে তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল ওমর। রাস্তার ওপর চোখ।

'মানে?' ওমরের কথার টেরা ভঙ্গিটা ধরতে পারল রবিন। 'এখনও সন্দেহ করেন ডুগানকে?'

'না করার কোন কারণ ঘটেছে? আমরা তার ওপর চোখ রাখছি বলে তোমার লজ্জা লাগছে, কিন্তু আমার তো বিশ্বাস সে-ই আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে। কাছে থেকে ভালমত দেখার জন্যে অত খাতির করে আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেছে। আর গাধার দলের গাধার মত আমরা গিয়ে তার ফাঁদে পা দিয়েছি।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না!'

রাস্তার কিনারে নিয়ে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল ওমর। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। 'আমাদের ওই মহামান্য ভূতপূর্ব জেনারেলটি এখনও আমাদের আসল পরিচয় জানেন না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যে বুঝে ফেলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্যে আমি নিজেই দায়ী। ফিরে গিয়ে আগে আমার মাথাটা পরীক্ষা করানো দরকার।'

'কি করে জানল?'

'ও এখন জেনে গেছে ভোরবেলা কপ্টারের ছাউনির কাছে কে গিয়েছিল। এটাও নিশ্চয় অনুমান করে ফেলেছে সেদিন আমরা ইচ্ছে করে পার্কে নেমেছিলাম, ক্র্যাশ ল্যান্ড কিংবা কোনরকম দুর্ঘটনা ছিল না ওটা।'

'কি করে বুঝল আপনি গিয়েছিলেন?'

'এত আগ্রহ নিয়ে আমার জুতো দেখল কেন, কি মনে হয় তোমার? আর আমি গাধাও কোন ভাবনাচিন্তা না করে একেবারে সোলসহ দেখিয়ে দিয়েছি। পরে যখন ভাবলাম, ওর মত একজন মানুষ অতি সাধারণ একজোড়া জুতোর প্রতি এত আগ্রহ দেখাল কেন, স্পষ্ট হয়ে গেল সব। আমার জুতোর সোল দেখে শিওর হতে চেয়েছে সে।'

'কি শিওর হবে?'

'মাথাটা কি তোমারও আমার মত গুবলেট হয়ে গেছে নাকি? কেন সোল দেখতে চেয়েছে এখনও বুঝতে পারছ না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন।

'শোনো, ছাউনির আশেপাশের মাটি ভিজে গিয়ে নরম হয়ে ছিল বোধহয়, কাদা ছিল, অন্ধকারে খেয়াল করিনি, তাতে পা দিয়ে ফেলেছি। মাটিতে বসে গেছে জুতোর ছাপ। সেটা লক্ষ করেছেন তোমার মহামান্য জেনারেল। এখন তিনি জেনে গেছেন চুরি করে ওখানে কে হাজিরা দিয়েছিল। সুতরাং তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে চোরের খাতা থেকে তার নাম কেটে দেয়ার কোন মানে নেই। ভয়ঙ্কর লোক ও। আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল আমাদের। ওর মত একজন শত্রুকে এ ভাবে ছোট করে দেখা মোটেও উচিত হয়নি আমাদের। এর জন্যে পস্তাতে হতে পারে। কেন মাথা পরীক্ষা করাতে চাই বুঝতে পারছ?'

গাড়ি আবার রাস্তায় তুলে আনল ওমর।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে রবিন বলল, 'আমি তো চমকেই গিয়েছিলাম যখন বলল আমাকে কোথাও দেখেছে।'

'কোথায় দেখেছে সেটাও বুঝে গেছি আমি। নীলাম হাউসে। চীনামাটির

পাত্রটা কেনার দিন। বলল না, একবার যে চেহারা দেখে সে, জীবনে ভোলে না? ঠিকই বলেছে। অপরাধ এমন একটা জিনিস, করতে করতে শেয়ালের মত ধূর্ত হয়ে যায় এক সময়কার বোকারাও, মাথার পেছনেও অদৃশ্য চোখ গজিয়ে যায়, আর জেনারেল তো এমনিতেই বুদ্ধিমান। আমাদের পরিচয় বের করতে তার মোটেও সময় লাগবে না। তারপর কি করবে জানি না। পাতলা বরফের ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা।' অসমতল কাঁচা রাস্তার একটা ছোট ঢিবি এড়ানোর জন্যে বাঁয়ে কাটল ওমর। গাড়ির নাক আবার সোজা করে বলল, 'জেনারেল ডুগান কোনখান থেকে বিপুল টাকার জোগান পাচ্ছে। পার্কের লোক দেখানো ব্যবসা থেকে এত টাকা আসার প্রশ্নই ওঠে না। আজ দিন ভাল, বিকেলের দিকেই সাধারণত বেড়াতে বেরোয় লোকে, পার্কে ভিড় বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু কটা গাড়ি দেখলাম? মাত্র তিনটে। এককেটাতে যদি দুজন করেও দর্শক এসে থাকে, তাহলে হয় ছয়জন, টিকেটের দাম তিরিশ ডলার। এই হিসেবে মাসে কত আসে দেখো। এ টাকায় এত বড় বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব? হাস্যকর লাগছে না?'

'খটকাটা অবশ্য আমারও লেগেছে। ঘরগুলোতে যে পরিমাণ আসবাব আর সৌখিন জিনিসপত্র, যে ভাবে সাজানো, কোটি কোটি টাকার মালিক হলেই কেবল সম্ভব।'

'হ্যাঁ। আরও একটা সন্দেহজনক জিনিস দেখেছি ওর বাড়ির ছাতে, এয়ারিয়াল। টিভি অ্যান্টেনা নয় ওটা। দামী কোন রেডিওর, কপ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। সাধারণ একজন নাগরিকই যদি হবে, যে ট্যাক্সের বোঝা সামাল দেয়ার জন্যে নিজের বসত বাড়িকে পার্ক বানাতে বাধ্য হয়েছে, তার বাড়িতে এত আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কেন? কি দরকার? আর ওগুলোর খরচই বা জোগাড় করে কোত্থেকে? এতে করে কি একটা কথাই প্রমাণিত হয় না, বড় ধরনের কোন অপরাধ করে চলেছে সে, আর সেসব চালানোর জন্যেই এত সব অত্যাধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা?'

একমত না হয়ে পারল না রবিন।

'অতএব,' বলতে লাগল ওমর, 'আমাদের মত অপরিচিতজনকে খাতির-যত্ন করাটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। আমরা স্পাই কিংবা ডিটেকটিভ গোছের কিছু, এটা বুঝে ফেলেছে সে। সতর্ক হয়ে গেছে। হ্যারিও আজ বাড়িতে নেই। তাড়াতাড়ি পার্ক বন্ধ করে দেয়ার পেছনে নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে।'

'কি কুমতলব?'

'জানি না। ডাকাতিও হতে পারে। ডাকাতি করে এনে মাল লুকাতে গেলে দর্শকদের চোখে পড়বে হেলিকপ্টার, তাই আগেভাগেই বন্ধ ঘোষণা দিয়ে বের করে দিয়েছে সবাইকে।'

ওমরের অনুমানই যে ঠিক, রকি বীচে ফিরে অফিসে ঢুকতেই সেটা বোঝা গেল। মুসা আর কিশোর নেই। একটা নোট লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে গেছে কিশোর। তাতে লেখা:

'ওমরভাই, ইয়ান ফ্লেচার ফোন করেছিলেন। কয়েক মিনিট আগে পিজমো বীচ থেকে স্যান ফ্র্যান্সিসকো যাওয়ার সড়কে একটা সিকিউরিটি ভ্যান হাইজ্যাক হয়েছে। তাতে নগদ পঞ্চাশ লাখ ডলার ছিল। সমস্ত টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে ডাকাতেরা। কোথায় কিভাবে গায়েব হয়েছে ওরা, পুলিশ বুঝতে পারছে না। আমার সন্দেহ, এক্ষেত্রেও কপ্টার ব্যবহার করছে ডাকাতরা। এখন পাঁচটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। আমি আর মুসা প্লেন নিয়ে ডুগানের পার্কে নজর রাখতে যাচ্ছি।—কিশোর।'

পড়তে পড়তে নাকমুখ কুঁচকে ফেলল ওমর। নোটটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড়ো!'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের, 'আপনার অনুমানই তো দেখি ঠিক!'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'আমাদের যখন শেরি খাইয়ে খোশগল্পে মশগুল ছিলেন মহামান্য লর্ড, ডাকাতের দোসর হ্যারি তখন গিয়ে লুটপাটে ব্যস্ত হয়েছে।'

'কপ্টারটা তো বের করতে দেখলাম না?'

'হয়তো ডাকাতির সময় প্রয়োজন পড়েনি। পরে বের করেছে, আমরা চলে আসার পর।'

'চালাবে কে?'

'হ্যারি হতে পারে। সাঙ্গপাঙ্গরা ডাকাতি করে টাকাগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে গিয়ে তুলে আনবে সে। বাড়িতেই হয়তো ছিল ও, আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে ডুগান। শেরি আনতে যাওয়ার ছুতোয় গিয়ে ওকে মানা করে এসেছে আমরা থাকতে কিছুতেই যেন সামনে না আসে। আমরা চলে আসার পর হেলিকপ্টার বের করেছে হ্যারি।'

'এখন তাহলে কি করব?'

'কিশোরদের ফিরে আসার অপেক্ষা ছাড়া আর তো কিছু করার দেখি না। এক কাপ চা অবশ্য খেতে পারি।' স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল ওমর।

সময় কাটতে লাগল খুব ধীরে। ছ'টা বাজল···সাতটা···আটটা··· কিশোরদের দেখা নেই। চিন্তিত হয়ে পড়ল দুজনেই। ওমর বলল, 'এতক্ষণ কি করছে ওরা? এত সময় আকাশে থাকার কথা নয়। নিশ্চয় মাটিতে নেমেছে। একটা ফোনটোন তো করতে পারে কোনখান থেকে?'

'জোর করে নামায়নি তো?' রবিনের কণ্ঠে শঙ্কার ছোঁয়া।

জবাব দিতে পারল না ওমর। আশঙ্কাটা সংক্রামিত হলো তার মাঝেও।

দশ

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে কিশোর আর মুসা, এই সময় যেন বাঁচিয়ে দিল ইয়ান ফ্লেচারের ফোন। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। রিসিভার রেখে মুসাকে খবরটা জানিয়ে প্যাড টেনে নিল। দ্রুতহাতে মেসেজ লিখল ওমর আর রবিনের জন্যে। তারপর উঠে দাঁড়াল,

'চলো।'

'কোথায়?'

'ডুগানের পার্কে।'

ছাউনি থেকে নিজেদের মেরামত করা পুরানো আমলের অস্টার প্লেনটা বের করল মুসা। কিশোর তার পাশে উঠে বসতেই রানওয়ে ধরে ছুটল। নিখুঁতভাবে ছোট বিমানটাকে আকাশে তুলে ফেলল সে। আধ চক্কর দিয়ে নাক ঘুরিয়ে উড়ে চলল ডুগানের বাড়ির দিকে।

সুন্দর দিন। পরিষ্কার নীল আকাশে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ। দৃষ্টি চলে অনেক দূর। ডুগানের বাড়ির ওপর এক চক্কর দিয়ে মুসাকে পিজমো বীচের দিকে নিয়ে যেতে বলল কিশোর। অনেকগুলো 'যদি' আর 'হয়তো' এসে ভিড় জমাচ্ছে মনে। বেরোনোর সময় উত্তেজনার বশে হুড়মুড় করে বেরিয়ে চলে এসেছে বটে, কিন্তু এ ভাবে আন্দাজের ওপর 'কপ্টারকে খুঁজে বের করা এখন প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে তার কাছে।

ডুগানের বাড়ি পেরিয়ে এসে কোস্ট হাইওয়ের ওপরে সাগরের কিনার ধরে উড়ে চলল ওরা। গ্যাভিয়োটা ছাড়াল। পিজমো বীচ ছাড়িয়ে এসে আরও কিছুদূর এগোতেই সামনের আকাশে কালো একটা বিন্দু চোখে পড়ল।

মুসা বলল, 'মনে হয় হেলিকপ্টার!'

প্লেনে দূরবীন আছে। সেটা বের করে চোখে তুলল কিশোর। একবার দেখেই মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। স্পীড বাড়াও।'

হেলিকপ্টারের গতি কম। পুরানো অস্টারের সঙ্গেও কুলাতে পারল না। তবে বেশি কাছে গেল না ওরা। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলল।

দূরবীন দিয়ে দেখে কিশোর বলল, 'মনে হয় ডুগানেরটাই।'

'কপালের জোর আমাদের।'

'সময়মত আসতে পারার জন্যে পেয়েছি। ক্যাপ্টেন ফোন করতে দেরি করলে, সময়ের সামান্যতম হেরফের হলেই আর পেতাম না।'

'কি করব?'

'পিছে পিছে যাও। বেশি কাছে যেয়ো না। সন্দেহ করে বসবে।'

অনেক ওপর দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার। নামানোর কোন লক্ষণই নেই। উড়ে চলেছে উত্তরে, ডুগান পার্কের উল্টো দিকে, ক্রমেই সরে যাচ্ছে দূরে। তারমানে পার্কে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কোথায় যাচ্ছে? স্যান ফ্র্যান্সিসকো?

গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখা গেল। রাস্তার একধারে পাহাড় আর বনজঙ্গল। তার ওপাশে চষা মাঠ। হঠাৎ সেদিকে নাক ঘোরাল 'কপ্টার।

দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো-ছিটানো চাষীদের বাড়ি। রেললাইন, মহাসড়ক, কিছুই নেই ওদিকটায়। কিশোরদের সঙ্গে স্যান ফ্র্যান্সিসকোর ম্যাপ নেই। সুতরাং গ্রামের নামটা কি, জানা সম্ভব হলো না।

চাষীদের বাড়িঘর পেরিয়ে গেল 'কপ্টার। বেশ বড় আকারের দুর্গের মত একটা পুরানো পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। দুদিকে দুটো টাওয়ার উঠে গেছে।

অনেক পুরানো বড় বড় গাছে ঘিরে তো রেখেছেই, ডালপাতা দিয়ে ঢেকেও রেখেছে এমনভাবে, ওপর থেকেও সহজে চোখে পড়ে না বাড়িটা। কাছেই জঙ্গল। জঙ্গলের পাশে একটুকরো খোলা সবুজ, সমতল মাঠ। 'কপ্টারটা নামল সেখানে। তারপর ওটাকে নিয়ে যাওয়া হলো গাছপালার আড়ালে।

বড় একটা চক্কর দিয়ে ফিরে যেতে তৈরি হলো মুসা।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাড়ি ফিরছি। অযথা তেল খরচ করে লাভ কি? নেমেছে যখন, দেরি করবে নিশ্চয়।'

'কোথায় আছি বুঝতে পারছ কিছু?'

'স্যান ফ্র্যান্সিসকোর আশেপাশে কোন গ্রামে।'

'সে তো জানি। নাম?'

'কি করে বলব? আমি কি আর এসেছি নাকি এদিকে।'

'জানাটা উচিত মনে হচ্ছে না তোমার? ওমরভাই আর ইয়ান ফ্লেচারকে কোন জায়গার নাম বলব?'

'ওপর থেকে নাম জানব কি করে?'

'ঠিক। সেজন্যেই নামতে হবে।'

'কোথায় নামব?'

'কেন, ওই মাঠটায়? আমার তো মনে হচ্ছে সহজেই নামানো যাবে।'

তা ঠিক। জয়স্টিক চেপে ধরল মুসা। নিখুঁতভাবে নামিয়ে আনল সমতল মাঠে। ট্যাক্সিইং করে ছুটতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। আচমকা ঝাঁকি দিয়ে, যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল বিমান। নাকটা উবু হয়ে মাটি ছুঁলো। লেজ উঁচুতে।

সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে নাকমুখ থেঁতলে যেত দুজনেরই। কোনমতে বাঁচল। দুপাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল মাটিতে। বিমানের পেটের নিচে মোটা ইস্পাতের তারের জটলা দেখেই বুঝে গেল কিশোর, কি ঘটেছে। হাত তুলল, 'ওই দেখো!'

'মাঠের মধ্যে তার বিছিয়ে রেখেছে কেন এ ভাবে?'

'বিছিয়ে রাখেনি, পেতে রেখেছে—বিমান ধরা ফাঁদ। বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্র্যান্স সহ বহু দেশে এ ভাবে ফাঁদ পেতে রাখত মিত্রবাহিনী। শত্রুর গুপ্তচর বিমান নামলেই ধরা পড়ত ওই ফাঁদে।'

'কিন্তু এখানে ফাঁদ পাতল কে?'

'ওই যে,' বনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল কিশোর, 'কারা যেন আসছে।'

একটা জীপ বেরিয়ে এল। মাঠের মধ্যে ওদের কাছে এসে থামল। দুজন লোক লাফ দিয়ে নামল দুদিক থেকে। হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতে না কাটতেই আরও বড় ধাক্কা, তৃতীয় আরেকজন নামল গাড়ি থেকে। জেনারেল ডুগান যাকে ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল সেদিন, সেই হ্যারি। মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'তাহলে তোমরা?'

'আর কাকে আশা করেছিলেন?' নরম হলো না কিশোর।

'না, আর কাউকে না। জলজ্যান্ত একটা অস্টার প্লেনকে পিছু নিতে দেখেও বুঝতে পারব না কিছু আমাকে এত অন্ধ ভাবার কোন কারণ নেই।'

'আপনিই তাহলে 'কপ্টারটা চালাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'পিস্তল দেখানোর মানে কি?'

'সাবধানতা, অন্য কিছু না। আশা করি ব্যবহার করা লাগবে না।'

'মাঠে তারের ফাঁদ কি আপনিই পেতেছিলেন?'

'আমি পেতেছি বললে ভুল হবে, তবে আমার আদেশেই পাতা হয়েছে।'

'কেন?'

'নামার জায়গা দেখে যখন-তখন এসে বিরক্ত করবে প্রাইভেট প্লেনের মালিকরা, সেটা চাই না বলে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার দরকার কি? বাড়িতে চলো।'

এত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে লোকটা, কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না কিশোর। 'আজ থাক। আমরা বরং গাঁয়ে গিয়ে দেখি, প্লেনটাকে তোলার জন্যে সাহায্য করার মত কাউকে পাওয়া যায় কিনা।'

'কেন তোমাদের যেতে বলছি, না বোঝার মত বোকা তোমরা নও।' পিস্তল দুটো দেখিয়ে বলল হ্যারি, 'ইচ্ছে করে যেতে না চাইলে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

কিছু বলল না মুসা। চুপ করে রইল।

পিস্তলের মুখে ওদেরকে জীপে উঠতে বাধ্য করা হলো। জঙ্গলের দিকে রওনা দিল জীপ। গাছপালার ভেতর দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল 'কপ্টারটা, কয়েকটা গাছের জটলার নিচে দাঁড় করানো। বাড়ির মুখও এদিকে। ধূসর পাথরে তৈরি কয়েকশো বছরের পুরানো বাড়ি। পরিখায় ঘেরা। একটা ছোট ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয়।

জীপ থেকে নেমে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল হ্যারি, 'আমাদের পারিবারিক কুঠিতে স্বাগতম। পুরানো জায়গা, অনেকের পছন্দ না-ও হতে পারে। তবে আশা করি তোমাদের হবে। না হলেও অবশ্য করার কিছু নেই আমার। জোর করে মেহমান হওয়ার জন্যে তোমরাই দায়ী।'

এগারো

পাথরের উঁচু দেয়ালওয়ালা একটা হলঘরে ঢুকল ওরা। বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা, মাটির নিচে কফিনে ভরা লাশ রাখার ঘরের মত। জানালাগুলো ছোট ছোট, অনেক ওপরে, সামান্য যা আলো আসে তাতে ঘরের ভারী হয়ে চেপে থাকা বিষণ্ণতা কাটে না। আসবাবপত্র নেই তেমন। হাঁটতে গেলে পদশব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজে, দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে।

একধার থেকে একসারি ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সেটা দিয়ে নিয়ে

যাওয়া হলো মুসা আর কিশোরকে। উঠছে তো উঠছেই, থামাথামি আর নেই। চারতলা পর্যন্ত গুনল কিশোর। ঘটনাটা কি? ছাতে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি ওদের?

অবশেষে শেষ হলো ওঠা। ভারী ওক কাঠের একটা দরজার সামনে নিয়ে আসা হলো ওদের। লোহার বিরাট তালা ঝুলছে। হুকে ঝোলানো চাবি।

দরজা খুলে দিয়ে বন্দিদের ভেতরে ঢুকতে বলল হ্যারি। ছোট একটা ঘর। গোলাকার দেয়াল। কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না, দুটো টাওয়ারের কোন একটাতে রয়েছে এই ঘর। একটা কাঠের টেবিল আর দুটো চৌকি। ছোট একটা জানালা আছে, শিক লাগানো। পাল্লা নেই, সব সময়ই খোলা।

'দুঃখিত, এরচেয়ে ভাল জায়গা আর দিতে পারলাম না,' হ্যারি বলল, 'তবে মাটির নিচের ঘরের চেয়ে নিশ্চয় ভাল। ঘরটার কিছু ইতিহাস আছে। শুনতে ভাল লাগবে তোমাদের। আমার এক দাদা পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেজন্যে এখানে এনে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এখানে থাকতে হয়েছিল। গলায় আপেল কাটার ছুরি চালিয়ে মারা গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে একজন গোয়েন্দাকে ছোঁক ছোঁক করতে দেখে ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছিল এখানে। মাথা খারাপ হয়ে গেল লোকটার। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল পঞ্চাশ ফুট নিচের পরিখায়। ওটাতে পানির চেয়ে কাদা বেশি। এত নিচে দেবে গেল লোকটা, তার লাশটাও খুঁজে বের করতে পারিনি। এখনও রয়ে গেছে নিচে কোনখানে। লাফ দিয়ে না মরলেও বাঁচত না, গুলি করে মেরে ফেলা হত তাকে। কয়েক ঘণ্টা আগে গেল, এই যা। তারপর শিক লাগিয়েছি জানালায়, আর কোন বন্দি যাতে আমাদের মৃত্যুদণ্ডকে ফাঁকি দিতে না পারে।'

হ্যারির বলার ভঙ্গি আর শীতল কণ্ঠস্বর বুকে কাঁপুনি তুলে দেয়। কিশোর এবং মুসা দুজনেই বুঝল, এই লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। বাধা পেলে খুন করতেও পিছপা হবে না।

'আমাদের এ সব কথা শোনাচ্ছেন কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'যাতে ওই গোয়েন্দাটার মত বোকামি করে না বসো তোমরা।'

'আমাদের কতদিন আটকে রাখবেন?'

'সেটা আমার ভাই বলতে পারবে। তবে তোমাদের আচরণের ওপরও নির্ভর করে অনেক কিছু। আমাকে এখন যেতে হবে। পরে আসব। এখানে কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। খাবার পাবে। পালানোর চেষ্টা না করলে প্রহরীরা কিছু বলবে না। তবে সে-চেষ্টা না করলেই ভাল করবে। পিস্তল আছে ওদের কাছে। বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্যে কি করে বসবে কিছুই বলা যায় না।'

'আমাদের কাছে কি ধরনের আচরণ আশা করেন আপনারা?'

'ভাল, আর কি? সহযোগিতা।'

'কি সহযোগিতা?' যত নরম সুরে ভাল ভাল কথাই বলুক হ্যারি, কি

সাংঘাতিক বিপদে যে পড়েছে অনুমান করতে পারছে কিশোর। পরিষ্কার বলেই দিয়েছে লোকটা, কথা না শুনলে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। কিন্তু কথা শুনলেই কি বাঁচতে পারবে?

দরজার দুই পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুই পিস্তলধারী। সেদিকে একবার তাকিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ফিরল হ্যারি। 'এই প্রথমেই ধরো, তোমরা কে সেটা আমাকে বলে দেয়া। বের আমি এমনিতেও করে ফেলব, তবে তোমরা এখন বলে দিলে সময় বাঁচবে আমার। তোমরা কে জানতে পারলে আমার পিছু নিয়ে কেন এসেছ সেটা বুঝতে পারব।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চোয়াল শক্ত করে রেখেছে সহকারী গোয়েন্দা। হ্যারির দিকে ফিরল আবার সে। 'আপনি বরং আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। তাহলে আমি জবাব দেব। হেলিকপ্টারে করে কি নিয়ে এসেছেন?'

'টাকা।'

'কেন?'

'বোকার মত প্রশ্ন। টাকা মানুষের কোন্ কাজে না লাগে?'

'নিশ্চয় ছিনতাই করা?'

জবাবে মুচকি হাসল হ্যারি।

'কি কাজ করবেন এত টাকা দিয়ে? সোনা যা লুট করেছেন, ওটা দিয়েই তো কয়েক পুরুষ রাজার হালে বসে খাওয়া যাবে।'

'সোনা বাজারে ছাড়ার অনেক অসুবিধে আছে। আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। কিন্তু নগদ টাকার সে অসুবিধে নেই। যখন ইচ্ছে খরচ করা যায়। আপাতত এই বাড়িটা মেরামত করব। ধসে পড়া থেকে বাঁচাব। আমাদের অনেক পুরানো বাড়ি এটা, পূর্বপুরুষদের স্মৃতি রক্ষা করব। তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে। এবার বলো, তোমরা কে?'

'আপনি কি সত্যি জানেন না?'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'আমরা গোয়েন্দা। শখের।'

'মিথ্যে বলোনি। এ রকম কিছুই হবে তোমরা, আমিও অনুমান করেছি। এখন বলবে কি, কিভাবে গন্ধ শুঁকে বের করলে আমাদের? কোন্ জায়গাটায় ভুল করেছি আমরা জানতে ইচ্ছে করছে। ভবিষ্যতে শুধরে নিতে পারব।'

'চোর-ডাকাত ধরার নিজস্ব কায়দা আছে আমাদের।'

'কি বললে! আমি চোর?' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে হ্যারির।

'অন্যের জিনিস না বলে নিলেই তো চুরি হয়। বেশি পরিমাণে নিলে ডাকাত বলা যেতে পারে।'

ঝিক করে জ্বলে উঠল হ্যারির চোখের তারা, 'নিজেদের খুব চালাক ভাব, তাই না? ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যে দেশের মানুষগুলোকে মেরে ফেলছে সরকার, সেটা দেখো না! শুধু শুধু কি আর ডাকাতি করছি নাকি আমরা? নিজের চামড়া আর বাড়ি বাঁচানোর অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে।

আমরা সেটাই করছি, আমি আর আমার ভাই উইলার্ড ডুগান।'

'অধিকার রক্ষার আরও অনেক সৎ উপায় আছে। সেজন্যে চুরি করতে হবে নাকি?'

গটমট করে বেরিয়ে গেল হ্যারি। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'দিলে তো রাগিয়ে। এখন কি করে বসে কে জানে। চোর-ডাকাতকে রাগিয়ে লাভ আছে?'

'ওরা শুধু চোর নয়, ওরা খুনীও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'না রাগালেও আমাদের ছেড়ে দিত না। বরং মুখের ওপর কথাটা বলে দিতে পারায় শান্তি।' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। শিকের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। দিগন্তে ঢেউ খেলে পাহাড়ের কোলে নেমে গেছে সবুজ ঘাসের মাঠ আর চষা খেত। কোথাও কোথাও জঙ্গল। সুন্দর জায়গা। ওদের ঠিক নিচেই যেন বিকট হাঁ করে রয়েছে পরিখার কালো কাদা। ওখানেই কোথাও রয়েছে বেচারা গোয়েন্দার মৃতদেহ, ভাবতে গা ছমছম করে উঠল ওর। ফিরে তাকাল। 'কি করা যায় বলো তো?'

'সত্যি কথাটা বলব? কিছুই করার নেই আমাদের।'

'কিন্তু কিছু একটা করা দরকার।'

'করার না থাকলে কি করবে? তোমার কি ধারণা রাগ পড়ে গেলে নরম হয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে ফিরে আসবে হ্যারি?'

'তার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি ভাবছি কতদিন আটকে রাখবে আমাদের? পচে গলে গন্ধ ছড়ানো পর্যন্ত?'

'থাক আর ভয় দেখিয়ো না। একটা কথা ভুলে গেছ?'

'কি?'

'কি জন্যে আমাদের এই বিপদ মনে নেই?'

'কি জন্যে?'

'গাঁয়ের নামটা জানার জন্যে। আমি তো ফিরেই যেতে চেয়েছিলাম। তুমি নামতে বললে।'

'না নেমে জানার আর কোন উপায় ছিল কি?'

'সেজন্যেই তো মরতে বসেছি এখন।'

'গোয়েন্দাগিরি করাটাই ঝুঁকির। অত ভাবলে চলে না।'

'ইস্, ওমর ভাইকে যদি একটা মেসেজ দিতে পারতাম!'

'মেসেজ না পেলেও আমাদের ফিরে যেতে না দেখলে কিছু একটা করবেই।'

'কি আর করবে? বড় জোর ডুগান এস্টেটে গিয়ে খুঁজবে আমাদের।'

'সেখানে যখন পাবে না, তখন অন্য উপায় বের করবে।'

'কি?'

'জানি না। নিজেরা কিছু করতে না পারলে পুলিশে খবর দেবে। উদ্ধারের একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো। কান পেতে শুনে মুসা বলল, 'হেলিকপ্টার না?'

'মনে হয়। হ্যারি হয়তো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে, আমাদের খবরটা জানানোর জন্যে।'

'কপ্টার উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা, কিন্তু ছোট জানালা দিয়ে দেখা গেল না ওটাকে। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই তিক্তকণ্ঠে মুসা বলল, 'আমাদের ফেলে গেল ওর খুনী বন্ধুদের দয়ার ওপর!'

সূর্য ডুবল। গোধূলির হলদে আলো ঢুকতে লাগল ছোট জানালাটা দিয়ে। কালো হয়ে গেল খুব দ্রুত। আঁধার নামল।

মুসা বলল, 'খাবার-টাবার কিছু দেবে না নাকি? খেতে না পাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। হ্যারিকে রাগিয়ে না দিলে হয়তো পচা হোক শুকনো হোক কিছু একটা দিয়ে যেত এতক্ষণে।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ঝনঝন করে উঠল তালা। খুলে গেল দরজা। ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল একজন লোক। পেছনে পিস্তল উঁচু করে ধরে রেখেছে সেই দুই প্রহরী।

ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা মোম জ্বেলে দিয়ে কোন কথা না বলে চলে গেল লোকটা। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কি দিয়েছে দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল মুসা। গরুর মাংস ভাজা, মুরগীর রোস্ট, পাঁউরুটি, সালাদ, মাখন, পনির আর পানি।

'বাহ্,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা, 'খুনী হলেও মেহমানদারি জানে। হাজার হোক জমিদারের রক্ত তো। অ্যাই কিশোর, বসে থেকে মোম পুড়িয়ে লাভ কি? খাওয়া শুরু করে দিই।'

'অত খুশি হয়ো না। এই খাতির হয়তো থাকবে না। ডুগানের কাছ থেকে এখনও কোন নির্দেশ পায়নি বলে এখনও খারাপ কিছু করছে না।'

'যখন করে করবে। এখন তো খেয়ে নিই।' গপগপ করে গিলতে আরম্ভ করল মুসা।

পেট ঠাণ্ডা হতেই গিয়ে জানালার শিকগুলো পরীক্ষা করে দেখল। গায়ের জোরে টানাটানি করেও এক ইঞ্চি ফাঁক করতে পারল না।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কাদার মধ্যে ডাইভ দেবে?'

'না, অত পাগল আমি নই। বেরোতে পারলে জানালার পর্দা ছিঁড়ে দড়ি বানিয়ে নামার চেষ্টা করব।'

'সে আশায় গুড়ে বালি। এই শিক বাঁকাতে পারবে না। অহেতুক মোম পুড়িয়ে লাভ নেই। কাজের সময় পাওয়া যাবে না শেষে।' ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কিশোর।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় চুপচাপ বসে রইল দুজনে। রাত পার করে দিনের আলোর অপেক্ষায়।

বারো

সকাল আটটা নাগাদ খবর পেয়ে গেল ওমর। রাতেই কিশোরদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর জানিয়ে রেখেছিল ক্যাপ্টেনকে। তখনই হলিউড আর আশেপাশের সমস্ত থানা এবং পেট্রল কারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি।

এখন ফোনে বললেন, 'এইমাত্র খবর পেলাম, স্যান ফ্র্যান্সিসকোর ওদিকে একটা মাঠের মধ্যে নাক গুঁজে পড়ে আছে একটা অস্টার প্লেন। নিশ্চয় আপনাদেরটা। গিয়ে দেখুন।'

'কার কাছে জানলেন?'

'স্যান ফ্র্যান্সিসকো থানার অফিসার ব্রাউন।'

'টমাস ব্রাউন?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি তো তাকে। আমার সঙ্গে খাতির আছে।'

'তাহলে তো ভালই হলো। পারলে এখুনি চলে যান। কি হয় না হয় জানাবেন।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল ওমর। রবিন রাতে বাড়ি যায়নি। ওমরের ওখানেই ছিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

ক্যাপ্টেন কি বলেছেন জানিয়ে ওমর বলল, 'এখনই বেরোতে হবে আমাদের। প্রকটর প্লেনটার ফুয়েল লাইন চেক করে রাখতে বলেছিলাম। করেছিলে?'

'মুসা করেছে। ও তো বলল ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু ওরা মাঠের মধ্যে ল্যান্ড করতে গেল কেন?'

'নিশ্চয় 'কপ্টারটা দেখে ওটার পিছু নিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তাই হবে। ওটাকে নামতে দেখে নিজেরাও নামার চেষ্টা করতে গিয়ে কোন ঘাপলা বাধিয়েছে।'

'কিন্তু ঘাপলা বাধাবে কেন? অস্টারটার এঞ্জিনেও কোন গোলামাল ছিল না। মুসাকেও খারাপ পাইলট বলা যাবে না।'

ওমরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'নামার পর ওরা গায়েবই বা হলো কোথায়?'

'কি ঘটেছে আমাদের জানানোর জন্যে হয়তো ফোন করতে গিয়েছিল।'

'তারপর গেল কোথায়? তা ছাড়া অ্যাক্সিডেন্ট করা প্লেনের কাছ থেকে একসঙ্গে দুজনেই সরে যাবে এটাও মেনে নেয়া যায় না। ফোন করতে গেলে একজন যাওয়ার কথা, আরেকজন প্লেনের কাছে পাহারায় থাকবে।'

'সেটা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কোন কারণ ঘটেছিল হয়তো যেজন্যে দুজনেই গেছে। এখন ভেবে দেখা যাক, কোথায় যেতে পারে। গ্রামের মধ্যে যেখানে সেখানে ফোন বুদ থাকে না। তাহলে কাছাকাছি যে বাড়িটা পাবে, সেটাতে ফোন আছে কিনা খোঁজ নেবে।'

'তা নাহয় নিল। তারপর গেল কোথায়? আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই বা করল না কেন?'

'এইটাই হলো আসল প্রশ্ন। জবাব একটাই, নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে ওরা।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন? খুঁজতে যাওয়া দরকার।'

'চলো।'

দশ মিনিটের মধ্যে আকাশে উড়াল দিল প্রকটর। অস্টারের চেয়ে পুরানো এটা। প্রায় ধসা অবস্থায় নিলামে কিনেছিল। ওমর আর মুসা মিলে বডিটা মেরামত করেছে, এঞ্জিনও সারিয়ে নিয়েছে। সুন্দর ওড়ে এখন, গোলমাল করে না। খদ্দেরের অপেক্ষায় আছে ওরা। পেলেই বেচে দেবে।

ওমরকে করেই টমাসকে ফোন করেছেন ক্যাপ্টেন। ওদের অপেক্ষায়ই বসে আছে ব্রাউন। তাকে একবার একটা কেসে সাহায্য করেছিল ওমর আর তিন গোয়েন্দা। সেই থেকে পরিচয়। ওদের দেখে চেয়ার থেকে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সাড়ে ছয় ফুট উঁচু বিশালদেহী নিগ্রো পুলিশ অফিসার। মুসার মতই মাথার খুলি আঁকড়ে রয়েছে তারের জালের মত কোঁকড়া চুল। হাসিটা চমৎকার।

কোনও ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'কোথায় পড়ে আছে অস্টারটা?'

'ডাভহিলের কাছে ডুগান ভিলেজে। ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে অবাক লাগে এক চাষীর। লোকটার মাথায় কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবলকে জানায়। সে গিয়ে দেখে এসে আমাকে খবর পাঠিয়েছে।'

'তাহলে চলুন যাওয়া যাক। নাকি? কোন অসুবিধে আছে?'

'নাহ্। কিসে এসেছেন?'

'প্লেনে। আধমাইল দূরে একটা মাঠে নামিয়ে রেখে হেঁটে এসেছি।'

'থাক ওটা। চলুন, গাড়িতেই যাই।'

এগারোটা নাগাদ ডুগান ভিলেজে পৌঁছল ওরা। গাড়ির শব্দ শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কনস্টেবল হারভে ব্রেক। বিমানের কাছে নিয়ে চলল ওদের। যেতে যেতে বিস্তারিত জানাল, ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে চাষীর মত সে নিজেও অবাক হয়েছে। তেমন ক্ষতি হয়নি বিমানটার। লেজ উঁচু করে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে আছে। চাষী আরও জানিয়েছে, মাঠে একটা হেলিকপ্টারকেও নামতে দেখেছে সে।

'কাছাকাছি কোন বাড়িঘর আছে?' জানতে চাইল ওমর।

'আছে। অনেক পুরানো একটা প্রাসাদ।'

'কাদের?'

'ডুগান ফ্যামিলির।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল ওমর। দুজনের চোখেই বিস্ময়।

আবার কনস্টেবলের দিকে ফিরল ওমর, 'পাইলটের খোঁজ নেয়ার কথা মনে হয়নি আপনার?'

'হয়েছে। আশেপাশে অনেক খোঁজ করেছি। কোন হদিস পাইনি। শেষে ভাবলাম, স্যান ফ্র্যান্সিসকো থানায় খবরটা জানানো দরকার...' বনের পাশ দিয়ে অন্যপাশে বেরোলেই মাঠটা চোখে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'আরে, গেল কোথায়! ওই মাঠেই তো ছিল!'

তবে পাওয়া গেল ওটা। বনের কিনারে। ঠেলেঠুলে নাক সোজা করে জীপের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একবার দেখেই কনস্টেবলের সঙ্গে একমত হয়ে গেল ওমর, কোন ক্ষতি হয়নি অস্টারটার। 'আশ্চর্য! দেখে তো মনে হচ্ছে ল্যান্ডিঙে কোন অসুবিধেই হয়নি। ওভাবে উবু হয়ে গেল কেন?'

'মাঠে চলুন, দেখাচ্ছি।'

মাঠের মাঝখানে নিয়ে এসে মাটিতে পড়ে থাকা তারের বান্ডিল দেখাল ওদেরকে কনস্টেবল। তারের কয়েক গজ পর পর কাঠের খুঁটি পেঁচানো রয়েছে। চোখা মাথাগুলো মাটিতে গাঁথা ছিল, হেঁচকা টানে উপড়ে এসেছে, মাটি লেগে আছে।

রবিন বলল, 'তারের বেড়া ছিল নাকি?'

'লোকে দেখলে বেড়াই ভাববে,' টমাসের দিকে তাকাল ওমর। কনস্টেবলের দিকে ফিরল। 'আপনি জানেন মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল কনস্টেবল। 'জানি। সিনেমায় দেখেছি। যুদ্ধের সময় খেতের মধ্যে এ রকম করে তারের ফাঁদ পেতে রাখা হত শত্রুর গুপ্তচর-বিমানকে আটকানোর জন্যে। নামলেই চাকায় বেধে যায় তার, হ্যাঁচকা টান লেগে প্লেনের নাক ঝুঁকে যায় সামনের দিকে। গতি বেশি থাকলে দুমড়ে-মুচড়ে থেবড়া হয়ে যায় সামনের অংশ।'

'অনেক কিছুই জানেন আপনি,' প্রশংসা না করে পারল না ওমর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, একটা রহস্যের সমাধান হলো। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করল প্লেনটা বোঝা গেল। এখন জানতে হবে ফাঁদ কারা পেতেছিল। প্রাসাদের যারা মালিক তারাই কি এই মাঠের মালিক?'

মাথা ঝাঁকাল কনস্টেবল। 'হ্যাঁ।'

কৌতূহল আর দমাতে পারল না টমাস। 'ঘটনাটা কি বলুন তো?'

'বলব। সব বলব। আপনার সাহায্য দরকার হবে আমাদের।' বনের দিকে আঙুল তুলে আনমনে বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বোঝাল ওমর, 'রাস্তা চলে গেছে ওদিকে। চাকার দাগ আছে। এতক্ষণে মনে হয় বুঝতে পারছি।'

হেঁটে বনের দিকে রওনা হলো সে। সঙ্গে চলল অন্য তিনজন। বন পার হয়ে অন্যপাশে আসতে চোখে পড়ল দুর্গ। দাঁড়িয়ে গেল সে। তার মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে ওখানে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েকশো বছরের পুরানো বাড়িটা। টমাস, তারপর কনস্টেবলের দিকে তাকাল সে। 'প্রাসাদ কোথায়? এ তো দুর্গ!'

'হ্যাঁ, দুর্গের মত প্রাসাদ। বদনাম আছে বাড়িটার। লোকে এড়িয়ে চলে।

একসময় বহু খুনখারাপি হয়েছে ওখানে, যখন ইনডিয়ানরা এই এলাকার মালিক ছিল। দুর্গের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধত। শ্বেতাঙ্গদের দাপট তখন বাড়ছে। হেরে যেতে শুরু করল ইনডিয়ানরা। পরাজিতদের ধরে নিয়ে গিয়ে ওই দুর্গে আটকে অমানুষিক অত্যাচার করে মারা হয়েছে।'

'বদনামটা কি?' জানতে চাইল রবিন। 'নিশ্চয় ভূতের?'

'হ্যাঁ। যাদের কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে তাদের প্রেতাত্মা নাকি আসর করে আছে বাড়িটার ওপর।'

'সেই পুরাতন কাহিনী। পুরানো দুর্গ, অত্যাচার, খুনখারাপি, এবং ভূত। আপনি বিশ্বাস করেন?'

হাসল কনস্টেবল। মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'মানুষ থাকে না এখন?'

'থাকে।'

'তাহলে আর এত কথার দরকার কি?' রবিন বলল ওমরের দিকে তাকিয়ে। 'গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলেই তো হয়ে যায় প্লেনটা কে টেনে নিয়ে গেছে? কিশোর আর মুসাকেও হয়তো ওখানেই পাওয়া যাবে।'

'এত সহজ হবে না ব্যাপারটা,' টমাস বলল। 'তল্লাশি চালাতে গেলে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে। নিয়ে আসিনি। জোরাল প্রমাণ ছাড়া কোন নাগরিককে বিরক্ত করতে গেলে বিপদে পড়ে যাব।' ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল সে, 'কিশোর আর মুসা যে ওই বাড়িতে আটকা আছে, এ ধারণা হলো কেন তোমার?'

'আমরা এখন যে কেসটায় কাজ করছি, তাতে ডুগান নামে এক ভদ্রলোক জড়িত। এই বাড়িটাও জানলাম ডুগান ফ্যামিলির। আমাদের পরিচিত ডুগান এই ফ্যামিলির লোক হতে পারে। কিশোর আর মুসা নিশ্চয় তার কোন গোপন খবর জেনে ফেলেছে, যেজন্যে ওদের ধরে আটকে রেখেছে।'

'তাহলে তো গিয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসতে হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল টমাস।

বাধা দিল ওমর, 'এত তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যে বিশাল বাড়ি, ভেতরে কামরা শখানেকের কম হবে না। সবগুলোতে একসঙ্গে খুঁজতে গেলে অনেক লোক দরকার। এত লোক আমাদের নেই। যদি অসৎ উদ্দেশ্যে মুসা আর কিশোরকে ধরে কোন ঘরে আটকে রাখাও হয় ওখানে, পুলিশ দেখলে এমন কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলবে, হাজার খুঁজেও বের করা যাবে না। ইনডিয়ানদের মাঝে বাস করে তাদের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত করে তৈরি হয়েছিল, নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে এমন কোন গোপন ঘর কিংবা সুড়ঙ্গ আছে, যেখানে লুকালে মাসের পর মাস চেষ্টা চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল টমাস। 'কি করতে চান তাহলে?'

'গাঁয়ে রেস্টুরেন্ট আছে নিশ্চয়?'

'তা তো আছেই,' ওমরের কথা অবাক করল টমাসকে।

'ওখানে গিয়ে লাঞ্চ সারতে সারতে আলোচনা করব। খালি পেটে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে থাকে, খোলে না।'

'বেশ, চলুন।'

গাঁয়ের ভেতরে ম্যাডাম ক্যাটালিনার 'গুড ফুড' রেস্টুরেন্টে ওদের পৌছে দিয়ে ফাঁড়িতে ফিরে গেল কনস্টেবল ব্রেক। বেশ ছিমছাম রেস্টুরেন্ট। মধ্যবয়েসী, মোটাসোটা ম্যাডাম ক্যাটালিনা মুখে বিমল হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল লাঞ্চ লাগবে কিনা। অর্ডার নিয়ে চলে গেল। ফিরে এল ট্রেতে করে ডিমভাজা, রুটি, সালাদ আর কফি নিয়ে।

সাদাসিধা খাবার হলেও বেশ রুচি করেই খেল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলল আলোচনা।

ঠিক হলো, বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে ওমর আর রবিন, টমাস যাবে দুর্গের লোকের সঙ্গে কথা বলতে। বিমানটার কথা, ওটাতে যারা ছিল তাদের কথা জিজ্ঞেস করবে। যদিও তাতে কোন লাভ হবে না—তিনজনই একমত, তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

সুতরাং খাওয়া সেরে আবার দুর্গের কাছে ফিরে এল ওরা।

'আমি যাচ্ছি কথা বলতে,' বলে রওনা হয়ে গেল টমাস।

বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল ওমর আর রবিন। চোখ দুর্গের দিকে।

পরিখার ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে দরজার পাশের শেকলে টান দিল টমাস। বাড়ির ভেতর কোথাও বেজে উঠল পুরানো আমলের ঘন্টা।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল টমাস। কয়েক মিনিট পরই বেরিয়ে এল। ফিরে এল ওমরদের কাছে। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'কোন লাভ হলো না!'

'সে তো আমি আগেই জানতাম,' ওমর বলল। 'এত সহজে কি আর মুখ খোলে ওরা। কি বলল?'

'অবাক হওয়ার ভান করল। প্লেন যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এখানে শোনেইনি নাকি।'

'এত কাছে একটা প্লেন পড়ল, শুনল না?'

'মিথ্যে বললে আর কি করব?'

'দরজা খুলল কে?'

'একটা লোক।'

'দেখতে কেমন?'

'বেঁটে, মোটা, দাড়িঅলা, কুৎসিত।'

'তাহলে হ্যারি নয়। কি করল?'

'দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকটা প্রশ্ন করেই কথা ফুরিয়ে গেল আমার। ফিরে আসা ছাড়া পথ রইল না।' একটু থেমে গাল চুলকে কি যেন চিন্তা করল টমাস। বলল, 'আমাকে এখন স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় ফিরে যেতে হবে। আপনারা কি করবেন?'

'এখানেই থাকব।'

'লাভ কি?'
'তা জানি না। কে কে বেরোয়, কে ঢোকে, দেখতে চাই। জানার চেষ্টা করব, কিশোর আর মুসাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'
'বিপদে পড়ে যেতে পারেন!'
হাসল ওমর, 'কাজটাই তো বিপদের, তাই না?'
তর্ক করল না টমাস। 'পিস্তল আছে?'
'না, আনিনি। দরকার মনে করিনি। জানতাম পুলিশ থাকবে সঙ্গে।'
হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা খুলে বাড়িয়ে দিল টমাস, 'নিন। কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দেবেন। অফিসে গিয়ে আরেকটা নিয়ে নেব আমি।'
'থ্যাংকস,' পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ওমর। 'আরেকটা কথা। জরুরী প্রয়োজন হলে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় ফিরব কি করে?'
'গাড়ি?'
'পেলে ভাল হত। কিন্তু কোথায় পাব?'
'ঠিক আছে, রইল আমারটা। গাঁয়ে গিয়ে কাউকে ধরে একটা লিফট নিয়ে নেব। বাস স্টেশনে পৌঁছে দিলেই চলে যেতে পারব।'
'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'
'ঠিক আছে, চলি এখন। ভাববেন না এটাই আমার শেষ আসা। আবার আসব, তবে কখন সেটা বলতে পারি না।' কয়েক পা গিয়ে ফিরে এল টমাস। 'সাবধানে থাকবেন। ঝুঁকি নেবেন না।'
মুচকি হাসল ওমর। 'ঝুঁকি আমি নিই না। নিশ্চিন্ত থাকুন।'
বিচিত্র হাসি ফুটল টমাসের ঠোঁটে। ওমর শরীফ ঝুঁকি নেয় না, হাহ্! লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

তেরো

রাতটা আরামেই কাটল। জানালায় পাল্লা না থাকাতেও কষ্ট পেতে হলো না, কারণ শীতকাল নয়। ঠাণ্ডা ঢোকেনি তেমন।
প্রথম ঘুম ভাঙল কিশোরের। মনে হলো, কোনও ধরনের এঞ্জিনের শব্দ ঘুম ভাঙিয়েছে তার। হেলিকপ্টার হতে পারে। কাছেই কোনখানে নেমেছে হয়তো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল সে। ফিরে এল নাকি হ্যারি? কতদিন আটকে রাখা হবে ওদের? অনির্দিষ্টকালের'জন্যে নিশ্চয় নয়? তবে কি ছেড়ে দেবে? প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কি করবে? জবাব একটাই: খুন। চিরকালের জন্যে কারও মুখ বন্ধ করে দিতে হলে খুনের কোন বিকল্প নেই।
'কটা বাজল?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।
'প্রায় সাতটা।'
'আরিব্বাপরে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সাতটা বাজিয়ে দিলাম!'
'তো আর কি করতে পারতাম? চিরকাল ঘুমানোর জন্যে এখন তৈরি হও।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো মুসা। 'মানে?'

'চিন্তা করে বুঝলাম, আমাদেরকে খুন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওদের।'

'খাইছে!' তড়াক করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। 'ওরা বলে গেল নাকি? কখন?'

'আরি কি কাণ্ড! ওরা বলে যাবে কেন? বললামই তো, চিন্তা করে বের করলাম।'

'তো কি করব আমরা এখন?'

'ওরা আমাদের মেরে ফেলার আগেই পালাতে হবে।'

'অসম্ভব!'

'অসম্ভব কেন? ওমরভাই কি আসবে না মনে করেছ?'

'আমরা কোথায় আছি জানলে তো আসবে।'

'জেনে নেবে, যে ভাবেই হোক। আমাদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না ওমরভাই আর রবিন...'

বাইরে পায়ের শব্দ হলো। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল গতকালের সেই লোকটা, যে খাবার নিয়ে এসেছিল। আজও সে-ই এল। পেছনে পাহারা দিচ্ছে দুই পিস্তলধারী। ট্রেতে করে নিয়ে এসেছে রোলস, মাখন, জ্যাম আর কফি। নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'কদ্দিন চলবে এ ভাবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব নেই।

'হ্যারি কোথায়?'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল লোকটা।

দরজার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল মুসা, 'আহাহা, কি লোকরে, মুখ দিয়ে যেন খই ফোটে!'

সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে নাস্তা খাওয়া শেষ করল ওরা। হাসিমুখে মুসা বলল, 'ওমরভাইদের আসার কথা কি যেন বলছিলে?'

'ওরা আসবেই।'

'এত শিওর হচ্ছ কি করে?'

'মাঠের মধ্যে নাক গুঁজে হরহামেশা প্লেন পড়ে থাকে না। গাঁয়ের কারও না কারও চোখে পড়বেই। খবরটা পুলিশের কানে যেতে বাধ্য। আর তাহলেই ওমরভাইরা খবর পেয়ে যাবে। এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে হয়তো।'

'তোমার মত এতটা আশা করতে পারছি না আমি। তবে একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কাটল। যতক্ষণ বেঁচে থাকব, না খাইয়ে রাখবে না ওরা আমাদের।' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল মুসা। 'যদি আসেই, জানছে কিভাবে আমরা এখানে আছি? আমাদের বের করবে কিভাবে? দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো আর হ্যারিরা বলে দেবে না যে এখানে আছি আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'একটা অতি জরুরী কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। দাঁড়াও,

জানানোর ব্যবস্থা করছি।'
নিজের বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল সে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। কি করতে চাইছে গোয়েন্দাপ্রধান?
ওদের পকেটের জিনিস কেড়ে নেয়নি হ্যারি। বড় নোটবুকটা বের করল কিশোর। ফড়াৎ করে একটা পাতা ছিঁড়ল।
'কি করছ?' জানতে চাইল মুসা।
'প্লেন বানাব।'
মুসাকে হাঁ করিয়ে রেখে কাজে লাগল কিশোর। দ্রুতহাতে বানাল একটা খেলনা বিমান। বলপেন দিয়ে সেটার পেটের কাছে আঁকল তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। হাতের তালুতে নিয়ে হাসল, 'সুন্দর হয়েছে, তাই না?'
'কি করতে চাও তুমি?' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বিমানটা তালুতে রেখে হাত যতটা সম্ভব লম্বা করে দিল জানালার বাইরে। আস্তে করে ছেড়ে দিল খেলনাটা। বাতাসে ভেসে উড়তে উড়তে পরিখা পার হয়ে গেল ওটা। বনের কিনারে গিয়ে পড়ল।
মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'কি বুঝলে? ওমরভাই কিংবা রবিন এদিকে এলে দেখতে পাবেই, তাই না?'
'তোমার মাথা খারাপ! খড়ের গাদায় সুই খোঁজা! চোখেই পড়বে না।'
'সেজন্যেই তো আরও বানাব। নোটবুকের সমস্ত পাতা দিয়ে প্লেন বানিয়ে ছেড়ে দেব। সবুজ ঘাসের মধ্যে সাদা সাদা এতগুলো খেলনা নজরে পড়বেই। ডাকাতরা দেখলে যদি বোঝে আমরা ছেড়েছি, ভাববে সময় কাটানোর জন্যে খেলছি। আর ওমরভাই এবং রবিনের চোখে পড়লে...'
এতক্ষণে বুঝল মুসা, 'তাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখে বুঝবে আমরাই ছেড়েছি!' হাত বাড়াল, 'দেখি, আমাকেও দাও, আমিও বানাই!'
দুপুরেও খাবার রেখে গেল সেই লোকটা।
খাওয়া শেষ হলে ঘরে ঢুকল জেনারেল ডুগান। হাসিমুখে বলল, 'ভালই আছ মনে হচ্ছে?'
তাকে এখানে দেখে অবাক হলেও চেপে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কদ্দিন আটকে রাখার ইচ্ছে?'
'সেটা তোমাদের ওপর নির্ভর করে,' ভদ্রতার মুখোশ সামান্যতম খসল না ডুগানের। 'ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।'
'বলুন?'
'একটা প্রস্তাব আছে আমার। শোনা না শোনা তোমাদের ইচ্ছে।'
'কি প্রস্তাব?'
'তোমরা ছেলেমানুষ। শখের বসে গোয়েন্দাগিরি করতে এসে একটা ভুল করে ফেলেছ। ভেবে দেখলাম, সেটা ক্ষমা করে দেয়া যায়। আমি তোমাদের বিশ্বাস করতে রাজি আছি। তবে কথা দিতে হবে, আমার কথা, এখানকার কথা কাউকে কোনদিন বলবে না। কিচ্ছু ফাঁস করবে না।'

'আপনি কি সত্যি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছেন?'

'ফালতু কথা আমি বলি না।'

'কিন্তু আপনি যে প্রস্তাব দিচ্ছেন, সেটা মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'দেখো, বোকামি কোরো না। অল্প বয়েস, রক্ত গরম...আমার কথা না শুনলে শেষে পস্তাতে হবে।'

'অর্থাৎ মেরে ফেলবেন?'

'মারামারি কথা আসছে কেন? বললামই তো, একটা ভুল মাপ করে দেয়া যায়, যদি আমার কথা শোনো...'

'কিভাবে শেষ করবেন, বলুন তো? গুলি করে মেরে কাদার নিচে পুঁতে ফেলবেন?'

আর ধৈর্য রাখতে পারল না হ্যারি। পেছন থেকে বলে উঠল, 'বলেছিলাম না, খামোকা সময় নষ্ট করবে! ওরা শুনবে না!'

হাত তুলে ভাইকে থামতে ইশারা করল ডুগান। কিশোরের দিকে ফিরল, 'তদন্ত করতে গিয়ে যে টাকা খরচ হয়েছে, সেটাও দিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। মুখ বন্ধ রাখার জন্যেও টাকা দেব। আর কি চাও?'

'আচ্ছা, সোনাগুলো কি করেছেন, বলুন তো?'

হাসিটা চলে গেল ডুগানের চোখ থেকে। পরক্ষণে ফিরে এল আবার। 'আমার কথার জবাব কিন্তু নয় এটা!'

'তাহলে আপনার কথার জবাবই শুনে নিন। আমি রাজি নই।'

মুসার দিকে তাকাল ডুগান। 'তোমারও কি একই বক্তব্য? তুমিও কি জীবনের মায়া করো না?'

শান্তকণ্ঠে মুসা বলল, 'করি। কিন্তু অপরাধীকে সহযোগিতা করতে পারব না।'

'দেখো, তোমাদের জীবন মাত্র শুরু। এখনই সেটা শেষ হয়ে যাক, সত্যি বলছি, এ আমি চাই না। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার কথায় রাজি হয়ে যাও।'

'সরি, জেনারেল,' কিশোর বলল। 'আপনি যা করতে বলছেন, সেটা অন্যায়। আমরা তা পারব না।'

'তোমাদের দৃঢ়তা দেখে অবাক হচ্ছি আমি!...ঠিক আছে, চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, যাও। ভেবেচিন্তে মনস্থির করো। চলি এখন। গুডবাই।'

দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল ডুগান। তালা লাগানোর শব্দ হলো। পায়ের শব্দ দূরে চলে গেলে মুসা বলল, 'আমরা রাজি হলে কি সত্যি খুন করবে না?'

'না, করবে না। তাহলে এত কথা বলত না। ভাইকে শুধু হুকুম দিয়ে দিত, এতক্ষণে আমাদের লাশ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা হয়ে যেত।'

'তারমানে লোকটা অপরাধী হলেও অত খারাপ না। তবে কালকের মধ্যে আমরা রাজি না হলে নিশ্চয় আর ছাড়বে না?'

'না, ছাড়বে না। যতদূর বুঝলাম, ডুগান এককথার মানুষ। আমরা রাজি হলে ভাল, নইলে আমাদের বাঁচিয়ে রেখে তার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা

নষ্ট হতে দেবে না। তারচেয়েও বড় কথা, জেলে যেতে হবে। এত সুনাম, ক্ষমতা, মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যাবে। সেটা সে হতে দেবে না কিছুতেই।'

কেটে গেল দিন। সন্ধ্যায় খাবার রেখে গেল আগের লোকটা। আরও একটা মোমবাতি দিয়ে গেল।

খাওয়ার পর আগের দিনের মতই বাতি নিভিয়ে দিল কিশোর।

দুহাত মাথার নিচে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। কখন যে চোখ লেগে এল, বলতে পারবে না। আচমকা—বোধহয় আলো জ্বলে ওঠাতেই—ঘুম ভেঙে গেল তার। দেখে জানালায় দাঁড়িয়ে মোমবাতি হাতে কি যেন করছে কিশোর।

'কি হলো? কাউকে দেখা যাচ্ছে নাকি?' আশায় দুলে উঠল মুসার মন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

'কি দেখছ?'

'দেখছি না। দেখাচ্ছি।'

কিশোরের রহস্যময় কথার মানে বুঝতে পারল না মুসা।

চোদ্দ

বনের মধ্যে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে ওমর আর রবিন। দুর্গের দিকে চোখ। পশ্চিম দিগন্তে হেলতে আরম্ভ করেছে সূর্য।

রবিন বলল, 'কিছু একটা করা দরকার।'

'কি?'

'যা হোক, কিছু একটা। এ ভাবে বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না।'

'করার থাকলে তো করেই ফেলতাম। দুর্গে ঢুকতে বলছ তো? এখনও সময় হয়নি। সেই পুরানো প্রবাদটা জানো না—মনে সন্দেহ রেখে কিছু করার চেয়ে না করা ভাল? বসেই থাকতে হবে আমাদের, যতক্ষণ কিছু না ঘটছে, যতক্ষণ শিওর না হচ্ছি।'

'কি ঘটবে?'

'জানি না।'

'কিছুই যদি না ঘটে?'

'ঘটবেই। চুপচাপ বসে আঙুল চুষবে না ওরা। অন্তত কিশোর।'

'আর কখন করবে? অন্ধকার তো হয়ে এল!'

'হয়তো অন্ধকারের অপেক্ষাতেই আছে ওরা। রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এরপরও যদি কিছু না করে, যে যে জানালায় আলো দেখব, সবকটাতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসার চেষ্টা করব। তোমার বিরক্ত লাগছে? উঠে গিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এসো না। চাইলে গাঁয়ে গিয়ে খাবারও কিনে আনতে পারো, রাতের জন্যে।'

'আপনি একা থাকবেন?'

'অসুবিধে কি? নজর রাখার জন্যে একজোড়া চোখই যথেষ্ট।'

'বেশ, বরং তা-ই করি। হেঁটেই আসি।' উঠে দাঁড়াল রবিন।

যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল; 'ওমরভাই, ওরা ওই দুর্গেই আছে! কোন সন্দেহ নেই!'

'কি করে বুঝলে?'

'এই দেখুন!' হাতের খেলনা বিমানটা দেখাল রবিন।

ঝট করে পিঠ সোজা করল ওমর, 'কোথায় পেলে?'

'বনের কিনারে।'

'ওরাই পাঠিয়েছে, বুঝলে কি করে?'

খেলনাটা উল্টে প্রশ্নবোধকগুলো দেখাল রবিন। 'কোন সন্দেহ নেই আমার, কিশোরই পাঠিয়েছে। এটা আমাদের কোড। বহুবার বিপদে পড়ে এই প্রশ্নবোধক ব্যবহার করে উদ্ধার পেয়েছি আমরা।'

'হুঁ, এখন আর বসে থাকা যায় না। বলেছিলাম না, কিছু ঘটবেই।'

'কি করবেন?'

'স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় যেতে পারবে?'

'টমাসের গাড়িটা নিয়ে? পারব। কেন?'

'তাকে খবর দিতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকজন নিয়ে যেন চলে আসে।'

'যদি অফিসে না পাই?'

'যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে। পুলিশের সাহায্য পেলে ওদের বের করে আনতে সুবিধে হবে।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি।'

'পাহাড়ী রাস্তা, অন্ধকারে সাবধানে গাড়ি চালাবে। তাড়াহুড়া করে খাদে পড়ে নতুন বিপদ বাধিয়ো না।'

'আচ্ছা।'

রওনা হয়ে গেল রবিন।

ঢিলেঢালা ভাবটা চলে গেছে ওমরের। একটা সিগারেট ধরাল। সূর্য যত দিগন্তে নামছে, মাঠের প্রান্তে দীর্ঘ হচ্ছে গাছের ছায়া। বিচিত্র আলোয় কেমন ভূতুড়ে, অবাস্তব লাগছে বিশাল পুরানো দুর্গটাকে। মুহূর্তের জন্যেও আর চোখ সরাল না ওটার দিক থেকে।

খুব ধীরে কাটছে সময়। গোধূলি পেরিয়ে রাতের ছায়া নামল। গাঢ় হতে লাগল অন্ধকার। বাঁ পাশের টাওয়ারের সবচেয়ে উঁচু ঘরটার জানালায় আলো জ্বলতে দেখা গেল।

আধঘণ্টা পর নিভে গেল আলোটা। ঘণ্টাখানেক পর আবার জ্বলে উঠল। নড়াচড়া করছে। জানালার কাছে এগিয়ে এল।

সতর্ক হলো ওমর। দৃষ্টি স্থির হলো জানালার ওপর। মোম হাতে জানালায় দাঁড়াল কেন লোকটা? ছায়া পড়ল। মোমের সামনে হাত দিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছে লোকটা। সরে গেল হাত। আবার বাধা। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার সরে গেল।

প্রথমে অদ্ভুত লাগলেও কয়েক সেকেন্ডেই বুঝে গেল ওমর। সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে! এস ও এস! উত্তেজনায় পিঠ সরিয়ে এনেছে গাছের গা থেকে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে সঙ্কেত পড়ার চেষ্টা করল।

তিন মিনিট পর আর কোন সন্দেহ রইল না ওর, ওই ঘরেই রয়েছে কিশোর আর মুসা। কারণ আলোর সঙ্কেতের সাহায্যে ওদের দুটো নামই বলার চেষ্টা করেছে কিশোর।

কয়েকবার সঙ্কেত পাঠিয়ে নিভে গেল আবার আলো। বসে বসে ভাবতে লাগল ওমর, কি করা যায়? জানালার কাছে কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিশোর? হয়তো আছে। হয়তো অপেক্ষা করছে জবাবের আশায়। জবাব দিতে পারলে নিশ্চিন্ত করা যেত ওদেরকে। একটা টর্চ হলে…টর্চ! কথাটা যেন বিদ্যুৎ চমকের মত মাথায় খেলে গেল ওমরের। অস্টার! ওটার ককপিটের একটা পকেটে টর্চ আছে। রবিন কখন আসে ঠিক নেই। ওর অপেক্ষায় বসে থাকার মানে হয় না। আগে কিশোরদের সঙ্গে যোগাযোগটা করে ফেলা যাক, তারপর অন্য কিছু করার কথা ভাববে।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না সে। লাফিয়ে উঠে প্রায় ছুটতে শুরু করল বিমানটার দিকে। অন্ধকারে অচেনা বনের মধ্যে ছোটাটা সহজ হলো না। গাছের গায়ে ধাক্কা লাগল, শেকড়ে হোঁচট খেল, কিন্তু থামল না সে। গতিও কমাল না। চলে এল বনের কিনারে, বিমানটা যেখানে রাখা আছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে টর্চটা বের করতে আনতে এক মিনিটও লাগল না।

কিন্তু মাটিতে নামতেই ঘাড়ের কাছে পিস্তলের শীতল নলের স্পর্শ পেল। পাথর হয়ে গেল সে। কানের কাছে কঠিন কণ্ঠ, 'ওখানে উঠেছিলে কেন?'

পরিচিত কণ্ঠ। ফিরে তাকানোর চেষ্টা না করে ওমর বলল, 'আপনি?'

'ও, আপনি!' পিস্তল সরিয়ে নিল কনস্টেবল ব্রেক। সে-ও অবাক হয়েছে। 'ওখানে কি করছিলেন?'

'টর্চ আনতে ঢুকেছিলাম।'

'টর্চ দিয়ে কি হবে?'

কি হবে, জানাল ওমর। 'কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন?'

'দিনের বেলা আপনাদের আলোচনা থেকেই অনুমান করেছি, সাংঘাতিক কোন ব্যাপার ঘটেছে। অফিসার টমাস আমাকে কিছু বলেনি। কৌতূহল দমাতে পারছিলাম না। মনে হলো, হাতে যখন কোন কাজ নেই, গিয়ে বরং প্লেনটা পাহারা দিই। কিছু ঘটতে পারে।'

'এবং সত্যি সত্যি ঘটল, তাই না?'

'আসলে কি করছেন আপনারা, কি ঘটছে, বিশ্বাস করে আমাকে কি বলা যায় না? আমিও পুলিশ। সব শুনলে হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

ব্রেকের কথাটা ভেবে দেখল ওমর। দ্বিধার কিছু নেই। গাঁয়ের একমাত্র পুলিশম্যান ব্রেক। ডুগান ভিলেজের ইনচার্জ। ডাকাতদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। থাকলে বিমানটার কথা টমাসকে জানাত না। বরং চুপ করে

থাকত, চেপে যাওয়ার চেষ্টা করত।

কি কাজে এসেছে ওরা, কোনখান থেকে শুরু, সংক্ষেপে ব্রেককে জানাল ওমর।

চুপচাপ সব শোনার পর ব্রেক বলল, 'আমার কাছে গোপন করে ভুল করেছেন আপনারা। অনেক আগেই বের করে আনা যেত ওদের। আমি এ গাঁয়ের ছেলে। হাতের উল্টোপিঠের মত চেনা ওই দুর্গ। ছোটবেলায় কত ঢুকেছি ওখানে। বন্ধুদের নিয়ে খেলেছি।... চলুন, গিয়ে বের করে নিয়ে আসি।'

'বের করে আনব! এতই সহজ? ঢুকতে দেবে কেন আমাদের?'

অন্ধকারে হাসি শোনা গেল ব্রেকের। 'ওদের দেখিয়ে ঢুকব নাকি?'

'ফাঁকি দেবেন কি করে?'

'পুরানো দুর্গ, ভুলে যাচ্ছেন কেন? দুর্গে মাটির নিচের ঘর, পালানোর জন্যে সুড়ঙ্গ—এ দুটো জিনিস থাকবেই। ডুগান ফোর্টেও আছে। একটা গোপন সুড়ঙ্গ আছে, বেরোনোর পথ।'

'বেরোনোর পথ, ঢোকার তো আর নয়।'

'বেরোনো মানেই ঢুকতে পারা, আর ঢুকতে পারা মানেই বেরোনো। এ তো সহজ কথা।'

তা ঠিক। উত্তেজনায় সহজ কথাগুলোই যেন মাথায় ঢুকতে চাইছে না ওমরের।

'আসুন আমার সঙ্গে,' ব্রেক বলল, 'সুড়ঙ্গমুখটা দেখাব।'

পথ দেখিয়ে বনের গভীরে নিয়ে এল ওমরকে ব্রেক। একটা ঘন ঝোপ দেখিয়ে বলল, 'মুখটা ওর ভেতর। আলগা পাথর ফেলে রাখা হয়েছে। সরালেই বেরিয়ে যাবে। ঢুকবেন?'

দ্বিধায় পড়ে গেল ওমর। ঢুকবে? না রবিন আর টমাসের আসার অপেক্ষা করবে? জটিল পরিস্থিতি। ঢোকার সুযোগ পেয়েও ভাবতে হচ্ছে। রবিন ফিরে এসে যদি দেখে সে নেই, দুশ্চিন্তা শুরু করবে। মরিয়া হয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বসতে পারে।

'ঢোকার জন্যে তাড়া নেই আপাতত,' ব্রেককে বলল সে। 'আগে আমার বন্ধুদের জানিয়ে দিই যে আমরা আছি এখানে।'

'যা ভাল বোঝেন।'

আগের জায়গায় ফিরে এল দুজনে। রবিন ফেরেনি। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথাও নয়। অন্ধকার দুর্গ। কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। টাওয়ারের জানালার দিকে তাক করে তিনবার টর্চ জ্বালল আর নেভাল ওমর। জবাব পেল না। কিশোর আর মুসাকে ওঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হলো নাকি? না ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা?

জানালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে ব্রেককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখন থাকবেন, না অন্য কাজ আছে?'

'থাকি। আমার সাহায্য আপনার প্রয়োজন হবে।'

পনেরো

ভোর চারটে বাজতে চলল। পুব দিগন্ত থেকে যেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে কাকভোরের হালকা ধূসর ছায়া। রবিন যখন এল, ওমর তখন দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। তার পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে ব্রেক।

শব্দ হতেই ঝট করে মাথা তুলল ওমর। একটা ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখে পিস্তল বের করল। কাছে আসার পর বুঝল, রবিন। 'ও, তুমি? কি খবর?'

পাশে শোয়া ব্রেকের দিকে তাকাল রবিন।

'অসুবিধে নেই,' ওমর বলল। 'আমাকে সাহায্য করতে এসেছে ব্রেক। তার সামনেই যা বলার বলতে পারো।'

'বিশেষ ভাল না,' রবিন বলল, 'রাস্তার মধ্যে চাকা পাংচার হলো। থানায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত। গিয়ে দেখি ব্রাউন নেই। ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার কথা। সেখানে ফোন করালাম। বাড়িতেও নেই। ডিউটি অফিসার অনুমান করল, হয়তো ক্লাবেটাবে চলে গেছে। কতক্ষণ আর বসে থাকব? শেষে একটা মেসেজ রেখে চলে এলাম। বার বার বলে এসেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন খবরটা পৌঁছে দেয় ব্রাউনকে। অফিসার কথা দিয়েছে, দেবে।... এদিকের কি খবর?'

'ভাল। ওই টাওয়ারের সবচেয়ে ওপরের ঘরটায় আছে কিশোররা। তুমি যাওয়ার পর মোমবাতি জ্বেলে মেসেজ দিয়েছে সে।'

'তাই! টমাস কখন আসে তার তো কোন ঠিক নেই। আমরা কি বসে থাকব?'

'না, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, আর বসে থাকব না। দুর্গে ঢুকব। ওদের বের করে আনতে হবে।'

'কিন্তু ঢুকবেন কিভাবে?'

কথা কানে যেতে ঘুম ভেঙে গেছে ব্রেকের। চোখ মেলে রবিনকে দেখে উঠে বসল।

ওমর বলল, 'একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখিয়ে এনেছে আমাকে ব্রেক। ওদিক দিয়ে নাকি ঢোকা যায়।'

'তাহলে বসে আছি কেন?'

রবিনের কথার জবাবটা দিল ব্রেক, 'আমার মনে হয় আর বসে থাকার কোন মানে নেই। অহেতুক দেরি করা। চলুন, ঢুকে পড়ি।'

লোকটার সাহস আছে, অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে, অনেক আগেই বুঝে গেছে ওমর। প্রমোশনেরও লোভ আছে হয়তো। কাজ দেখিয়ে বসদের সুনজরে পড়তে চায়।

তার প্রমোশনে বাগড়া দিতে চাইল না ওমর। উঠে দাঁড়াল। 'চলুন।'

আগে আগে চলল ব্রেক। ঝোপটার কাছে এসে ডালপাতা সরিয়ে বসে

পড়ল গোড়ায়। শ্যাওলা জন্মে পিচ্ছিল হয়ে থাকা আলগা পাথরগুলো সরাতে তাকে সাহায্য করল ওমর। রবিন পাহারা দিতে লাগল। দেখছে কেউ আসে কিনা।

পাথর সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা গর্তের কালো মুখ। হাসি হাসি গলায় ব্রেক জিজ্ঞেস করল, 'কে আগে ঢুকবে? আমি নামি?'

'না, আপনি আমার পেছনে আসুন,' বলে গর্তের ভেতর টর্চের আলো ফেলে দেখে নিল ওমর। গর্তের কিনারে দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটা নামিয়ে দিল ভেতরে। পায়ে মাটি ঠেকতে হাত ছেড়ে দিল। মাটি ভেজা ভেজা। পচা উদ্ভিদ আর বহুদিন বন্ধ থাকার ফলে ভাপসা দুর্গন্ধ বাতাসে। সুড়ঙ্গের ভেতর কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অন্যদের আসার অপেক্ষা করতে লাগল। টর্চ একমাত্র ওর হাতেই আছে।

খারাপ সুড়ঙ্গ জীবনে অনেক দেখেছে ওমর, কিন্তু এ রকম আর দেখেনি। মনে রাখার মত একটা অভিজ্ঞতা। যখন তৈরি করা হয়েছিল, তখন নিশ্চয় এই দুরবস্থা ছিল না। ব্রেক যখন ছোটবেলায় খেলতে ঢুকত, তখনও এরচেয়ে অনেক ভাল ছিল সুড়ঙ্গটা, জানাল সে। তারমানে বহুদিন ব্যবহার করা হয় না এটা। বন্ধ পড়ে থাকতে থাকতে এই অবস্থা হয়েছে। হরর ছবির শূটিং করা যাবে।

সরু সুড়ঙ্গ। মেঝেতে চটচটে কাদা। দেয়ালে যত রাজ্যের পোকামাকড়ের বাস, অন্ধকার জগতের বাসিন্দা ওরা। দেখলেই গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। রবিনকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে দেখে আশ্বস্ত করল ব্রেক—চেহারাই খারাপ ওগুলোর, তেমন বিষাক্ত নয়। কামড়ে দিলে কিংবা হুল ফোটালে মারা যাওয়ার ভয় নেই, বড়জোর হাসপাতালে গিয়ে ইনজেকশন নিতে হবে। ছাত থেকে দুর্গন্ধে ভরা পানির ফোঁটার সঙ্গে একধরনের পিচ্ছিল জিনিস খসে খসে পড়ছে। নিশ্চয় এর ওপরে রয়েছে পরিখা। সেখান থেকে চুইয়ে পড়ছে এই পানি।

একজায়গায় ঢালু হয়ে নেমে গেছে মেঝে। নিচু হওয়াতে হাঁটুপানি জমে আছে। কিছুদূর পানি ভেঙে এগোনোর পর আবার ওপরে ওঠার পালা। নিচু হয়ে এল ছাত, মাথায় ঠেকে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। তারপর আবার ওপরে উঠে গেল ছাত।

সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় কি দেখতে পাবে, ভাবছে ওমর। দেয়াল তুলে যদি মুখটা বন্ধ করে দিয়ে রাখে? কিংবা ওপর থেকে ছাত ধসে গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? এত কষ্ট শুধু বিফলেই যাবে না, ভয়ানক এই সুড়ঙ্গ ধরে আবার ফিরেও যেতে হবে। আর ভাবতে চাইল না সে। কিন্তু শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হলো। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। সামনে ঠিকই পথ রুদ্ধ। ধসেও পড়েনি, কিংবা দেয়াল তুলেও বন্ধ করা হয়নি, কাঠের দরজা দিয়ে আটকানো।

ওমরের পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রেক। একপাশের দেয়ালে একটা বড় নবের মত জিনিস। সেটা ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করতে

লাগল। অবশেষে খুট করে একটা আওয়াজ হলো। কেঁপে উঠল দরজা। ঘড়ঘড় করে সরে গেল একপাশে। বেরিয়ে পড়ল একটা ফোকর। কোনমতে একজন মানুষ ঢুকতে পারে।

আগে ঢুকল ব্রেক। পেছনে ওমর আর রবিন। মাটির নিচে একটা বদ্ধ ঘর। ঘরটাকে গির্জার কফিন রাখার ঘরের মত মনে হলো রবিনের।

হাত তুলে ইশারায় শব্দ করতে মানা করল ব্রেক। কান পেতে শুনতে লাগল। নিজেদের নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

এ জায়গা বহুবার দেখা আছে ব্রেকের। তার কোন ভাবান্তর হলো না। ওমরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ওদেরকে পিছে আসতে বলে আগে আগে এগোল। পাথরের দেয়ালে ঘেরা হলঘর। টর্চের আলো দেয়ালে ঘুরিয়ে এনে একটা বড় দরজার ওপর ফেলল। কান পেতে শুনতে লাগল আবার। কোন শব্দ নেই। প্রহরী থাকলেও ভোরের এ সময়ে নিশ্চয় জেগে নেই সে। হয় ঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে, নয়তো দরজার পাশে টুলে বসে ঢুলছে।

এগোতে যাচ্ছিল ব্রেক, হাত চেপে ধরে তাকে থামাল ওমর। 'দাঁড়ান। এয়ার ফোর্সে ট্রেনিং নেবার সময় আমাদের ওস্তাদ বলত—বুদ্ধিমান সৈনিক এগোনোর আগে পেছনে পালানোর পথটা রেডি করে রেখে যায়।'

আবার ব্রেকের হাত থেকে টর্চ নিয়ে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। বড় দরজাটার মধ্যে আরেকটা ছোট দরজা, যাতে ঢোকার জন্যে সব সময় বড়টা খুলতে না হয়। সেটার তালার ফুটোয় চাবি ঢোকানো রয়েছে। এর অর্থ দরজার অন্যপাশে এখন কোন প্রহরী নেই।

চাবিতে মোচড় দিয়ে তালাটা খুলে ফেলল সে। ছোট পাল্লার ওপরে-নিচে দুটো বড় বড় ছিটকানি। ও দুটো খুলতে গিয়ে নিঃশব্দতার মাঝে অনেক জোরে শব্দ হয়ে গেল। চুপ করে দেখতে লাগল কেউ আসে কিনা। এল না। একটা কাজের কাজ হলো। প্রয়োজনে এখন এই দরজা দিয়েও ছুটে পালাতে পারবে। চাবিটা পকেটে ফেলে ফিরে এল অন্যদের কাছে। ব্রেককে বলল, 'হ্যাঁ, এবার চলুন।'

ঘরটা অদ্ভুত। সামান্য শব্দ হলেই বিচিত্র প্রতিধ্বনি তোলে।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল ওরা। একটা পাথরের ঘোরানো সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল। স্ক্রু'র প্যাঁচের মত ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে সিঁড়ি। ফিসফিস করে বলল ব্রেক, 'টাওয়ারে ওঠার সিঁড়ি।' এত আস্তে কথা বলেছে সে, তা-ও প্রতিধ্বনি হলো।

'আমি আগে যাই,' ওমর বলল।

টর্চের আলো ফেলে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে শুরু করল সে।

নিরাপদেই উঠে এল একতলায়, কোন বাধার সম্মুখীন হলো না। সিঁড়ির পাশে প্রতিটি তলায় টাওয়ারের দেয়ালে একটা করে ছোট জানালা। সেগুলো দিয়ে ভোরের ধূসর আলো আসছে।

একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সময়ও বাধা এল না। ওপর দিকে তাকিয়ে অনুমান করল ওমর, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আরও দুটো তলা

পার হতে হবে ওদের। এখন পর্যন্ত যখন কোন গণ্ডগোল হয়নি, আশা করল নিরাপদেই বাকি দুটো তলাও পার হতে পারবে।

কিন্তু তিনতলায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশা নিরাশায় পরিণত হলো ওর। নিচে চিৎকার করে উঠল কে যেন। তারপর শুরু হলো চেঁচামেচি। গোলাকার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

ষোলো

পাথরের মূর্তি হয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে গেল তিনজন। উত্তেজনায় টানটান স্নায়ু। কান পেতে শুনছে নিচের হট্টগোল।

হলঘরে পাথরের মেঝেতে ছোটাছুটির শব্দ। দ্বিধাগ্রস্ত কথাবার্তা। কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কজন মানুষ, তা-ও বোঝার উপায় নেই। তারপর হট্টগোলের মধ্যে পরিষ্কার গলায় কথা বলে উঠল একজন, 'বাতাস আসছে কোনদিক দিয়ে?'

খানিক পরে জবাব এল, 'এই যে, এদিক! দরজাটা খোলা! মনে হয় কেউ ঢুকেছে ভেতরে!'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে ওমরের মাথায়। ওরা কোথায় আছে বুঝে ফেলতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না লোকগুলোর। চাপা গলায় বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। শব্দ করবে না। কিশোররা কোথায়, গিয়ে দেখে আসি আমি। কেউ উঠে আসার চেষ্টা করলে যা ভাল মনে হয় কোরো।'

'এখানে থাকলে ফাঁদে পড়ে যাব আমরা!' রবিন বলল।

'যাব কি, গেছিই তো!'

'যান আপনি,' পকেট থেকে পিস্তল বের করল ব্রেক।

'অহেতুক খুনোখুনির মধ্যে যাবেন না।'

'আমি পুলিশ। যা ভাল বুঝব, তা-ই করব। আপনি যান।'

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল ওমর। শেষ ল্যান্ডিংটায় এসে পৌঁছল। সিঁড়ি শেষ। দেয়ালের গায়ের জানালা দিয়ে আলো আসছে। টর্চ না জ্বেলেও সেই আলোয় আশপাশটা দেখতে পাচ্ছে এখন। টর্চটা আর অযথা হাতে না রেখে পকেটে রেখে দিল, ফাইট করার জন্যে দুটো হাতই এখন মুক্ত।

ল্যান্ডিঙের মাথায় একটামাত্র দরজা দেখা যাচ্ছে। ভারি ওক কাঠের, অনেক পুরানো, দেয়ালের হুকে চাবি ঝুলছে। আশায় আনন্দে দুলে উঠল তার বুক। দরজার তালার চাবি নাকি? মুহূর্তে চাবিটা খুলে এনে ঢুকিয়ে দিল তালার ফুটোয়। ঘোরাতে গিয়ে মৃদু শব্দ হলো। কেয়ারই করল না সে। ঠেলে খোলার সময় পাল্লার কজাও কিচকিচ করে উঠল। বিছানায় সজাগ বসে আছে কিশোর আর মুসা।

'ওমরভাই···এসেছেন!' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল কিশোর। 'বাঁচলাম!'

'কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি জুতো পরে নাও। পালাতে হবে। আমরা যে ঢুকেছি, টের পেয়ে গেছে ওরা।'

ওমরের কথা শেষ হওয়ার আগেই জুতো পরা শুরু করে দিয়েছে দুজনে।

মুসা বলল, 'চলুন। একেবারে সময়মত এসেছেন। আজ যদি না আসতেন, কাল এসে আর পেতেন না। রাতেই পরিখার কাদায় পুঁতে ফেলা হত আমাদের লাশ।'

তাকিয়ে রইল ওমর। 'সত্যি বলছ!'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কেন?'

'আমরা ওদের প্রস্তাব মানিনি।'

'কাদের প্রস্তাব?'

'ডুগান আর তার ভাইয়ের।'

'এখানে এসেছিল নাকি ডুগান?'

'এসেছিল,' জবাব দিল কিশোর। 'যদ্দূর মনে হয় এখনও আছে। ঢুকলেন কিভাবে?'

'পরে শুনো। সময় নষ্ট না করে এখন বেরোতে হবে। এসো। শব্দ কোরো না।'

দ্রুত তিনতলার ল্যান্ডিঙে নেমে এল ওরা। রবিন আর ব্রেক দাঁড়িয়ে আছে। নিচ থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে হট্টগোল।

'আর কিছু ঘটেছে?' জানতে চাইল ওমর।

'না,' জবাব দিল রবিন। 'আমাদেরকেই খুঁজছে।'

'সে তো জানিই। আর কাকে খুঁজবে?' কান পাতল ওমর। 'এখনও হলঘরে আছে। এখানে দেখতে আসবে, জানা কথা। গেট দিয়ে বেরোতে গেলে ওদের সামনে দিয়ে যেতে হবে।'

'খুলে রেখে এসে বরং ক্ষতি হলো,' বলল রবিন। 'ওই দরজাটার জন্যেই ওরা টের পেয়ে গেল, চুরি করে কেউ ঢুকেছে। সুড়ঙ্গের দিকে গেলে কেমন হয়?'

'তাহলেও ওদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। যদি যাই, সামনের দরজা দিয়েই যাব। দ্বিতীয়বার ওই নর্দমায় ঢুকতে রাজি না আমি।'

'সামনে দিয়ে গেলে অসুবিধে কি? পিস্তল আছে সঙ্গে।'

'পিস্তল ওদের কাছেও আছে। ওরা গুলি খেলে আমাদেরও ছাড়বে না। মরব।'

ব্রেক বলল। 'আমাকে ওরা চেনে। পুলিশ দেখলে গুলি করতে সাহস করবে না।'

'অত ভরসা করবেন না। ওরা এখন বেপরোয়া। নিজেদের চামড়া বাঁচাতে চাইলে একমাত্র উপায় এখন আমাদের গুলি করে মেরে পরিখার কাদায় লুকিয়ে ফেলা। যাতে পুলিশ এসে পরে কিছুই বুঝতে না পারে। আমরা যে এখানে ঢুকেছিলাম তার কোন প্রমাণ নেই, কোন চিহ্ন রেখে

আসিনি। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না আমাদের কি হয়েছে।'

চুপ হয়ে গেল ব্রেক।

'কি ভাবছ?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা বন্ধ করল কিশোর। 'আমার মনে হয় না দরজা খোলা দেখে ওরা টের পেয়েছে। অ্যালার্ম বেল আছে কোথাও। দরজা খোলার সময় চাপ পড়ে গেছে ট্রিগারে। বেজে উঠে জানিয়ে দিয়েছে ওদের। ওপরে বসেই ঘন্টার শব্দ শুনেছি আমি।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু পালাব কি করে এখন? কি করব?'

'কিছুই না। আপাতত দাঁড়িয়ে থাকব এখানে। দেখব, ওরা কি করে। তবে কি করবে অনুমান করতে পারছি এখনই। বন্দিরা ঘরে আছে কিনা দেখার জন্যে এখানে উঠে আসবে ওরা। যখন দেখবে...ওই যে, আসছে মনে হয়!'

এগিয়ে আসতে লাগল পদশব্দ। সবার আগে যে লোকটা রয়েছে, সে কিশোরদের দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। হুড়মুড় করে নেমে গেল কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ।

'ব্যস, হয়ে গেল কাজ,' ওমর বলল, 'এখন শুরু হবে তাণ্ডব!'

'যে লোকটা দেখে গেল ও   আমি চিনি,' ব্রেক বলল। 'এ গাঁয়ের লোক। গিয়ে কথা বলব নাকি?'

'কোন লাভ হবে না। ও আর এখন আপনার বন্ধু নয়। শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে। দেখা যাবে, প্রথম গুলিটা আপনাকে সে-ই করেছে। এখানেই থাকুন। আমরা যেমন পিস্তলের ভয়ে নিচে নামার সাহস পাচ্ছি না, ওরাও উঠতে সাহস পাবে না। এখানে যতক্ষণ আছি, নিরাপদ।'

নিচে উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে। অবশেষে একটা কণ্ঠ হেঁকে বলল, 'নেমে আসুন, যদি ভাল চান!'

'হ্যারির গলা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

ওমর জবাব দিল, 'পারলে এসে নিয়ে যান!'

কয়েক মিনিট নিজেদের মধ্যে কথা বলল লোকগুলো। চেয়ার-টেবিল জাতীয় কাঠের আসবাব ভাঙার শব্দ হলো। সেটা থেমে যাওয়ার পর আবার হাঁক দিল হ্যারি, 'এখনও বলছি নেমে আসুন! এটাই আপনাদের শেষ সুযোগ!'

'আসতে পারি,' জবাব দিল ওমর, 'যদি নিরাপদে দরজার কাছে যেতে দেয়া হয় আমাদের।'

'কি করব না করব সেটা আমাদের ব্যাপার। আমাদের উঠে আসতে যদি বাধ্য করেন, মরবেন বলে দিলাম।'

জবাব দিল না আর ওমর। লাভ নেই। নামলেও মরবে, দাঁড়িয়ে থাকলেও। বরং দাঁড়িয়ে থাকলে কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক ঘন্টা সময় বেশি বাঁচার সম্ভাবনা। ভাগ্য ভাল হলে ততক্ষণে টমাস পৌঁছে যেতে পারে।

ধোঁয়ার গন্ধ সবার আগে নাকে এসে লাগল মুসার। নাক কুঁচকাল সে। মুহূর্ত পরে অন্যেরাও পেয়ে গেল সেই গন্ধ। সিঁড়ির নিচ থেকে উঠে আসছে।

রাগত গলায় ওমর বলল, 'ও, এ জন্যেই চেয়ার ভেঙেছে ব্যাটারা! গর্তের শেয়ালের মত আমাদের ধোঁয়া দিয়ে বের করতে চাইছে। নাহ্, লড়াই না করে আর গতি নেই।'

কাশতে কাশতে ছোট জানালাটার কাছে চলে গেল কিশোর। বেলা হয়ে গেছে। পরিষ্কার দিনের আলো আসছে এখন সেখান দিয়ে। ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্যে নাকটা ঠেলে দিয়ে জানালার বাইরে। চিৎকার করে উঠল, 'এসে গেছে!'

'কে?' ওকে সরিয়ে দিয়ে বাইরে তাকাল ওমর। টমাস! সঙ্গে আরও দুজন অফিসার। 'বাঁচলাম মনে হয়।'

সবাই কাশতে আরম্ভ করেছে এখন।

মুসা বলল, 'বাঁচব, ধোঁয়ায় দম আটকেই যদি মরে না যাই!'

'সদর দরজা এখন খোলা,' ওমর বলল। 'দুর্গের সবার নজর আমাদের দিকে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। সহজেই ঢুকে পড়তে পারবে টমাস। আমরা যে আছি এখানে জানানো দরকার ওকে।' পিস্তলধরা হাতটা জানালা দিয়ে বের করে পর পর তিনবার ফাঁকা আওয়াজ করল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি নিচে যাচ্ছি।'

নাকে রুমাল চেপে ধরে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে বদ্ধ টাওয়ার। কয়েক হাত দূরের জিনিসও আর চোখে পড়ে না।

ওর পেছনে ছুটল রেক। বাকি তিনজন তার পেছনে।

সদর দরজার বড় ঘন্টাটা বেজে উঠল। তারমানে পৌঁছে গেছে টমাস।

গুলির শব্দ হলো। টাওয়ারের গোল দেয়ালে পিছলে গিয়ে শিস কেটে ওপরে ছুটে গেল বুলেট। ভাগ্য ভাল, কারও গায়ে লাগল না।

জবাবে পাল্টা গুলি করল ওমর। আর্তনাদ করল না কেউ। তারমানে তার গুলিটাও মিস হয়েছে।

পাথরের মেঝেতে ছোটাছুটির শব্দ।

সিঁড়ির নিচে আগুন জ্বলছে। লাফ দিয়ে সেটা পেরিয়ে গেল ওমর, ধোঁয়ার বাইরে। দম নেয়া সহজ হলো। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে। কেউ নেই। পিস্তল উদ্যত রেখে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় চতুর্দিকে চোখ বোলাচ্ছে। খুলে গেল ছোট দরজাটা। পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকল টমাস। পেছনে তার দুই সহকর্মী।

'কোথায় ওরা?' ওমরকে দেখে চিৎকার করে উঠল টমাস।

'জানি না। কয়েক সেকেন্ড আগেও এখানে ছিল।'

'টাওয়ারের জানালা দিয়ে যে পরিমাণ ধোঁয়া বেরোতে দেখলাম, আমি তো ভাবলাম আগুন লেগে গেছে।'

'না, ওপর থেকে নামিয়ে আনার জন্যে ধোঁয়া করেছিল। আপনি আসতে আরেকটু দেরি করলেই মরেছিলাম।'

'গেল কোথায় ওরা? দরজা দিয়ে তো বেরোয়নি।'

'আরেকটা পথ জানা আছে আমাদের। মাটির নিচে। সেটা দিয়েই ঢুকেছি।'

'তাহলে ওপথেই পালিয়েছে। ধরতে হবে ব্যাটাদের। সুড়ঙ্গমুখটা কোথায়?'

ওমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্রেক। 'আমি চিনি, স্যার। চলুন, দেখাচ্ছি।...এক মিনিট দাঁড়ান, আমি আরেকটা কাজ সেরে আসি।'

এক মিনিটের আগেই ফিরে এল ব্রেক। হাসিমুখে বলল, 'সুড়ঙ্গের এ পাশের দরজাটা আটকে দিয়ে এলাম। যাতে আমাদের তাড়া খেয়ে আবার এদিক দিয়ে এসে বেরোতে না পারে। আমাদের বানিয়েছিল শেয়াল, আমরা ওদের আটকাব ছুঁচোর মত। চলুন।'

চারজন পুলিশ বেরিয়ে যেতেই তাদের পেছনে বেরোল ওমর আর তিন গোয়েন্দা। সদর দরজা পেরোতে কানে এল হেলিকপ্টারের এঞ্জিনের শব্দ। ফিরে তাকিয়ে দেখে দুর্গের ছাত থেকে উড়ে যাচ্ছে কপ্টারটা।

'ওই যে পালাচ্ছে ডুগান আর তার ভাই!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'দুর্গের ছাতে নামাত কপ্টার। অন্য টাওয়ারটা দিয়ে ওঠানামা করত ওখানে।'

কপ্টারের দিকে পিস্তল তুলে গুলি শুরু করল ওমর। জানে, বৃথা চেষ্টা। পিস্তল দিয়ে ঠেকাতে পারবে না একটা কপ্টারকে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল টমাস। হেলিকপ্টারটার চেহারা বর্ণনা করে ধরার নির্দেশ দিতে লাগল পুলিশ ফোর্সকে। ওমর ওর কাছাকাছি যেতে বলল, 'বেশিদূর যেতে পারবে না। এখুনি প্লেন নিয়ে তাড়া করবে আমাদের লোক। ধরা পড়ে যাবে।'

সতেরো

পরদিন পুলিশের গাড়িতে করে ডুগান এস্টেটে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা আর ওমর। টমাসের অনুমান ঠিক হয়নি, ধরা পড়েনি ডুগান এবং তার ভাই। হেলিকপ্টারটার কোন খোঁজ পায়নি পুলিশ। তাদের সন্দেহ, বর্ডার ক্রস করে মেক্সিকোতে ঢুকে পড়েছে ওটা, মরুভূমি পার হয়ে চলে গেছে কোন অজ্ঞাত শহরে।

মোট পাঁচজন ডাকাত ধরা পড়েছে, চারজন সুড়ঙ্গে, আর পঞ্চমজন দুর্গের মধ্যে, একটা ঘরে লুকিয়ে পড়েছিল। ব্রেক ওকে খুঁজে বের করেছে। কাজের লোক। টমাস ব্রাউন আর ইয়ান ফ্লেচার দুজনেই ওপর মহলে তার প্রমোশনের জন্যে সুপারিশ করেছেন।

আজকে ডুগান এস্টেটে চলেছে ওরা সোনার খোঁজ করতে। দুর্গে পাওয়া যায়নি ওগুলো। ডুগানের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে, ওখানে থাকার কথাও নয় অবশ্য। কিশোরের দৃঢ় বিশ্বাস—এত টাকার সোনা, নিশ্চয় চোখের সামনে রাখবে ডুগান। দুর্গে গলাকাটা ডাকাতদের মধ্যে নিরাপদ নয়।

এস্টেটের গেটে আজ নকল জুলু পাহারায় নেই। পুলিশ তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরেছে। তার জায়গায় পাহারা দিচ্ছে পুলিশের লোক। দরজা খুলে দিল সে। ভেতরে ঢুকল পুলিশের গাড়ির বহর।

.মোষগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে যাতে কাউকে আক্রমণ করতে না পারে। পার্কের মধ্যে ওগুলো বাদে আর আছে গোটা তিনেক হায়েনা।

কিশোরের ধারণা, সোনাগুলো এস্টেটেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ডুগান। এমন কোন সহজ জায়গায়, যেখানে তার চোখের সামনেও থাকবে, আবার প্রয়োজনে খুব দ্রুত বেরও করে নিতে পারবে।

হেলিকপ্টারের ছাউনিতে রাখবে না। ওখানে রাখাটা মোটেও নিরাপদ নয়। ওটার ওপর সন্দেহ পড়ে সবার আগে, গোয়েন্দাদের যেমন পড়েছিল। সেটা অবশ্য কপ্টারের জন্যে। তা যে জন্যেই হোক, ভেতরে কপ্টার আছে কিনা দেখতে গেলে লুকানো সোনা চোখে পড়ে যাবেই। বাগানে কিংবা পার্কে পুঁতে রাখাটাও নিরাপদ নয়। নতুন খোঁড়া হয়েছে এ রকম জায়গা চোখে পড়লেই লোকের সন্দেহ জাগবে।

অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল সে, মূল প্রাসাদে খুঁজবে। সোনাগুলো ওখানেই কোথাও লুকানো আছে।

প্রাসাদের সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খুঁজে দেখা হতে লাগল। তিন গোয়েন্দা তো বটেই, পুলিশের লোকও খুঁজছে। কিশোরের সঙ্গে ঘুরছে তার দুই সহকারী আর ওমর।

পাথরে বাঁধানো যে চত্বরটায় সেদিন রবিন আর ওমরের সঙ্গে কথা বলেছিল ডুগান, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল রবিন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। দৃষ্টি আটকে গেল চুনকাম করা তিন ফুট উঁচু দেয়ালটায়। ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। মুসার দিকে ফিরে তাকিয়ে আচমকা বলে উঠল, 'একটা হাতুড়ি পাও নাকি দেখো তো!'

'হাতুড়ি দিয়ে কি করবে?' অবাক হলো রবিন।

'দেখতেই পাবে। মুসা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও!'

হাতুড়ি নিয়ে ফিরে এল মুসা। জোগাড় করতে সাহায্য করেছে পুলিশ। খবরটা ইয়ান ফ্লেচারের কানেও গেছে। তিনিও ছুটে এলেন কিশোর কি করে দেখার জন্যে।

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে লেকচার শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে কিশোর, 'দেখো, চত্বরের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে দেয়ালটা বেমানান। যদিও মানানসই করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে ডুগান। কিন্তু পাথরের সঙ্গে সাদা চুনকাম মানায়নি। আর ওখানে অত নিচু একটা দেয়াল তোলারই বা কি প্রয়োজন পড়ল? মোষ ঠেকানোর প্রয়োজন হলে আরও অনেক উঁচু করে তোলা হত। আরও দেখো, দেয়ালটা তোলা হয়েছে আনাড়ি হাতে, দক্ষ রাজমিস্ত্রির কাজ হলে আরও অনেক নিখুঁত, অনেক মসৃণ হত। দেয়ালের একধারে আবার তিনটে ইঁট নেই। হয় ওখান থেকে খুলে নেয়া হয়েছে ইঁটগুলো, নয়তো ইঁটের

টান পড়েছিল। মজার ব্যাপার না? ইঁটের কখনও অভাব হয়? হলে সহজেই কিনে এনে লাগিয়ে দেয়া যায়। আর সাইজটাও দেখো না, আজ পর্যন্ত ওই সাইজের কোন ইঁট আমি দেখিনি। এর মানেটা কি?'

হাতুড়ি নিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল সে। যেখানে তিনটে ইঁট কম, চতুর্থ ইঁটটা থাকার কথা, বাড়ি মারতে আরম্ভ করল সেখানে। তিনচার বাড়ি মারতেই খসে এল ইঁটটা। হাতুড়ি ফেলে সেটা তুলে নিল। হাতে নিয়ে ওজন করল। হাসিমুখে ফিরে তাকাল ক্যাপ্টেনের কাছে। 'নিন, আপনার চোরাই ইঁট।'

'আমি ইঁট দিয়ে কি করব? আমি চাই সোনা…' হঠাৎ বুঝে ফেললেন ক্যাপ্টেন। পকেটনাইফ বের করে ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন ইঁটের গা কামড়ে থাকা সিমেন্ট-বালির আস্তর। বেরিয়ে পড়ল হলুদ রঙের ধাতু। সোনার ইঁট।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'লুকানোর কি চমৎকার কৌশল!'

'সত্যি চমৎকার!' হেসে বলল কিশোর। 'সবার চোখের সামনেই রইল, অথচ চোখের আড়ালে। কেউ কল্পনাও করবে না কোটি কোটি টাকার সোনা এ ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে খোলা জায়গায়। সেজন্যেই ওগুলোকে পাহারা দিতে ভয়ঙ্কর বুনো মোষ আমদানীর প্রয়োজন পড়েছিল। পুলিশের চোখে ধোঁকা দেয়ার জন্যে তৈরি করেছিল ন্যাশনাল পার্ক। নাহ্, লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না!'

'কিন্তু ধরতে তো পারলাম না।'

'পারব। হয়তো পরেরবার। ডুগানের মত লোক হেরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে, আমার তা মনে হয় না। আবার কোন অপরাধ করবে সে। কিংবা আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসবে। এবার আরও আঁটঘাট বেঁধে, আরও শক্তিশালী হয়ে।…আসুক! আমরাও তৈরি!'

শেষ কথাগুলো নিজেকে শোনাল সে।

ভলিউম ২৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০